বরণীয় লেখক স্মরণীয় সৃষ্টি

নারায়ণ চৌধুরী

অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীহীরক রায়
অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাত-৭৩

প্রচ্ছদ : তরুণ চক্রবর্তী

মুদ্রক : জি. সি. পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

'বরণীয় লেখক, স্মরণীয় সৃষ্টি' বইখানি প্রকাশিত হলো। এতে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু সংখ্যক প্রধান পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—সেই সেই পত্রিকার নাম ও প্রকাশ-কাল প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়ের অনুষঙ্গ ও সময় সম্বন্ধীয় ধারণা বোঝা সহজ হয়।

এই গ্রন্থে এমন কতিশয় দিক্‌পাল লেখকের আলোচনা সন্নিবদ্ধ হলো যাঁদের সৃষ্টির দিগ্‌দর্শনের মধ্য দিয়ে একই কালে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আধুনিক ধ্যানধারণার প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। হয়ত কোন কোন লেখায় ঐতিহ্যের দিকটার প্রতি সমধিক জোর পড়েছে কিন্তু সে শুধু এই প্রতিপন্ন করবার জন্য যে, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও সম্ভ্রমের পৃষ্ঠপট বর্জিত আধুনিকতা একটি ঠুনকো জিনিস। তেমন আধুনিকতার প্রতি এই লেখকের বিশেষ আস্থা নেই। অথচ লেখক মনে প্রাণে নিজেকে আধুনিক বলে বিশ্বাস করেন ও পাঠকদেরও সে কথা বিশ্বাস করাতে চান। এই ক্ষেত্রে লেখকের অবস্থানে কোন ফাঁক নেই।

এই বই উৎসর্গ করলুম এখন একজনকে যিনি আমার দীর্ঘদিনের সাহিত্য-সুহৃৎ—'রম্যাণি বীক্ষ্য' গ্রন্থমালিকাখ্যাত শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চক্রবর্তী। এঁর সঙ্গে আমার চিন্তায় চেতনায় বহুতর অমিল কিন্তু এক জায়গায় গভীর মিল রয়েছে—সে ওই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ঐতিহ্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণের ক্ষেত্রে। স্বদেশপ্রেমের উজ্জীবনায় আমরা দুজন সমভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অমিলের প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে অনেক বাদ-বিবাদ হয়েছে কিন্তু সমস্ত রকম অনৈক্য সত্ত্বেও এমন সুভদ্র, সুজন, মার্জিতরুচি বিশিষ্ট ভদ্রলোক খুব কমই আমার চোখে পড়েছে। তারই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি স্বরূপ এই বইখানি বন্ধুবর সুবোধবাবুর হাতে তুলে দিয়ে অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করছি

নিজেও একজন লেখক। প্রকাশন ও সাহিত্যসেবা এক আধারে সমন্বিত হওয়া খুবই সুখের কথা। বিশেষতঃ তরুণতরদের বেলায়। তাঁকে এই সুযোগে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এছাড়া এ বইয়ের প্রকাশে আর যাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগ সর্বদাই না চাইতে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন বন্ধুবর শ্রীজিতেন্দ্রভূষণ পালিত ও অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। তাঁদের আমার অকৃত্রিম প্রাণের প্রীতি জানাই। অনন্ত প্রকাশনের কর্মী শ্রীমান অজিত গাঙ্গুলী ও শ্রীমান সুজিত বেরা এঁরা দুজন বইটির মুদ্রণ ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক স্নেহ-শুভেচ্ছা।

পরিশেষে সাহিত্যের জিজ্ঞাসু, ছাত্র, অধ্যাপক, সাধারণ পাঠক, সকলের জন্য এই বইখানি প্রচার করা হলো। এঁদের সবাইর ভাল লাগলে ও ছাত্রদের কাজে লাগলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

নারায়ণ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চক্রবর্তী

সুহৃদ্বরেষু,

সূচীপত্র

[মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ "শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা" প্রবন্ধের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৭-এর জায়গায় ১২৯ হয়ে গেছে। ভুলটি সংশোধনীয় ও পৃষ্ঠাসংখ্যা তদনুযায়ী গণনীয়।]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী

পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মানুভূতি ও ধর্মচিন্তা বিষয়ে ইতঃপূর্বে এত সবিস্তরে আলোচনা হয়েছে যে নতুন করে সেই প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেকে এই আলোচনায় পুনরাবৃত্তির দোষ দর্শন করলেও করতে পারেন। তাঁরা হয়তো এই বলবেন যে, আচার্যদেব তাঁর 'আত্মজীবনী'তে তাঁর নিজের জীবনে ধর্মানুভূতির অঙ্কুরোদ্গম থেকে তাঁর পরিণতির প্রতিটি স্তর ব্যাখ্যা করে বলতে কিছু বাকি রাখেন নি; আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় 'আত্মজীবনী' সম্পাদনা করতে গিয়ে গ্রন্থের পরিশিষ্ট-অংশে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার স্বরূপ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, সম্ভবত কিয়ৎপরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্তরূপেই, আলোচনা করেছেন; মহর্ষিদেবের জীবনচরিত-লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তীর আলোচনায় জীবনব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গেরও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে; এ বাদে বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায় অসংখ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা এই বহুল-আলোচিত বিষয়টির উপর এত বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত হয়েছে যে তার পরে এ-সম্পর্কে আর নতুন কী বলার থাকতে পারে তা স্বতই প্রশ্নযোগ্য বিষয়।

এ ক্ষেত্রে বর্তমান লেখকের উত্তর এই যে, যাঁরা এতাবৎ মহর্ষিদেবের ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই কম-বেশি বিগত যুগের মানুষ। একালীন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসঙ্গটির বিচার হয়েছে খুব কমই। অথচ এত বিস্তারিত, বহুমুখী আলোচনাতেও সে-বিচারের প্রয়োজন কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি। বরং একালের মানুষ তার নতুন আলোচিত ভাবনার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে বিষয়টিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছে সেটি

নিরূপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলেই মনে করি। আলোচ্য প্রবন্ধ-রচনার উদ্‌যোগের সমর্থনে এই কটি কথা বলে এবারে আসল আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর (১৭৬৫ শকাব্দের ৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ কুড়িজন বন্ধুসমেত আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তার পর কিঞ্চিন্ন্যূন সোয়াশো বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। এই সময়ের ভিতর সমাজ-জীবনের অন্যান্য অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির ধর্মজীবনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন এই যে, একালে ধর্মের আর পুরাতন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। যেটুকু বা আছে তা-ও ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর নিজ-নিজ সীমায় আবদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে তার শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে ব্যাপক ধর্মান্দোলনের প্রবলতা দেখতে পাই, তার ছিটেফোঁটাও এখন টিকে রয়েছে কিনা সন্দেহ। কালপ্রভাবেই এমনটি ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতিতে যেমন, সমাজক্ষেত্রেও তেমনি শূন্যতার স্থায়িত্ব নেই। ধর্মান্দোলনের ক্ষীণতাবশত একালে বাঙালির মানস-পরিমণ্ডলে ও কর্মতৎপরতায় যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই শূন্যস্থান স্বভাবতই অন্য আর-এক বিষয় এসে পূরণ করে নিয়েছে। আমাদের কপালগুণে, অথবা কপালদোষে ঠিক বলতে পারব না, রাজনীতি হল সেই ধর্মের স্থলাভিষিক্ত বিষয়। এখনকার প্রায় তাবৎ চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র রাজনীতির দ্বারা স্পৃষ্ট। উনিশ শতকে ধর্মের যে-প্রভাব ছিল, রাজনীতি এখন সে-প্রভাব আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আর যেহেতু এখন রাজনীতিরই সর্বাধিপত্য, সেই কারণে দেখতে পাই, ধর্মের যেটা গোড়ার কথা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মমোক্ষের চেষ্টা, তার প্রভাব স্পষ্টতই এখন ক্ষীয়মাণ। আত্মমুক্তির জায়গা দখল করেছে, সামূহিক মুক্তির প্রয়াস। ব্যষ্টির বদলে চারিদিকে উড্ডীয়মান সমষ্টির জয়পতাকা।

একালের যেটা প্রবহমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র, তার 'সমাজ' ও 'গণ' কথা দুটির মধ্যেই একালীন প্রধান ভাবনার সংকেত খুঁজে পাওয়া যাবে, আর সে-সংকেত হচ্ছে এই যে, এ-যুগে ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে, প্রয়োজন হলে ব্যক্তিকে অবদমিত করেই, সমূহকে মান্য করতে হবে।

একালের এই মানদণ্ডটি সামনে খাড়া রেখে যদি আমরা মহর্ষি-দেবের ধর্মজীবনের পর্যালোচনা করতে যাই তা হলে প্রথমেই একটা হোঁচট খেতে হবে। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের আদ্যন্তই দেখা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রাজা রামমোহন রায়ের সূত্রানুসরণ করে তিনি পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্মকে কেন্দ্র করে এক নাতিবৃহৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেও দেখা যায় তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপটে বিলম্বিত রয়েছে এক অনন্ত আকুল ব্যক্তিগত ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা। আপনার ধর্মানুভূতিকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে তার অসম্পূর্ণতাগুলির নির্ণয় ও তার সময়োচিত শোধনের দ্বারা কেমন করে আরও উচ্চতর ধর্মের সোপানে আরোহণ করা যায় এই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের ভাবনা, ধ্যান ও জ্ঞান। তিনি শুধু ধর্মজিজ্ঞাসুই ছিলেন না, ছিলেন ধর্মপিপাসু। আর তাঁর এই ধর্মপিপাসার মধ্যে এমন একটা আবেশ, এমন একটা অন্যবিষয়-নিরপেক্ষ একমনস্কতা ছিল যে তাকে প্রায় ভাবোন্মাদনা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই ভাবোন্মাদনার দুটি মাত্র পাত্র ঃ ঈশ্বর এবং তিনি নিজে। বিষয় ঈশ্বর, বিষয়ী তিনি। এর ভিতর তৃতীয় কোনো ব্যক্তির স্থান ছিল না। পিতামহীর মৃত্যুকালে শ্মশানে অন্তরে উদাস আনন্দের সঞ্চার এবং উদ্গত আনন্দ হারিয়ে পুনরায় তার সূত্র-সন্ধানের ব্যাকুলতার কাল থেকে শুরু করে চিত্তের নিতান্ত বিষণ্ণ অবস্থায় হঠাৎ একদিন ঈশোপনিষদের শ্লোক সংবলিত ছিন্নপত্র কুড়িয়ে পেয়ে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ক্রমে বেদ ও বেদান্তের (উপনিষদের) আশ্রয় গ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত গভীরতর ধর্মানুসন্ধানের সহায়ে বেদ ও বেদান্তের 'পত্তনভূমি' ত্যাগ করে একান্তরূপে

'জ্ঞানোজ্জ্বলিত পবিত্র হৃদয়'কেই ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা— এই সব-কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যেই ফুটে উঠেছে এক অপরিমেয় গভীর অনুভব, অন্তহীন ভাবমন্থন, স্বীয় চিন্তাকে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, শুদ্ধতর থেকে আরও শুদ্ধ করে তোলার ব্যাকুলতা, অর্থাৎ আপনার ভাবনা-ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসের সততাকে সর্বৈব ত্রুটিহীন করে তোলার আকূতি। যেখানে আপন ভাবের সততা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে এত ব্যস্ততা, এত প্রযত্ন, এমন একমুখী আবেশ, সেখানে স্বতই ব্যক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে চিন্তা সমূহের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। পারা সম্ভব নয় এই কারণে যে, ষোলো-আনা আত্মশুদ্ধির ভাবনাই তখন মনপ্রাণ পুরাপুরি অধিকার করে নেয়, দশের ভাবনা আর ভিতরে প্রবেশের ছিদ্রপথ খুঁজে পায় না। এই ব্যক্তিমোক্ষের আবেশ শুধু দেবেন্দ্রনাথেরই ধর্মসাধনার বৈশিষ্ট্য নয়, বলতে পারা যায় উনিশ শতকের বাঙালি ধর্মনায়কমাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য। তবে দেবেন্দ্রনাথের বেলায় এটি সবিশেষ তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল তাতে সংশয় নেই।

তবে কি আজকের দিনের প্রেক্ষিতে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনাকে লক্ষ্যহীন, নিরর্থক বলতে হবে? না, মোটেই তা নয়। বরং তাঁর অনুভবের গভীরতা, সততা ও নিরন্তর শুদ্ধির প্রয়াসের সুদৃঢ় আদর্শের কাছ থেকে আমাদের একালীন মানুষের অনেক কিছু শেখবার ও নেবার আছে। যত তাঁর সাধনাকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করব তত আমাদের নিজেদের অনুভবের ভিত্তিগাত্র গভীরতাপ্রাপ্ত হবে। একালীন মানুষ আমরা, আমাদের চিন্তায় হয়তো ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু তলগামিতা নেই। অনেকের ভাবনা আমরা ভাবি বটে কিন্তু আত্মানুসন্ধানের স্পৃহা নেই। আমাদের ভাবনা দু-পাশে অনেক দূর ছড়িয়ে আছে এবং তার বৃত্তের মধ্যে আরও অনেকের ভাবনাকে স্থান করে দিতেও আমরা আপত্তি করি না; কিন্তু সে ভাবনা যথোচিত পরিমাণে ঊর্ধ্বমুখ বা তলাতিশায়ী নয়। অর্থাৎ এ-যুগের ভাব-ভাবনা মূলত অনুভূমিক (horizontal), উল্লম্ব (vertical) নয়।

এইখানেই আমাদের কাছে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার সার্থকতা ও তাঁর ভূমিকায় স্বল্প-উচ্চ মহত্ত্ব। বাংলাদেশের ধর্মচিন্তার বিবর্তনের যে-স্তরে দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছিল সেখানে গভীরতারই মূল্য, ব্যাপ্তির নয়। এবং গভীরতা জিনিসটাই এমন যে তা ব্যক্তিসাক্ষিক হতে বাধ্য, সামুহিকতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুব নিকট হওয়া সম্ভব নয়। বিবর্তনের যে স্তরে গভীরতার ক্ষয় হয়ে ব্যাপ্তির প্রসার ঘটে সেখানে সমানুপাতিক ভাবে ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ হয়ে সমষ্টির ভূমিকার প্রাধান্য ঘটে। উচ্চ পর্যায়ের কবিরা যে প্রায়শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং আপনাতে আপনি আবর্তিত হন, সামুহিকতায় স্ফূর্তি পান না, তার ভিতরের কথাটা এই যে, তাঁরা গভীরত্বের সাধক, গূঢ়-অন্তর্নিবেশী ও নিজের প্রতি নিজে খাঁটি। অনুভবে সততা, চিন্তায় সততা, বিশ্বাসে সততা, তাঁদের নিজ নিজ গণ্ডির বাইরে পা বাড়াবার মোটে অবকাশই দেয় না—আকস্মিক ঝোঁকে বাইরে পা বাড়ালেও আবার স্বধর্মের টানে নিজের অভ্যস্ত গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসেন তাঁরা। দেবেন্দ্রনাথ আক্ষরিক অর্থে কবি না হলেও তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে কবি-প্রকৃতির নিগূঢ় যোগ লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন একাধারে কবি-ভাবুক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বের গূঢ়-সন্ধানী। ধর্মের সহজাত অনুরাগ তাঁকে ধর্মের বিচিত্র অনুভবের শরিক করে তুলেছিল এবং নানা পরীক্ষায় নিয়ত উদ্‌বুদ্ধ করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন বিচিত্র ধর্মসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপনাকে সঞ্চালিত করে সকল ধর্মের সারাৎসার নিয়ে অবশেষে স্বীয় প্রত্যয়ের ভূমিতে সুস্থিত হয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও তেমনি আপনার ব্রাহ্মসমাজের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে থেকে ধর্মীয় অনুভবের বিচিত্র স্তর স্পর্শ করেছিলেন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। গভীরত্বের প্রেরণা থেকেই তাঁর তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর আন্তরিক সততা তার মূলে। মহর্ষিদেব উপনিষদে একদা-তদ্‌গতচিত্ত হয়েও শেষ অবধি উপনিষদীয় প্রত্যয়ের ভূমি থেকে সরে আসতে যে দ্বিধা-সংকোচ করেন নি তার

গোড়ায় আছে এক অতিসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, যার উৎস ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও সত্যাশ্রয়িতা। এ-সত্যাশ্রয়িতার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার; একমাত্র উত্তরকালে গান্ধীজীর জীবনেই শুধু এ-জাতীয় চুলচেরা বিচারসন্ধিৎসা ও সত্যের বিশ্লেষণচেষ্টা দেখি। যে-কারণে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের আশ্রয়ভূমি ত্যাগ করে নূতনতর প্রত্যয় অবলম্বনে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন আপাতদৃষ্টিতে তা এতই তুচ্ছ ও সংকীর্ণ স্থানাধিকারী যে এই চিন্তাভেদের সূত্রে কেউ যে এতদিনের সযত্ন-লালিত বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করতে পারেন তা অভাবনীয় বললেও চলে। অথচ তিনি কত অবলীলায়ই না এই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। এ আর-কিছু নয়—এ তাঁর ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও অতুলনীয় বিচারী মনোভাবের প্রমাণ।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনসাধনার সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন যে, তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্বে অতি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিত্ববাদী হলেও প্রকৃতিতে ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ ও আদর্শপ্রিয়, তাই তাঁর মনোমত বিশ্বাসের সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রাদির সংগতিসূত্র অন্বেষণের চেষ্টায় তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতের বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অন্যরহিত ছিল বললেও চলে। এতে হয়তো এক ধরনের রক্ষণশীলতার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু স্বীয় মতকে আপ্তবাক্য বলে প্রচারের দম্ভ ও একদেশদর্শিতার প্রতি বিতৃষ্ণাও যে এই শাস্ত্রানুসন্ধানের অন্যতর কারণ হতে পারে সেটিও বিবেচনা না করে পারা যায় না। মোট কথা, কারণ যা-ই হোক, সত্য ঘটনা এই যে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে প্রাচীন শাস্ত্রাধ্যয়নে নিরন্তর ডুবে ছিলেন। বিশেষত উপনিষদ্ তাঁর মনপ্রাণ অধিকার করে নিয়েছিল। এর সঙ্গে চলেছিল পারসীক সুফি সাধকদের রচনা পাঠ ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় ঈশ্বরাত্মিকা বুদ্ধি ও মরমি ভাবের প্রাধান্য আছে তাঁদের অনুশীলন। যৌবনকালে একবার

তিনি লক্, হিউম, হলবাক্, গ্যাসেণ্ডি প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য যুক্তি ও জড়বাদী দার্শনিকদের রচনা পড়তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতিতে তাঁদের অতিরিক্ত গুরুত্ব-আরোপ তাঁর চিত্তকে প্রতিহত করেছিল এবং কিছুকাল তাঁকে অত্যন্ত অস্থির করে রেখেছিল। পরে আর তিনি কখনো যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হন নি এবং একান্তভাবে সেইসব ধর্মচিন্তা ও পরা বিদ্যার দর্শনকেই আশ্রয় করেছিলেন যেগুলির পরিবেষিত মতের মধ্যে তাঁর নিজের মতের 'সায়' খুঁজে পাওয়া যায়। এই সায় লাভের বাসনা মহর্ষি-চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আজীবন তাঁকে এই অভীপ্সা আন্দোলিত করেছে। আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে (পরিশিষ্ট ৪৫) এই সায় লাভের বাসনার অন্তর্নিহিত প্রেরণার বড়ো চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, জিজ্ঞাসুরা তা পড়ে দেখতে পারেন। মোটকথা, প্রাচীন শাস্ত্রে নজির খোঁজা দেবেন্দ্রনাথের বেলায় অন্তত পরনির্ভরতা বা রক্ষণশীলতা ছিল না, তা ছিল ঐকান্তিক সত্যান্বেষণ-স্পৃহা ও শ্রদ্ধাশীলতার পরিণামফল। উপনিষদের ঋষিদের তিনি যে কী গভীর ভক্তির চোখে দেখতেন তা বলে বোঝানো যায় না।

সেই ভক্তিতেও একদিন ভাঙন ধরল আপাতসামান্য একটি বাক্যের গূঢ় অর্থ-ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে মতভেদের সূত্রে। উপনিষদ্ বা বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' বা 'সোহহম্' অর্থাৎ 'তিনিই তুমি' বা 'তিনিই আমি' অথবা, তারই ব্যাখ্যায় বিহিত 'অহং দেবো, ন চান্যোহস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্' শ্লোক, এক কথায়, পরম ব্রহ্মের সহিত জীবের অদ্বৈত-সম্বন্ধের কল্পনা—যা শাংকরবেদান্তের মূল কথা—দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিময়, নিয়ত-আত্মসমর্পণ-ব্যাকুল চিত্ত কোনোমতেই স্বীকার করে নিতে পারল না, এবং ক্রমে বিশ্বাসের ওই প্রস্থান ভূমি থেকে তিনি সরে এলেন, আর কখনো পূর্বভূমিতে ফিরলেন না। এইখানেই বোঝা যায় দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধির গভীরতা ও জোর। আপ্তবাক্য বলেই তিনি কোনো কিছু মানতে প্রস্তুত ছিলেন না, যতক্ষণ-না সেই

আপ্তবাক্যের সঙ্গে তাঁর স্বকীয় অনুভবের সামঞ্জস্য হত। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে যে কখনো অদ্বৈত বা অভেদ কল্পনা হতে পারে তা তাঁর চিন্তার বহির্ভূত ছিল, আর এইজন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি বেদান্তকে পুরোপুরি বর্জন করে নয়, বেদান্তের মূল ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে, ব্রাহ্মসমাজের জন্য স্বতন্ত্র উপসনাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর একবার ঘোরতর বিতর্ক হয়েছিল এবং ওই সূত্রে তিনি বলছেন—"কিন্তু আমি স্বয়ং পরমেশ্বর" এমন অভিমান বড়ই অনর্থের বিষয়; ইহাতে জিব কাটিতে হয়। বিষয়ের শত পাশে বদ্ধ হইয়া, জরা-শোকে পাপে-তাপে মগ্ন হইয়া, আপনাকে নিত্যমুক্তস্বভাববান্ মনে করার চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য জীব-ব্রহ্মে ঐক্যমত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশমতে সন্ন্যাসীরা, এবং গৃহস্থেরাও, এই প্রলাপ-বাক্য বলিতেছে যে—সোহহং, আমি সেই পরমেশ্বর!' ('আত্মজীবনী', চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ১৬৫)।

দেবেন্দ্রনাথের এই অদ্বৈতবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে বৈষ্ণবদের দ্বৈতবাদ এবং সুফিদের জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে লীলাময় সম্পর্কের ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও সঙ্গে সঙ্গে এই সংকোচক-বাক্য উচ্চারণ করা প্রয়োজন যে, বৈষ্ণবদের আত্যন্তিক ভাবরোমাঞ্চ ও ধূলিধূসরিত ক্রন্দনাকুলতা থেকে তিনি তাঁর আত্মসমাহিত প্রশান্তির আদর্শ নিয়ে বহু দূরে অবস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধির কামনার মধ্যে পিপাসাব্যাকুলতা ও আর্তির লক্ষণ থাকলেও তার রূপটি গভীর-গম্ভীর, সংহত, ধ্যানমগ্নতায় অতলস্পর্শী। এই সাধনা সর্বাংশে যোগের চিহ্নমণ্ডিত, যদিও শাস্ত্রচর্চায় যোগদর্শনের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ তাঁর জীবনীতে তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। সাধনার সংজ্ঞার্থ ও প্রকরণ—উভয় দিক থেকেই তিনি ছিলেন প্রকৃত যোগী, আর তা-ই এই যোগীপুরুষের কাছে উত্তরকালে ছুটে এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) অধ্যাত্মপিপাসায় আকুল হয়ে।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে যেমন তাঁর সংশয় দেখা দিয়েছিল, তেমনি বেদের 'অপৌরুষেয়তা' ও 'অভ্রান্ততা' সম্পর্কেও তাঁর চিত্ত সন্দেহদোলায় দোলায়িত হয়েছিল এবং পরে তিনি বেদের আশ্রয়ভূমি থেকেও আংশিক সরে আসেন। এই সরে আসার প্রক্রিয়া অবশ্য খুব ধীরগতিতে সাধিত হয় এবং তাঁর এই গতি-মন্থরতায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তাঁর সহযোগীরা প্রকাশ্যেই অধৈর্য প্রকাশ করেন।

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে এই নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধও দেখা দেয়।—অক্ষয় কুমার দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বেদের অভ্রান্তত্বে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে পুরাপুরি একমত হতে না পেরে অথচ তাঁদের মতকে সরাসরি অগ্রাহ্য করতেও অসমর্থ হওয়ায়, দেবেন্দ্রনাথ কিছুকাল শর্তাধীনে বেদের অপৌরুষেয়তার তত্ত্ব মেনে নিয়েছিলেন—বেদকে তিনি 'দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট' বলে প্রচার করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর সংরক্ষণশীলতার ধাত প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু গভীরতর অধ্যয়নের সহায়ে যখন তিনি নিঃশেষে উপলব্ধি করলেন যে, বেদের উপর এই শর্তাধীন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ আরোপেরও কোনো ভিত্তি নেই, তখন তিনি শর্তাধীন বিশ্বাসও পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না।

এইখানেও তাঁর দুর্মর সত্যনিষ্ঠার একটি রকমফের দেখতে পাই। তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিচার ও সমাধান করতেন স্বকীয় উপলব্ধির দীপ্তালোকে, পর-বুদ্ধিতে চালিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধাত আদৌ তাঁর ছিল না—বিশেষত ধর্মের গভীর গূঢ় প্রশ্নে। কিন্তু যখন একবার বুঝলেন যে বেদ বা বেদান্ত (অর্থাৎ উপনিষদ্) এ-দুটির কোনোটিই ব্রাহ্মধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হবার পথে বাধা আছে, তখন তিনি নিজেই ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরচনায় নিয়োজিত হলেন এবং তারই ফল হল 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ। 'আত্মজীবনী'র দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস-সংকটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে এবং কোন্ উপলব্ধি থেকে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের সূত্রপাত হল তারও

সন্ধান দেওয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথকে যাঁরা রক্ষণশীল বলেন তাঁরা দেখবেন এই দুই পরিচ্ছেদের ছত্রে-ছত্রে কী অসামান্য স্বাধীন চিন্তার দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে এবং পরপ্রত্যয়-নির্ভর বুদ্ধির আদর্শে তাঁর কী গভীর অনীহা।

দেবেন্দ্রনাথের অনমনীয় স্বাধীনচিত্ততার আর-একটি ঝলক দেখতে পাই পিতৃ-শ্রাদ্ধকালে তাঁর আচরণের মধ্যে। আত্মীয়জ্ঞাতিবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সেই সময় পৌত্তলিক মতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিরত থাকেন এবং আপন বিশ্বাসমতে ক্রিয়াদি করেন। এই যে তেজ, এই যে দৃঢ়তা—এর মধ্যে আছে যে-কোনো অবস্থায় সত্যকে আঁকড়ে থাকবার ব্যাকুলতা, অনুভবের গভীরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমায় অমোচনীয় বিশ্বাস।

পূর্বেই বলেছি, ধর্মের গভীর পিপাসা তার স্বরূপের কারণেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী বা ব্যক্তিসাক্ষিক হতে বাধ্য। আমাদের দেশের প্রতিটি মহান্ ধর্মসাধকই এই অর্থে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সামূহিকতার আদর্শে দীক্ষিত এ-যুগের মানুষ আমরা, উক্ত ধর্ম-সাধকদের জীবনে সমূহ বা গণচেতনার আপেক্ষিক অভাব দেখে যতই বিমূঢ় বোধ করি না কেন, ওই বিমূঢ়তার কোনো ভিত্তি নেই। প্রচলিত অর্থে তো অরবিন্দের ন্যায় মহাযোগীও একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসাধক ছিলেন, তা বলে কি তাঁর সাধনার মাহাত্ম্যের কিছুমাত্র ন্যূনতা ঘটে? যে-কোনো প্রকারের কঠিন সাধনায় ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার একান্ত প্রয়োজন, নইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। এই নিয়ে আমাদের মনে ক্ষোভ থাকা উচিত নয়, বরং আধুনিককালীন আমাদের সকলেরই জীবনে কম-বেশি যে গভীরতার ও অন্তর্নিবেশ-ক্ষমতার অভাব আছে সেই ত্রুটি আমরা বহুলাংশে শোধন করতে পারি অতীত যুগের মহাপুরুষদের দুরবগাহ সাধনার দৃষ্টান্ত থেকে। দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ একজন মহাপুরুষ যাঁর সত্যসন্ধানব্যাকুলতা, অনুভবের গভীরতা, অন্তঃসঞ্চারী চিন্তা আমাদের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির

এক অব্যর্থ প্রতিষেধকরূপে দেখা দিতে পারে। কি সাধনার পথনিরূপণে, কি সাধনার প্রকরণে তাঁর মধ্যে যে পদে পদে চুলচেরা বিচারপ্রবণতা ও শব্দার্থের খুঁটিনাটির প্রতি সাভিনিবেশ মনোযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় এ তাঁর অসাধারণ সত্যনিষ্ঠারই দ্যোতক। অর্থব্যক্তির প্রতি যথোচিত মনোযোগ না নিয়ে শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে অভ্যস্ত একালীন মানুষ আমরা দেবেন্দ্রনাথের এই 'নিখুঁত' সাধনার লক্ষ্যের তাৎপর্য তখনই বুঝতে পারব যখন বহির্মুখিতার বদলে অন্তর্মুখিতার দ্বারা আমরা আমাদের জীবন প্রদীপ্ত করে তুলতে পারব। চাই গভীরতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ, বিশ্বাস। কেবল ব্যাপ্তিতে জীবন ভরে না, একই কালে ঊর্ধ্বগামিতা ও অতলশায়িতার দ্বারা জীবন অভিষিক্ত হওয়া প্রয়োজন—এই বোধেও উদ্দীপ্ত হওয়া চাই। মহর্ষিদেবের অতুলনীয় ধর্মসাধনার দৃষ্টান্ত এই পথে আমাদের বিশেষ সহায় হতে পারে বলে মনে করি।

পরিপূর্ণ সাহিত্যসাধক বঙ্কিমচন্দ্র

॥ ১ ॥

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র তারিখে মৃত্যু। কিঞ্চিন্ন্যূন মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সের জীবনকাল, অদ্যকার আয়ুষ্কালের পরিমাপে ৫৬ বছর বয়সে দেহত্যাগকে অকালমৃত্যু বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই কালসীমার পরিসরের মধ্যেই কী অত্যাশ্চর্য সমৃদ্ধিময় জীবন, কী বিস্ময়কর কৃতিত্বের ফসলে জীবনের ডালি পূর্ণ! বাংলাদেশে ইংরেজ অভ্যাগমের পরবর্তী গত দুশো বছরের ইতিহাসে বহুতর সাহিত্যিক, কবি, ভাষাশিল্পী ও সংস্কৃতি নায়কের জন্ম হয়েছে, কিন্তু একমাত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পরিপূর্ণ সাহিত্যশিল্পীর আর আবির্ভাব হয় নি সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিধির মধ্যে। 'পরিপূর্ণ সাহিত্যশিল্পী' বলতে কি বোঝায় সে কথাটার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমরা সচরাচর বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঔপন্যাসিক সম্রাট' 'ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে থাকি। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ের একটা অংশমাত্র ; ওই খণ্ডিত পরিচয়কে অতিক্রম করে তাঁর পরিচয় আরও বহুদূর ব্যাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, গল্পকার, মনস্বী, দার্শনিক, সমালোচক, সমাজনেতা, দেশপ্রেমিক, রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ ও আধুনিক হিন্দুধর্মের একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা। সাহিত্যশিল্পী বা সাহিত্যিক বলতে সাধারণতঃ আমাদের মনে একজন ব্যক্তির যে ছবি ভেসে ওঠে উপরের তালিকায় শেষের দিকের অনেকগুলি বিশেষণই ওই ছবির অন্তর্ভুক্ত নয় ; সাহিত্যশিল্পী বা সাহিত্যিক বলতে বড় জোর

আমাদের মনে ভেসে ওঠে একজন কথাশিল্পী, কবি বা নাট্যকার বা রম্যরচয়িতার অভ্যস্ত আলেখ্য। কিন্তু এই আলেখ্য যে একজন যথার্থনামা সাহিত্যশিল্পীর পরিপূর্ণ রূপ নয় সে কথাটা আমরা গভীরভাবে তলিয়ে দেখি না।

যে-কোন ধরনের সাহিত্যশিল্পচর্চায় মনস্বিতার স্থান অতি উচ্চে ; বস্তুতঃ মননশীলতাকে বাদ দিয়ে কোন প্রকার সার্থক সাহিত্যকর্মই সম্ভবে না। আরও ভালো হয় যদি লেখকের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে দেশচেতনা সমাজচেতনা দার্শনিক জিজ্ঞাসা উদার রাজনীতি ভাবনা ইত্যাদি যুক্ত থাকে। সাহিত্যকে যাঁরা কেবল আনন্দ বিতরণের উপায় বলে মনে করেন—নন্দনবাদীদের এই ধারণা—অথবা সাহিত্যই সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য (কলাকৈবল্যবাদীরা এই বিশ্বাসে সাহিত্যসৃষ্টি করেন), তাঁরা সাহিত্যকে বড়োই খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখেন। সাহিত্যের কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যাশা ছোট মাপের সুতরাং সাহিত্যও তাঁদের প্রত্যাশার মাপে অংশের বা খণ্ডের কারবারী হয়ে থাকে। জীবনের এবং সমাজের যথাসাধ্য ব্যাপক পরিসরকে নিয়ে নানামুখী সাহিত্যচর্চার যে একটা দুরূহ আদর্শ পরিপূর্ণতাপ্রয়াসী কোন কোন সাধক সাহিত্যশিল্পীর মনপ্রাণ অধিকার করে থাকে, বলা বাহুল্য সাহিত্যের উল্লিখিত খণ্ডিত ধারণায় ওই আদর্শের নাগাল ধরা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র পরিপূর্ণ শিল্পী এই অর্থে যে, তাঁর সাহিত্যানুশীলনের বলয়ের মধ্যে এককালীন অথবা কিছু আগেপরে অনেকগুলি ভূমিকার সমাবেশ হয়েছিল। উপরের অনুচ্ছেদে বিশেষণ-তালিকায় যে সকল বিশেষণের কথা বলা হয়েছে সে সকল বিশেষণে তিনি তো ভূষিত ছিলেনই, তারও বেশী কিছু ছিলেন। তাঁকে কোন কোন সমালোচক 'ঋষি' আখ্যায়ও আখ্যাত করেন। এই আখ্যার যৌক্তিকতায়ও সংশয় প্রকাশের কারণ দেখি না, যদি নব-হিন্দুত্বের প্রস্তাবক ও অনুশীলন তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা আমরা স্মরণ করি।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের আকারে তিনি জাতিকে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী বীজমন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন—প্রকৃতপক্ষে এই বীজমন্ত্রের ধ্যান থেকেই যাকে বলে ভারতচেতনা, ভিন্নার্থে জাতীয়তাবাদ, তার সূত্রপাত—সেই দিক দিয়েও তাঁর ঋষিত্ব বিতর্কাতীত। একজন মূলতঃ সাহিত্যশিল্পী হয়েও মাত্র ৫৬ বছরের জীবনসীমার মধ্যে তিনি জাতীয় জীবনের যে কত বিভিন্নমুখী দাবি পূরণে অগ্রসর হয়েছিলেন তার কথা চিন্তা করলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের নানামুখী ভূমিকার বৈচিত্র্য ও বিস্তার তাঁর পরিপূর্ণতাপ্রয়াসী ব্যক্তিত্বের ছবিটিই বারে বারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। যেমন পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সমন্বয় সাধনার মধ্য দিয়ে নিজ জীবনে পরিপূর্ণতার আদর্শকে সার্থক রূপদানের চেষ্টা করে গেছেন, বঙ্কিমও তেমনি তাঁর কালে সাহিত্যসাধনার একটি সামগ্রিক আদর্শের অনুবর্তী হয়ে তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে নানা মুখে প্রেরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই সামগ্রিকতাকে আমাদের বোঝা দরকার, নয় তো আমরা তাঁর শিল্পী সত্তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারব না।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী সত্তার একটি প্রধান কথা এই যে, তাঁর ভিতর রসচেতনা ও মনস্বিতার এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। একদিকে অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতা, সৃষ্টির প্রাচুর্য, অন্যদিকে প্রখর মেধা ও মনীষার বিচ্ছুরণ—এরকম সমন্বয় আমাদের একালীন সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিম আর রবীন্দ্র-জীবনেই সম্ভবপর হয়েছে, আর কোন নাম এক্ষেত্রে আমার মনে পড়ছে না। এমন কি ক্ষুরধার মনীষার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের শক্তিও এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের শক্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়, এই আমার বিশ্বাস। তবে দুইয়ের শক্তির প্রকৃতির মধ্যে কিছু তারতম্য আছে। রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা সংশ্লেষণাত্মক, বঙ্কিম-চন্দ্রের বিশ্লেষণাত্মক। বাংলাদেশ নব্যন্যায়ের দেশ। নব্যন্যায়ীদের চুলচেরা বুদ্ধি-বিশ্লেষণের যে ঐতিহ্য বাংলাদেশে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র হলেন সেই ধারারই একজন শক্তিশালী উত্তর সাধক।

তাঁর বুদ্ধি চিড়ে-ফেঁড়ে মানুষকে বিচার করে, তার বিশ্বাসকে খণ্ডন করে, তার অভ্যাসকে আঘাত করে, এমনকি প্রয়োজনে তাকে সুতীব্রভাবে ভর্ৎসনাও করে। রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা সে জাতের নয়। তা অনেক উদার, কমনীয়, সুস্নিগ্ধ। তাঁর চিন্তায় সহানুভূতি ব্যাপ্ত ও গভীর। দু'জনাই মানবপ্রেমিক, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মানবপ্রেমের মধ্যে আছে বৈদান্তিকের বুদ্ধিপ্রধান খরদ্যুতি আর রবীন্দ্রনাথের মানব প্রেম হৃদয়াবেগরঞ্জিত, করুণায় অভিষিক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের গড়নটাই এমন ছিল যে, তাঁর অতিশয় সদিচ্ছাপ্রণোদিত কথার মধ্যেও একটা ঝাঁজ থাকত. অনেক সময় তাঁর সমালোচনা তিরস্কারের ধার ঘেঁসে যেত। কোঁৎ-মিল-বেন্থাম-আশ্রিত তাঁর হিতবাদের তত্ত্ব তিনি মানব হিতের জন্য প্রচার করলেও তাঁর হিতসাধনের ইচ্ছার মধ্যেও যেন একটা উগ্রসাংগ্রামিকতা ছিল, যেমন টলস্টয়ের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে তিনি হিংস্রভাবে অহিংসা তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, কতকটা সেই রকম।

মনে হয় এই বুদ্ধির গড়ন বঙ্কিম পেয়েছিলেন তাঁর শ্রেণী-স্বরূপ থেকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ শাসিত ভট্টপল্লীর অদূরস্থিত কাঁঠাল-পাড়ার এক বনেদী কুলীন বংশে তাঁর জন্ম। আমাদের দেশের শিক্ষিত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি বিধিমতেই লাভ করেছিলেন নিজের মধ্যে। তাঁর ভিতর শিক্ষার বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে ছিল প্রভূত তেজস্বিতা, দীপ্ত মননশীলতার সঙ্গে যথেষ্ট অন্যায় অসহিষ্ণুতা, শিল্পকে তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন করলেও তিনি তাঁর শ্রেণীজনোচিত আভিজাত্য বোধ ছাড়তে পারেননি, সর্বোপরি জীবনের বিভিন্ন পর্বে একাধিক প্রগতিশীল উদার আদর্শের প্রবক্তা হয়েও এক ধরনের রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে কোন সময়েই ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রক্ষণশীলতার সংস্কার তাঁর ভিতর বিশেষভাবে প্রবল হয়েছিল জীবনের শেষভাগে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব। এই যে নানা বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ একই ব্যক্তি সত্তায়, এ সবই

সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিশেষ কৌলিক শ্রেণীস্বরূপের জন্য। কিন্তু সব বলা হলেও যে কথাটা বলা বাকী থাকে তা হল এই যে, তিনি তাঁর শ্রেণীর পক্ষেও অসাধারণ মনস্বী পুরুষ ছিলেন। আমাদের দেশের সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে এতবড় ক্ষুরধার মনীষার অধিকারী স্রষ্টাপুরুষ আর কেউ জন্মাননি বলেই আমার ধারণা। এমনকি, বিদেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যেও তাঁর মত মনস্বী খুব বেশী জন্মেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই মনস্বিতাই তাঁকে শুধুমাত্র রসস্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তৃপ্ত ও নিঃশেষিত হতে দেয়নি, তাঁকে যুগপৎ দার্শনিক, সমালোচক, দেশনায়ক, সমাজনেতা, ধর্মব্যাখ্যাতায় পরিণত করেছে। অবশ্য তাঁর মূল পরিচয় রসস্রষ্টার ও কবির, কিন্তু এই পরিচয়ের পাশে পাশে তাঁর অন্যান্য পরিচয়গুলির হিসাব না নিলে তাঁকে তাঁর স্বরূপতঃ বোঝা যাবে না। আপাততঃ প্রথমে তাঁর রসস্থষ্টির ভূমিকার দিকে ফেরানো যাক।

॥ ২ ॥

আমরা দেখেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের পারিভাষিক অর্থে নন্দনবাদী ছিলেন না বা কলাকৈবল্যবাদী ছিলেন না। যে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সমাজের বা দেশের বৃহত্তর কল্যাণের যোগ নেই তেমন সাহিত্যসাধনায় তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর স্বসৃষ্ট সাহিত্যই তাঁর এই আস্থাশূন্যতার মূর্ত প্রমাণ। পাঠকের নিছক চিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেননি, সাহিত্য নিয়ে আমোদ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, যেমন আজকের দিনে অনেকানেক লেখকই তা করে থাকেন। কিন্তু আনন্দ সৃষ্টির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এসেও আমরা দেখতে পাই তাঁর মত শক্তিশালী আনন্দ স্রষ্টাই বা কয়জন হয়েছেন? তাঁর উপন্যাসগুলি অমৃতরসের নির্ঝর বলা চলে। তাঁর সেই সব উপন্যাস মাতৃভাষায় ও অনুবাদের মাধ্যমে পড়ে লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা আজও বিমল আনন্দ লাভ করে থাকেন। মনস্বিতার মত বঙ্কিমচন্দ্রের

রসচেতনা তথা সৌন্দর্যচেতনাও অতিশয় গভীর খাতবাহী ছিল। বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা থেকে বোঝা যায় এই সৌন্দর্যানুরাগ তাঁদের একটি কৌলিক বৈশিষ্ট্য। (পালামৌ ভ্রমণ দ্রষ্টব্য)। সেই অমিত সৌন্দর্যানুরাগ রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমের হাত দিয়ে কত অজস্র সোনার ফুলই না ফুটিয়েছিল। তিনি দৃশ্যতঃ নন্দনবাদী তথা কলাকৈবল্যবাদী না হয়েও শিল্পসৌন্দর্যের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁকে বলেন **didactic,** নীতিবাদী লেখক। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসের উপসংহার ভাগে সেই সব উপন্যাসের প্রধান কয়টি চরিত্রের যে পরিণাম তিনি অঙ্কন করেছেন (যথা কুন্দের বিষপানে আত্মহত্যা, শৈবলিনীর প্রতাপের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্তা হওয়া, ব্যভিচারিণী বিধবা রোহিণীর হত্যা ও হত্যার নায়ক গোবিন্দলালের সন্ন্যাসী হয়ে সংসারত্যাগ, প্রফুল্লর দেবীচৌধুরাণীর বেশ ছেড়ে প্রথাসিদ্ধ হিন্দু কুলবধূর ধরনে নিরবচ্ছিন্ন স্বামীসেবার আদর্শ গ্রহণ) তার থেকে তাঁদের মনে এই রকমের মূল্যায়নের উদ্ভব হয়েছে বলে বোধ হয়। কিন্তু এটি বঙ্কিমের সঠিক মূল্যায়ন নয়। অন্ততঃ উপন্যাসের শিল্প বিচারের বেলায় তো নয়ই। তাঁর মানস গঠনের ভিতর নীতিবাদের উপাদান ছিল ঠিকই, কিন্তু নীতিবাদকে ছাড়িয়ে বহুগুণে প্রধান ছিল সৌন্দর্যবাদ তথা রসরসিকতা। বস্তুতঃ তিনি তাঁর এই মজ্জাগত সৌন্দর্য ও রসচেতনার দ্বারাই বাঙালীর চিত্ত জয় করে ছিলেন। কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭) ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে যে গভীর রসচেতনার পরিচয় আমরা পাই তা একজন প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর কুললক্ষণের দ্যোতক। অন্যান্য উপন্যাসেও সৌন্দর্যপ্রাণতার পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উপন্যাস দুটিতেই যেন সে পরিচয় সবচেয়ে তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিমের এই সুনিবিড় সৌন্দর্যপ্রাণতার জন্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বারংবার

তাঁকে 'কবি' আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কবিত্বকে বঙ্কিম প্রতিভার সবচাইতে বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক লক্ষণ বলতে দ্বিধা করেননি। সমালোচকপ্রবর মোহিতলালের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে সকলে একমত না হতে পারেন এবং কাব্য সৃষ্টি না করেও (সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ ভাগে ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা মক্স করা ও ওই অধ্যায়ে ললিতা ও মানস নামক একখানি অপটু কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া বঙ্কিম গোটা জীবনে আর ছন্দ মিলিয়ে কাব্য রচনা করেননি) কেমন করে কবি হওয়া যায় সেই প্রশ্নে বিমূঢ় বোধ করতে পারেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনার ধারার মধ্যে যে একটা সূতক্ষী সৌন্দর্য চেতনা, রসিকচিত্তসুলভ সংবেদনশীলতা, নিসর্গ-প্রীতি ও শ্রেণীবর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ রূপেই বন্দনা করবার একটা তীব্র আকুলতা অনুস্যূত হয়ে আছে তা যে কোন মর্মজ্ঞ পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন। এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই কবিস্বভাবের স্বগোত্র; এইগুলিকে একান্তভাবে কবিজনোচিত বললেও অত্যুক্তি হয় না সুতরাং মোহিতলালের বঙ্কিমকে কবি আখ্যায় আখ্যাত করবার অভিনবত্বটুকু স্বীকার না করবার কোন যুক্তি নাই। আমার অন্ততঃ ওই নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিসংবাদ করবার প্রবৃত্তি হয় না। বরং বিশেষ একটি কারণে মোহিতলালের মতকে জোরালো ভাবে আঁকড়ে ধরতেই ইচ্ছা হয়। সেই কারণটি বলি।

চিন্তা-চর্চার ক্ষেত্রে, মতপ্রচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ আরোপ করেছেন। এই অপবাদের সবটুকুই লক্ষ্যহীন এমন কথা বলতে পারিনে, যদিও জানি শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিম সাহেব এই অপবাদ খণ্ডন করে একটি গোটা বইই লিখে ফেলেছিলেন এক সময়। আমার মত এক্ষেত্রে দ্বিধা-বিভক্ত। আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে প্রচারক, উনিশ শতকের নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, নব-হিন্দুত্বের ব্যাখ্যাকার, সেখানে তিনি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অল্পাধিক পরিমাণে

সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন। বাংলা দেশের উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ পাদ পর্যন্ত সময়পরিধির বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে তাঁর পক্ষে ওইরকম না হয়ে অন্যবিধ কিছু হওয়া বোধ করি সম্ভব ছিল না। কেন না ওই কালটিই হল ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়াতলে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবর্ধিষ্ণুতার কাল এবং ঠিক তদ্‌বিপরীতে ইংরেজ শাসকের কূটবুদ্ধিপ্রণোদিত প্রতিকূলতার ফলে মুসলমান সমাজের ক্রমক্ষীয়মাণতার কাল। একদিকে মুসলমানের মনে ছিল ইংরেজের হাতে তাদের রাজ্য হারানোর দুঃখ, অন্যদিকে হিন্দুর মনে ছিল মুসলমান শাসনে নানাবিধ অত্যাচার লাঞ্ছনা অপমানের স্মৃতির সন্তাপ ও তদ্ধাবদে মুসলমানের প্রতি বৈরিতা। এই মিশ্র ভাবের টানাপোড়েনের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়, এমনকি অতি বড়ো প্রতিভাবানের পক্ষেও সব সময় এমনতরো প্রভাবের উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব হয়নি, যুগপ্রভাব তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, যদিও সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে তাঁর মত কবিপ্রাণ মহামনস্বীর পক্ষে ওই মলিন প্রভাবের উর্ধ্বে উঠতে পারলেই সব দিক দিয়ে শোভন হত।

কিন্তু মতপ্রচারের ক্ষেত্র এক আর সৃষ্টির ক্ষেত্র আর। বুদ্ধিবাদিতায় আর হৃদয়বত্তায় দ্বন্দ্ব অহর্নিশ লেগেই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে স্রষ্টা, মানবচরিত্রের রহস্যোন্মোচনকারী সাহিত্যশিল্পী, সেখানে তাঁর চোখে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন অবান্তর এবং হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ নেই। সেখানে তিনি কবি, মানবমনের মর্মসন্ধানী, শ্রেণীচিহ্নবিরহিত মানুষের মহিমার উদ্‌গাতা। শ্রেণী সম্প্রদায় বর্ণ বা অন্য কোন চিহ্ন বর্জিত মানুষের যে নির্বিশেষ নিরাবরণ সত্তা, সেই সত্তার সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনে তিনি নিয়োজিত সাহিত্য সৃষ্টির উদার প্রশস্ত ক্ষেত্রে। এখানে চরিত্র সৃষ্টিই মুখ্য ; মানুষের শ্রেণী বা সাম্প্রদায়িক রূপের পরিচয় গৌণ। একক মানুষ নিয়েই সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের কারবার,

সামূহিক মানুষ তার মনোযোগসীমার বহির্ভূত বিষয়—এ কথাটা নেহাৎ কথার কথা নয়। এর সত্যতা যাচাই করা যায় যে কোন প্রথম শ্রেণীর সৃজনধর্মী রচনাকারের রচনার ধারার মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন, বলাই বাহুল্য। বুদ্ধিবাদিতার ক্ষেত্রে তিনি মধ্যবিত্ত হিন্দুশ্রেণীস্বার্থ সংবর্ধনের ধ্বজাধারক হতে পারেন কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই, তা যদি তাঁর থাকত তা হলে তিনি ওসমান, আয়েষা (দুর্গেশনন্দিনী), মতিবিবি (কপালকুণ্ডলা), দলনী বেগম (চন্দ্রশেখর), মবারক (রাজসিংহ) প্রভৃতি উজ্জ্বল মুসলমান চরিত্রগুলি এমন সহানুভূতির সঙ্গে আঁকতে পারতেন না। রাজসিংহ (১৮৮২) উপন্যাসের উপসংহারে গ্রন্থকারের যে নিবেদন আছে সেই অংশটি এই প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য, নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।...অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক সেই নিকৃষ্ট।"

এই ঘোষণায় ধর্মের প্রতি অবিসম্বাদী গুরুত্ব আরোপ ও ধর্মের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানকে সমীকৃত করা হয়েছে। এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরও যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষরূপে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করতে চান তাঁরা ঠিক বিচার করেন কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। অন্ততঃ স্রষ্টা পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, এই ঘোষণা তার এক অসংশয় প্রমাণ। কবিস্বভাবে সংকীর্ণতা থাকার কথা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল না; তবে প্রচারকের ভূমিকায় তাঁর ভিন্নতর রূপ প্রকটিত হওয়া সম্ভব।

॥ ৩ ॥

প্রবণতাভেদে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের স্রষ্টা রূপকে সমধিক প্রাধান্য দেন, কেউ বা তাঁর দ্রষ্টা রূপকে। প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তা রূপে মোহিতলালের নামোল্লেখ করা হয়েছে ; দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা ছিলেন দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় এক জায়গায় লিখেছেন—**"The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and nation-builder"** অর্থাৎ প্রথম জীবনের বঙ্কিম ছিলেন শুধুমাত্র কবি ও ভাষাশৈলীনিপুণ—পরবর্তীকালীন বঙ্কিম হলেন দ্রষ্টা ও জাতিসংগঠক। ভাষাভঙ্গী থেকেই বুঝতে পারা যায় বঙ্কিমের শেষোক্ত রূপ শ্রীঅরবিন্দের সমধিক মনোহরণ করেছিল। যে বঙ্কিম "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা ও আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ শ্রীঅরবিন্দ বারে বারে তাঁর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠিত চিত্তের অমেয় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। বরোদায় থাকা কালে তিনি **'Aryan Path'** পত্রিকায় বঙ্কিমের উপর কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন (ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য কর্তৃক শনিবারের চিঠি পত্রিকায় বাংলায় অনুবাদিত) ; আমার মনে হয় অনুভূতির গভীরতায় ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় অরবিন্দ ঘোষের ওই প্রবন্ধসম্ভার আজ পর্যন্ত বঙ্কিম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা। সত্য বটে তিনি তাঁর রচনা মালিকায় ভারতকে মাতৃভাবে বন্দনাকারী জাতীয়তার ঋত্বিক বঙ্কিমকেই বেশী বড় করে দেখিয়েছেন ; কিন্তু ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ, তাই নিয়ে মতভেদের অবসর থাকলেও বিসংবাদ চলে না। মোহিতলাল স্বয়ং কবি ছিলেন, তাই বঙ্কিমের কবিরূপ তাঁর সমধিক মনোহরণ করেছে ; আর অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। কাজেই দুইয়ের বিচারণায় তফাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। উভয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমকে দেখেছেন। এতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য

যতই প্রকটিত হোক বঙ্কিমের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য কিন্তু আরও দীপ্তিমান হয়েছে। একই সঙ্গে যিনি দুই বিপরীত কোটির কর্মাদর্শের অনুগামী মানুষের কল্পনা ও শ্রদ্ধা বৃত্তিকে উচ্চকিত করতে পারেন বুঝতে হবে তাঁর ব্যক্তিত্বের গড়ন অখণ্ড ও তাঁর প্রভাব পরিধি সুবিস্তৃত। বঙ্কিম যুগপৎ সৌন্দর্যস্রষ্টা ও জাতীয়তা যজ্ঞের হোতা। এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতারই পরিমাপক, তাঁর ব্যাপ্ত প্রতিভার দিগ্‌দর্শক।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বঙ্কিমের স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা দুই রূপই সমান প্রতিভাত হয়েছে। তিনি তাঁকে 'সব্যসাচী' এবং 'সাহিত্যে কর্মযোগী' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন "সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্মগ্রন্থ যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা যেখানেই তাঁহাকে আর্তস্বরে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন।"।

চিন্তন-মননের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র ছাড়াও বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও বঙ্কিম কেবলমাত্র সৃজনী প্রকৃতির অভিব্যক্তিকার অর্থাৎ স্রষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি একজন শক্তিমান সমালোচকরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি একই কালে সাহিত্য নির্মাণ করেছেন ও সাহিত্যের নেতৃত্ব দান করেছেন। আভিজাত্য ও অভিভাবকত্ব গুণ ছিল তাঁর পক্ষে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টিই করেননি, অসৌন্দর্য বারণও করেছেন। সাহিত্যের অগ্রগতির পথে যা কিছু প্রতিবন্ধক স্বরূপ, সেই আবর্জনা ও জঞ্জালের স্তূপ নিষ্করুণ সমালোচনার সম্মার্জনী হস্তে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে তাঁর অভ্যস্ত সৃষ্টিনিপুণ হাত

একটুও কাঁপেনি। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষাতেই বলি—"সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত সৃষ্টি কার্যে এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

পথের আবর্জনা দূর করা এবং পথ কেটে সামনে এগিয়ে চলা একই হস্তে সাধন করতে গেলে প্রচণ্ড শক্তির দরকার। বঙ্কিমের ভিতর এই শক্তি ছিল আর তা-ই তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যিকার আবির্ভাবের সূত্রপাত (১৮৬৫) থেকে কিঞ্চিদধিক এক দশক সময়ের মধ্যে (১৮৭৬—প্রথম পর্যায় বঙ্গদর্শন-এর সমাপ্তিকাল) তাঁর প্রভাব গোটা বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে সমগ্র শিক্ষিত বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্য হতে পেরেছিল। বলতে গেলে সাহিত্য সংসারে তিনি একটি ইনস্টিট্যুশন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর পাশে এসে বহু সাহিত্যসেবী ভিড় করেছিলেন উপযুক্ত পরামর্শ ও উৎসাহ লাভের প্রেরণায়। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে কবি ড্রাইডেন ও উনিশ শতকীয় ইংরেজী সাহিত্যে ডক্টর সামুয়েল জনসনকে কেন্দ্র করে সাহিত্যযশোপ্রার্থীদের যে রকম ভিড় হত, বঙ্কিমও সে রকম একটি বিদগ্ধ লেখক জমায়েতের মধ্যমণি ছিলেন তাঁর নিজ ক্ষেত্রে। তিনি ওই সমাবেশে সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করতেন স্বকীয় গুণে ও অধিকার মহিমায়। দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এঁরা সব বঙ্কিমের সহযোগী ও হাতে-গড়া লেখক। আর যুবাবয়সী কবি রবীন্দ্রনাথেরও যে তিনি সবিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন সে খবর তো খোদ্ জীবনস্মৃতির পাতাতেই উল্লিখিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় ধর্মচিন্তার প্রসঙ্গে

মতানৈক্যের সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে তর্কদ্বন্দ্বেও প্ররোচিত করেছিলেন। সে কথা যথাস্থানে।

॥ ৪ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মনস্বী পুরুষ ছিলেন, এই তথ্য একাধিক বার বিজ্ঞাপিত হয়েছে এই নিবন্ধে। এই বিজ্ঞাপনার উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হল সমকালীন সাহিত্য চর্চাকারীদের মনে এই ভাব মুদ্রিত করবার চেষ্টা করা যে, নিছক রসসাহিত্যের চর্চা তথা সুকুমার ভাবের কর্ষণার দ্বারা সাহিত্য থেকে বাঞ্ছিত ফললাভের আশা কম, সাহিত্যসেবাকে সমাজজীবনে যথার্থ সুফলপ্রসূ করে তুলতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শই আমাদের পক্ষে একমাত্র মান্য ও অনুসৃতব্য আদর্শ। অর্থাৎ আমাদেরও যুগপৎ রসরসিকতার ও মননশীলতার চর্চা করতে হবে বঙ্কিমের মত; তবে যদি বাগ্‌দেবী প্রসন্না হয়ে দু'হাতে আমাদের কৃপাবর্ষণ করেন। সমাজকে মজবুত আর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যও এই আদর্শের মান্যতা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, ইদানীং আমরা রম্যতার অনুশীলনের উপরই যেন বেশী ঝোঁক দিয়ে ফেলেছি এই আদর্শ বিস্মৃত হয়ে। তার যা ফল-ফলবার ফলছে ঃ জাতীয় চরিত্র ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে, সমাজ নিম্নগামী হচ্ছে।

বঙ্কিম ভারতীয় দর্শনের সবিশেষ অনুশীলন করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তাঁর অধিকার ছিল বিলক্ষণ। আমাদের দেশের স্রষ্টা সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রণালীবদ্ধ ভাবে দর্শনের চর্চা বোধ হয় আর কেউ করেননি বঙ্কিমের মত। তাঁর সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ একটি অসাধারণ মূল্যবান রচনা। এ বাদে বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব এ সব শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। তাঁর বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ আছে তাঁর বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫) পুস্তকে। ইতিহাসে তাঁর প্রচুর কৌতূহলের পরিচয় বিকীর্ণ আছে তাঁর ইতিহাসবিমিশ্র উপন্যাসগুলিতে (যথা, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা,

মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি) ও ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়ে (রাজসিংহ ও সীতারাম)। তিনি একটি বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), সাম্য (১৮৭৯), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮৪) এবং বিবিধ প্রবন্ধ, দুইখণ্ডের (১৮৮৭ ও ১৮৯২) নানা নিবন্ধ, বিশেষতঃ বাংলার কৃষক সম্বন্ধীয় নিবন্ধগুলি। ধর্মতত্ত্বে তাঁর প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয়বাহী গ্রন্থনিচয় কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা (১৯০১)।

এ সবের উপরেও মনস্বী বঙ্কিমের আর একটি কৃতিত্ব হল তিনি তৎকালীন আধুনিকতম পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ও মাতৃভাষার সেই পরিচয়ের ফলশ্রুতি পরিবেশনে বিমুখ ছিলেন না। মুখ্যতঃ বাংলাভাষী ও ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকদের কল্যাণের জন্যই তিনি এই পরিশ্রম স্বীকারে যত্নবান হয়েছিলেন তা বেশ বুঝতে পারা যায়। এতে তাঁর সমাজহিতকামী আত্মত্যাগী চিত্তের পরিচয়টিই সুঅভিব্যক্ত। ইংরেজ মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ ও ফরাসী দার্শনিক অগাস্টাস কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ এই দুই তাঁর কালের পক্ষে আধুনিকতম চিন্তাদর্শনের প্রতি তিনি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর চিন্তার ছাঁচের মধ্যে এই দুই দর্শনের ছাপ বারেবারেই উঁকি দিয়ে গেছে। পাশ্চাত্ত্যের সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা (যথা, ফুরিয়ারিজম, সিণ্ডিক্যালিজম, মার্ক্সিজম প্রভৃতি)-র সঙ্গেও যে তিনি অপরিচিত ছিলেন না তার প্রমাণ বহন করছে কমলাকান্তের দপ্তরের কোন কোন প্রবন্ধ ও সাম্য পুস্তক। এই সমস্ত রচনার অধিকাংশ প্রথম পর্যায় বঙ্গদর্শনের আমলে (১৮৭২—৭৬) লেখা। দেখা যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনা কালে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা চেতনা পাশ্চাত্ত্যমুখী প্রগতিশীল ভাবনা-ধারণার অভিঘাতে বিশেষভাবে আলোড়িত হয়েছিল। তিনি পাশ্চাত্ত্যের অর্থনৈতিক সাম্যাদর্শে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সেই আকর্ষণেরই

ফলস্বরূপ সাম্য পুস্তক লেখেন। কিন্তু আমরা নিরাশ হয়ে লক্ষ্য করি কালক্রমে তাঁর চিন্তার পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটেছিল এবং ধীরে ধীরে তাঁর সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়ে উৎসাহের সজীবতা জুড়িয়ে আসে। তিনি এক সময়ে সাম্য গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দেন। ঠিক কী কারণে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছিল বলা শক্ত, তবে মনে হয় ধীরে ধীরে অর্জিত শিক্ষার উপরে কৌলিক সংস্কার বড় হয়ে উঠে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা একজন বৈপ্লবিক চিন্তানায়করূপে পেতে পেতেও শেষ পর্যন্ত পেয়ে হারালুম। তিনি প্রগতির শিবির ত্যাগ করে রক্ষণশীলতার খাতায় গিয়ে নাম লেখালেন। অর্থাৎ ভাটপাড়া নিয়ন্ত্রিত রাঢ় বঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জানিবদ্ধ সংস্কার আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত একজন প্রকর্ষবাণ মনীষীর অর্জিত সংস্কারের উপরে শেষ অবধি জয়ী হল। প্রখর মনীষার দীপ্ত তেজের আত্মঘাতী দাহিকাশক্তির এটি একটি বিমর্ষ দৃষ্টান্ত। বোধ হয় মেধা ও মনস্বিতা ব্যবচ্ছেদী বুদ্ধিচালিত হলে এই রকমটাই হয়। যে মনীষা সুপ্রযুক্ত হলে বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে উদার ভাবনার বহুতর সুসমৃদ্ধ ফসল ফলাতে পারত তা রক্ষণশীলতার খাতে প্রবাহিত হয়ে বন্ধ্যাত্বকে বরণ করে নিতে বাধ্য হল, এর চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কী হতে পারে?

'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যাবার পর বঙ্কিম 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামক দুইটি পত্রিকার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হন। এই পত্রিকাদ্বয়ের আমল থেকেই বঙ্কিমের মনোজীবনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকে। তিনি সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ছেড়ে সহসা হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের ভিত্তিতে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের নূতন করে মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হন এবং তাকে একটি আধুনিক কালোচিত আশ্রয় দেবার চেষ্টা করেন। যে বঙ্কিম কিছুকাল আগে পর্যন্ত অর্থনৈতিক সাম্যের উদ্‌গাতা ছিলেন তাঁকে হঠাৎ দেখা গেল পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তনে গদগদ হয়ে উঠতে, অবশ্য সনাতনীদের মত বিচারহীন-

ভাবে এ কাজ করেননি তিনি; তাঁর হাতে প্রধান আয়ুধ ছিল পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ। তাতে তাঁর উপস্থাপন আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল : যুক্তিবাদের খড়্গাঘাতে তিনি সকল প্রকার বিরূপতার খণ্ডনে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কোঁৎ-মিল-বেন্থামের চ্যালার পক্ষে এ এক খেলাই বটে—অতি বিপজ্জনক খেলা! এই চেষ্টারই ফলশ্রুতি হল কৃষ্ণচরিত্র, অনুশীলনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও ইংরেজীতে লিখিত **Letters on Hinduism.** কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে নবজাগ্রত হিন্দুসমাজের কাছে আদর্শ পুরুষরূপে প্রতিভাত করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন—এ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের মোহনবংশীধারী রাধিকাবল্লভ গোপিকারমণ কৃষ্ণ নন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঞ্চালক গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে সকল বৃত্তি নিচয়ের সুসামঞ্জস্য সাধিত হয়েছিল এবং এই সামঞ্জস্যবিধানের তত্ত্বকেই তিনি নবীন হিন্দু-সমাজের সমক্ষে তুলে ধরেন বরণীয় আদর্শরূপে। একে তিনি নাম দেন অনুশীলন তত্ত্ব। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদের মিশল দিয়ে নূতন এক ধর্মপথ খাড়া করবার চেষ্টার পিছনে যে পরিমাণে ছিল বুদ্ধির প্রণোদনা ও রক্ষণশীলতার মোহ সে পরিমাণে গভীর ধর্মোপলব্ধি ছিল কিনা সন্দেহ। বঙ্কিম সমস্ত জিনিসটাই মননের স্তর থেকে বিচার করেছিলেন—কেন না তিনি মূলত ছিলেন নৈয়ায়িক, র‍্যাশানালিস্ট—, ধ্যাননের স্তর থেকে নয়। এ-জাতীয় চেষ্টার ফল কখনও জনমনে গ্রাহ্য হতে পারে না, ভালোর জন্যে হোক মন্দের জন্যে হোক হিন্দুসমাজের উপরেও এই আদর্শ বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। আজ বঙ্কিম প্রচারিত অনুশীলনের প্রভাবের ছিঁটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের তত্ত্বপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ যুবক মাত্র। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই বয়সেই বঙ্কিমের অনুশীলন সম্বন্ধীয় একটি বক্তব্যের (বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমাদের শুনিয়েছেন যে, সত্য পরম ধর্ম হলেও কোন কোন অবস্থায় অসত্য

ধর্মেরই রূপান্তর এবং সেস্থলে ধর্মার্থে অসত্যই বিহিত) প্রতিবাদ করা আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে আদি ব্রাহ্ম সমাজ হলে এক প্রতিবাদ-সভা ডেকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ('জীবনের ঝরাপাতা', পৃঃ ৩৪-৩৫) থেকে জানতে পারা যায় এই নিয়ে কলকাতার বিদগ্ধ মহলে তখন হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলে তাঁরা সে সভায় যোগ দেননি। ওই সব জ্ঞানীগুণীরা যা-ই বলুন, আমাদের চিত্তের পক্ষপাত কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিকে। সর্বাবস্থায় সত্যই মান্য ; অসত্য কোন অবস্থায় কোন কারণেই গ্রহণীয় হতে পারে না। পরবর্তীকালে গান্ধীজীও গীতার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন ; কিন্তু গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে বঙ্কিমের সিদ্ধান্তের বিপরীত।

যাই হোক, সকল ব্যাপারে সকলের সিদ্ধান্ত এক না হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের কথা হল বঙ্কিমের মনীষা আমাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে কিন্তু তাঁর মনীষাপ্রসূত সকল মতামত নয়। তিনি জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্‌ঘোষক হয়েও ইংরেজ শাসনের তথাকথিত মাহাত্ম্য একটু অধিক মাত্রায় কীর্তন করেছিলেন, বলে আমাদের ধারণা। তাঁর বাহুবলের জয় ঘোষণায়ও একটু বাড়াবাড়ির গন্ধ পাওয়া যায়। কৃষক পরাণ মণ্ডলের দুঃখে তিনি বিগলিতচিত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দেখা যায় ভারতের গ্রামজীবনের সামগ্রিক চিত্র তাঁর কল্পনায় কম-বেশী অনুপস্থিত। তিনি উপন্যাসে গ্রামের চিত্র এঁকেছেন কিন্তু গ্রামবাসীদের সমস্যা নিয়ে তত মাথা ঘামাননি যত মাথা ঘামিয়েছেন তাঁরই স্বশ্রেণীভুক্ত শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্তদের সুখ-দুঃখ নিয়ে। নাগরিক বিদগ্ধ সমাজের প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র নাগরিক সমাজের ধ্যানধারণারই বেশী অনুরক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। শ্রেণী হিসাবে তৎকালে অনুন্নত ও ইংরেজ কর্তৃক কূটনৈতিক প্রয়োজনে

অবহেলিত মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের সহানুভূতি স্পষ্টতই খুব বেশী আকর্ষণ করতে পারেনি।

এহো বাহ্য। বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যজীবনেব শেষ পর্যায়ে যে তিনখানি বিশিষ্ট উপন্যাস লিখেছিলেন—আনন্দ মঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) ভাবসাদৃশ্যের দিক থেকে তাদের একটি উপন্যাসমালিকা বলা যায়। ওই উপন্যাসত্রয়ে তিনি একটি বিশেষ তত্ত্ব পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। তা হল অনুশীলন তত্ত্বের আধারে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন। অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে সন্দর্ভে যে মত তিনি কিছুকাল যাবৎ বিধিবদ্ধভাবে প্রচার করছিলেন, তাকেই তিনি শিল্পরূপ দেন এই উপন্যাসত্রয়ীতে। পূর্বেই আভাস দেবার চেষ্টা করেছি, এ মত অগ্রসর চিন্তাধারার মানদণ্ডে অল্পবিস্তর প্রতিক্রিয়াশীল। এ স্বপ্ন আমাদের আর আজকাল মন কাড়ে না, এমনকি বঙ্কিমের সময়েও ওই মতের যৌক্তিকতা কতখানি ছিল তা সন্দেহের স্থল। গোঁড়া হিন্দুয়ানির টানেই হোক আর অন্য যে কোন কারণেই হোক বঙ্কিম শেষ বয়সে ক্রমশঃ রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকছিলেন, এ তথ্য আজ অতি স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত চেষ্টা হল গীতাধর্মে কর্ষিতা বিবিধ শাস্ত্র নিপুণা দেশোদ্ধার ব্রতে দীক্ষিত সন্তানদলের অধিনায়িকা ভবানী পাঠকের মানস শিষ্যা দেবী চৌধুরাণীকে প্রফুল্ল বা 'পিপি' রূপে সতীন-অধ্যুষিত স্বামী-গৃহের বদ্ধ খাঁচায় পোরার চেষ্টা। হিন্দু গৃহবধূর কৌলিক আচারের দোহাই পেড়ে এ নির্দেশ জুলুমেরই নামান্তর এবং এ কালের কোন কোন স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কের **'Back to kitchen'** 'রান্নাঘরে ফিরে যাও' হুকুমনামারই স্বগোত্র।

আলোকের কবি রবীন্দ্রনাথ

অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের তৃষ্ণা মানুষের একটি স্বাভাবিক তৃষ্ণা। অন্ধকারে আমরা ভয় পাই, আলোয় এলে স্বস্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। মানুষের এই স্বাভাবিক আলোর তৃষ্ণাকে কি বস্তুগত কি প্রতীকী দুই অর্থেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আলোর আক্ষরিক অর্থ আলোক, দীপ্তি, ভাস্বরতা ; আলোর প্রতীকী অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, জ্যোতির্ময়তা। অন্ধকারের এক মানে আঁধার, তমঃ, কালিমা ; অন্য মানে অজ্ঞান, তামসিকতা, মলিনতা। মানুষ এই উভয় অর্থেই সতত অন্ধকার থেকে আলোর তীরে সমুত্তীর্ণ হবার জন্য যত্নশীল। "তমসো মা জ্যোতির্গময়"—মানুষের সনাতন প্রার্থনা।

আলোর অভিমুখে মানুষের এই নিরন্তর ধাবমান যাত্রাকে যদি এ কালের পটভূমিতে সবচেয়ে সার্থক আর সবচেয়ে সুন্দর শারীরী রূপ দেওয়া যায় তবে যে আকারে আমরা তাকে অভিব্যক্ত দেখতে পাব তার নাম—রবীন্দ্রনাথ। 'রবীন্দ্রনাথ যেন পুঞ্জ পুঞ্জ আলোর এক মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর জন্মমাস থেকে শুরু করা যাক। বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁদের কিছু-কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, বৈশাখ মাসে সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করেন। এই সময়ে সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর থাকে এবং সরাসরি পৃথিবী গ্রহের উপর আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে। বৈশাখ মাসের জাতক রবির তেজে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথ সার্থকনামাও বটেন। খুব সম্ভব রবির সঙ্গে জাতকের নৈকট্যের কল্পনা থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অভিভাবকেরা জাতকের এইরূপ নামকরণ করেছিলেন। এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাম

আর কিছু হতে পারত না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের তাবৎ কর্মে ও ভাবনায় এই নামের সার্থকতা সর্বাংশে প্রতিপন্ন করেছিলেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য ও কাব্য অসাধারণ আলোর বিভায় পূর্ণ। বস্তুতঃ আলোর পিপাসা রবীন্দ্র কাব্যের একটি মুল স্থর বলা যেতে পারে। মহাকবি গ্যেটের সম্বন্ধে শোনা যায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি "আলো, আরও আলো" বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। আলোর জন্য এই আকুল আর্তি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের আকৃতি স্বরূপ। বস্তুতঃ এই আকৃতির দ্বারা তিনি জীবনভোর "অধিকৃত" ছিলেন। একটা আবেশের মতো আলোর ক্ষুধা তাঁকে গোটা জীবন চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং কোথাও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি।

রবীন্দ্র-জীবন পর্যালোচনা করে দেখলে আমরা দেখতে পাব, তাঁর সাধনা পর্ব থেকে পর্বান্তরে, ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে, কর্ম থেকে কর্মান্তরে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার এক অন্তহীন ইতিবৃত্ত। যখনই তাঁর জীবনে কোনো একটা কৃতিত্ব বা সাফল্য অর্জিত হয়ে গেছে তখনই তিনি তাকে অন্ধকারের কোঠায় ঠেলে ফেলে দিয়ে নূতনতর আর উচ্চতর আলোক সন্ধানে অন্য এক অভিযানে বেরিয়েছেন এবং যতদিন না সেই আলোর আয়ত্তের মধ্যে এসেছে ততদিন চেষ্টায় ঢিল দেন নি। এইভাবে অবিশ্রান্ত ধারায় চলেছে তাঁর ক্লান্তিহীন পথ পরিক্রমা। সাফল্যের "দাঁড়ে বসে বিশ্রাম নেওয়ার" অভ্যাস কবির আদৌ ছিল না। অন্তহীন অতৃপ্তি আর যন্ত্রণা আর অচরিতার্থ কর্মের বেদনা তাঁকে নিরন্তর সম্মুখপথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এই অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য সম্মুখ টানের ফলেই আমরা দেখতে পাই, যে-কবি উনিশ শতকীয় বুর্জোয়া জীবনযাত্রা সুলভ আশাবাদ আর ঔদার্যবাদ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সমাজতন্ত্রী প্রত্যয়কে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নেওয়ার কিনারায় এসে পৌঁছেছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে এই পর্বের

শুরু এবং শেষ বয়সের একাধিক কাব্যে তার আরও ফলদায়ক পরিণতি লক্ষ্য করা গেছে। নূতনকে আগ্রহভরে গ্রহণ করাই শুধু নয়, পুরাতন অনেক বিশ্বাসের সমাধিও তাঁর এই শেষ পর্বের জীবনে রচিত হতে আমরা দেখলুম। যে সকল আপাতরম্য ধ্যান-ধারণার আবহের মধ্যে তাঁর প্রথম দিককার জীবন লালিত হয়েছিল, যেমন আরও অনেক ধনী সন্তানের জীবন লালিত হয়েছে কলকাতার উনিশ শতকীয় ভোগকেন্দ্রিক নাগরিক পরিবেশের মধ্যে—তার একটা মোটা অংশ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো অবজ্ঞার ধূলায় নিক্ষেপ করতে তাঁর বাধেনি যখন বুঝেছিলেন এই সকল ধ্যান-ধারণাকে এ যুগের কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সত্যিই খুব কঠিন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র, ধনীর তথাকথিত বদান্যতা আর শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার অভ্যাস, অনর্জিত সম্পদভোগের 'বিধিদত্ত' সংস্কার বর্তমান কালের সাম্য আর শ্রমশীলতার ধারণার সঙ্গে একেবারেই বেখাপ্।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে কবির সর্বাবস্থায় ভগবানের অমোঘ মঙ্গলময়তায়ও বিশ্বাস টাল খেয়েছিল এবং এই অনুমানের পক্ষে কিছু কিছু উদ্ধৃতিও তাঁরা দেন। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত যেতে আমরা নারাজ। দুই-চারিটি সুবিধাধর্মী উদ্ধৃতি মাত্র উৎকলন করে কিছুই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এই অনুমান সত্য হোক আর না-ই হোক এ বিষয়ে কিন্তু কোনোই সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ধারণা-বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর শেষ বয়সের ধারণা-বিশ্বাসের প্রায় অসেতুসম্ভব ব্যবধান।

পৌঢ়ত্ব মানুষকে রক্ষণশীল করে, বার্ধক্যে রক্ষণশীলতা আরও প্রস্তরীভূত হয়—এই আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় একথা সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। বরং তার উল্টো। তিনি জীবনের পথে যত অগ্রসর হয়েছেন তত রক্ষণশীল অভ্যাস ও প্রবৃত্তি তাঁর জীবন থেকে অসার নির্মোকের মতো খসে গেছে। সংস্কার থেকে সংস্কারাতীতে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে উত্তরণের সাধনাই রবীন্দ্রজীবন ও

কাব্যের মূল সাধনা।

এ জিনিস সম্ভব হত না যদি-না আলোর পিপাসায় কবির অন্তর ও বাহির আবাল্য ভরে থাকত। অন্ধকারকে দু'হাতে ঠেলে ঠেলে সেই যে জীবনারম্ভে আলোর উজানে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, সারা জীবনে সে যাত্রার আর নিবৃত্তি হয়নি। "আলো আমার আলো ওগো, আলো ভুবনভরা, আলো নয়ন-ধোয়া আমার আলো হৃদয়হরা।" 'পূজা' পর্বের একটি গানে কবি তাঁর জীবন বিধাতাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে কী উৎসবের লগনে। সব আলোটি কেমন করে ফেল আমার মুখের 'পরে, তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে॥" আলো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত যে গান বেঁধেছেন তার সীমা-সংখ্যা নেই। গ্যেটের আলোর তৃষ্ণার মধ্যে যেমন একটি করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও কোনো কোনো গানে আলোর আকুলতা জানাতে গিয়ে একটা শূন্যতার বেদনা চাপা থাকেনি, ঢাকা থাকেনি হৃদয়ের হাহাকার: "কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো, বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।" আবার অন্য একটি গানে জীবনদেবতার কাছে এই বলে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করেছেন যে, আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে তিনি জীবনের সব দীনতা মলিনতা মুছে দিন, আপনাকে নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকার আমিত্ব ঘুচিয়ে দিন। "আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধূলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।" ভিন্ন একটি গানের দুটি চরণ: "আলোয় আলোকময় করে হে এস আলোর আলো, আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।"

যেমন গানে তেমনি কবিতায়ও আবার অজস্র বন্দনা। কবি জীবনস্মৃতিতে তাঁর প্রথম জীবনের বিখ্যাত কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে যে কাহিনী তুলে ধরেছেন তার মধ্যে সূর্যালোকের ভূমিকাটাই মুখ্য। "একদিন সকালে

বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছ-গুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"

বাস্তবিক, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গই বটে। "আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের 'পর..." ইত্যাদি। রবির আলো প্রাণের গভীরে প্রবেশ করতেই যেন কল্পনার প্রবাহ, যা এতদিন নিরুদ্ধ হয়ে ছিল এবং আত্মপ্রকাশের বেদনায় ভিতরে ভিতরে গুমরে গুমরে মরছিল, হঠাৎ বাঁধভাঙা বন্যার মতো বাইরে আছড়ে পড়ল, তারপর নির্ঝরিত ধারায় একটানা বয়ে চলতে লাগল। রবিকরস্পর্শ কবি-কল্পনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে কবিকে পৃথিবীর মধ্যিখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। কবিসত্তার জাগরণে আলোর মহামূল্য ভূমিকার এই স্বয়ং-স্বীকৃতি কবির পরবর্তী কাব্যজীবনকে বুঝতে ও বোঝাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আলো শুধুই রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় পৃথিবীর উদার উন্মুক্ত বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের চাবিকাঠি নয়, একই কালে তা অন্তরকেও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করে তোলার মুখ্য উপকরণ। ভিতর-বাহির দুইকে নিয়ে এবং দুইকে পরিব্যাপ্ত করেই ওই আলোর সঞ্চরণ।

'প্রভাত-সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতায়ও ("প্রভাত-উৎসব") একই ভাবের দ্যোতনা। "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি। প্রভাত হল যেই কী জানি হল এ কী, আকাশ পানে চাই কী জানি কারে দেখি।"

জীবনের প্রথম পর্বের কবিতায় যেমন আলোর মহিমার বন্দনাগীতি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, তেমনি শেষ পর্বের কবিতায়ও একই অনুভূতির ব্যঞ্জনা—ভিন্ন অনুষঙ্গে ভিন্ন রচনাশৈলীতে। বাইবেলে আছে, ঈশ্বর বললেন আলো হোক, আর অমনি আলো হল। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের "আমি" কবিতায় কবি নিজেকে প্রায় স্রষ্টা ঈশ্বরের ভূমিকায় সমাসীন করে একই ভাবের অভিব্যক্তি দিয়েছিলেন ঃ "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে—জ্বলে উঠল আলো পূর্বে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর, সুন্দর হল সে।" সর্বত্র আলোর লীলাখেলার মাহাত্ম্য-কীর্তন, আপনাকে বিধাতার স্থলাভিষিক্ত করে বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্পের" জয়গান। সৃষ্টির লীলাখেলায় আলোর ভূমিকাই প্রধান। কারণ আমরা জানি পান্না যে সবুজ হয় চুনি হয় রাঙা গোলাপ হয় বর্ণসুষমামণ্ডিত, সে সূর্যালোকেরই রহস্যময় অনু-স্রাবণের ফলে। বস্তুভেদে তার ক্রিয়া ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভার মূলতঃ আলোর ক্ষরণেরই পরিণাম ফল মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের "পরমমূল্য" কবিতায় নিজেকে নিজে সম্বোধন করে লিখেছেন—"একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়, আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ সূর্যনক্ষত্রের সাথে।" রূপের দুর্লভ সত্তা কথা কটিকে যদি আমরা আক্ষরিক অর্থেও ধরি তা হলেও দেখতে পাব কবির ক্ষেত্রে এই বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। কী অপরূপ রূপবান মানুষ ছিলেন তিনি। শেষ বয়সের অসাধারণ দিব্যকান্তিযুক্ত রবীন্দ্রনাথকে যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই জানেন সূর্য-নক্ষত্রের সাথে একাসনে বসবার অধিকার ছিল তাঁর সহজাত। বলতে গেলে তিনি সূর্যেরই সমগোত্র ছিলেন। কোন একজন আধুনিক লেখক রবীন্দ্রনাথকে "সূর্যসনাথ" অভিধায় ভূষিত করেছেন। এ বিশ্লেষণ অতিশয় খাঁটি। বাউলদের আলখাল্লার ধরনে

দীর্ঘ প্রলম্বিত পরিচ্ছদ মণ্ডিত, শ্বেতশুভ্র কেশদাম আর আবক্ষ শ্মশ্রুশোভিত উত্তরকালীন রবীন্দ্রনাথের শারীর অস্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কেবল মাত্র 'ঋষি' মনে করে বর্ণনার আত্মপ্রসাদ লাভ করার যো ছিল না, মনে হত এত বড়ো জ্যোতির্ময় পুরুষ বাঙালী জাতির মধ্যে আর আবির্ভূত হননি—না একালে না সেকালে। কবি যত বয়ঃসীমার পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন তত তাঁর ভিতর-বাহির রূপের আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ভাবনা কল্পনা-মননের মধ্যে নিত্য বিরাজমান এবং আলোর পিপাসায় সতত-সঞ্চালিত থাকার ফলেই যে তাঁর দেহকান্তির এমন উত্তরোত্তর সৌন্দর্যময় বিবর্তন ঘটেছে তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না—যদিও এই অনুমানের পক্ষে কার্যকর প্রমাণ দেওয়া কঠিন।

প্রমাণদান সম্ভব না হলেও এই প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তির শরণ নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন বাগীশ্বরী অধ্যাপক প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক ডঃ জহীদ সুরাবর্দি একদা এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব দেহকান্তি প্রত্যক্ষ করে এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, তিনি বৈদিক যুগের সূর্য-উপাসক ঋষিদের ধারা বেয়ে এ কালের পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন, কিংবা তাঁর পিতৃত্বকে আরও দূর অতীতে বিলম্বিত করা যায়। অন্যূন দশ হাজার বৎসর পূর্বেকার সুমের-সমের বা অ্যাসিরীয় সভ্যতার প্রাচীরগাত্রের উৎকীর্ণ প্রতিকৃতির দৌলতে যে কজন জ্ঞান-তপস্বী বা রাজার অস্পষ্ট মুখাবয়বের সঙ্গে আমরা অল্প-বিস্তর পরিচিত, কোথায় যেন তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখাবয়বের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই রকম তরঙ্গিত শ্মশ্রু, সেই রকম জ্ঞান-বৃদ্ধের ভঙ্গিমা। করোটির আদলেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য। সদ্য লোকান্তরিত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ইংলণ্ড বাসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'স্মৃতিতরঙ্গ' পুস্তকে লিখেছেন—

যখন রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন শহরের রাস্তায় বেরোতেন, তাঁর যীশুখৃষ্টের তুল্য চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে ছেলের দল তার পিছু পিছু চলত, পিছন থেকে তাঁকে অবিকল যীশুর মতো দেখাত। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর রচনায় ("রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু") পাই, রামানন্দবাবু কথোপকথনকালে রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, "আসলে আপনার চেহারাটাই রাজসিক। একখানি ফর্সা কাপড় পরিলে আপনাকে রাজার মতো দেখায়।"

কারও কল্পনায় তিনি ঋষি, কারও কল্পনায় যীশুখৃষ্ট, কারও কল্পনায় রাজা। আসলে সব কটি কল্পনারই মূলকথা এক। অপূর্ব আলোময় তাঁর দেহকান্তি। এই বাহ্য সৌন্দর্য যে তাঁর অন্তর্নিহিত আলোকিত সত্তারই বিচ্ছুরণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি, নাট্যকার ও সুরকার

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে তাঁর প্রতিভার আলোচনা করা আমাদের একটি জাতীয় কৃত্য। এই কর্তব্য পালন না করলে শুধু যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করা হবে তা-ই নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গেও আমাদের সম্পর্কের ক্ষীণতার প্রমাণ দেওয়া হবে। এ দুই সম্ভাবনার কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। তার উপর একের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্যে অপরকে তাঁর ন্যূনতম প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত করার মধ্যে আর যাই হোক, বিচারের সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায় না। বর্তমান বাংলাদেশের ধারাধরন দেখে আমাদের জাতীয় মানসিকতায় সেই রকমেরই কিছু একটা ঘটেছে বলে আমার সন্দেহ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র কাব্য-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় স্বর্গত সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন—

"বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভা যে যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে, আশেপাশের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধদীপ্তি জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন।"

এ-কথা অতিশয় যথার্থ। কাজেই আমরা যদি এই শতবার্ষিকীর বৎসরে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা স্মরণ করি ও সেই উপলক্ষে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার পর্যালোচনায় কিয়ৎপরিমাণে আত্মনিয়োগ করি তা হলে আমাদের পূর্ব-ঔদাসীন্যের কথঞ্চিৎ শোধন হতে পারেও বা। বাংলার এই শক্তিশালী কবি-গীতিকারের প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান জ্ঞাপনের যোগ্যতা আমাদের না থাক আমরা এই সুযোগে অন্ততঃ

আমাদের পূর্বতন প্রত্যবায়ের আংশিক স্খলনে যত্নবান হতে পারি। সেইটেই বা কী কম কথা।

এই রকম নানা কথা চিন্তা করে এখানে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা এ-নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, —আমাপেক্ষা অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন, তাঁরা সে কাজ করবেন —আমি শুধু এখানে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার কতকগুলি বিশেষ দিকের উপর আমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব বলে স্থির করেছি। স্থানসংকুলানের জন্যেও বটে এবং আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্যেও বটে, এই রকম আলোচনাই আমার পক্ষে সমধিক প্রশস্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ ছিলেন কবি। তাঁর কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু খুব বিচিত্রপথগামী না হলেও যে তিনটি ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে সচরাচর কবির কাব্যস্ফূর্তি অবলীলায়িত হয়—কবিতা, নাটক ও সঙ্গীত—এই তিনটি বিভাগেই বলা যেতে পারে তিনি সমান স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সঞ্চরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে তাঁর নাট্য ও সঙ্গীত-প্রতিভা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই কথাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। আমাদের দেশের আধুনিক পর্বের সমালোচনা-সাহিত্যে এ-কথাটা এখনও তেমনভাবে স্বীকৃতি না পেলেও পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের মধ্যে এ-কথা একপ্রকার অপ্রতিবাদ্য সাহিত্যিক সংস্কারের মত গৃহীত হয়েছে যে, নাটকই হচ্ছে কাব্যপ্রতিভার উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠভূমি। সেই কাব্যই হল উৎকৃষ্ট, যার মধ্যে কবির আত্মলীন কল্পনা ও বহির্মুখী কল্পনার সমন্বয় সাধিত হয়। শেকসপীয়রের নাটকে এই আত্ম-ভাবনা ও বিষয়মুখ ভাবনার সুষ্ঠুতম সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে বলে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তার পরেই কাব্যশক্তির সঙ্গে গীতিধর্মী প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উল্লেখ করতে হয়। কবিতা

ধ্বনিনির্ভর, সুতরাং প্রকারান্তরে সুরনির্ভর। সুর ছাড়া কবিতা হয় না। কাব্য এবং সঙ্গীত একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর কবিরূপে লোকধন্য হয়েছেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অনেকেই হয়তো সঙ্গীতকার নন, কিন্তু তাঁদের সকলেরই কবিতার মধ্যে অল্প-বিস্তর সঙ্গীতবোধ অর্থাৎ সুরবোধ অনুস্যূত হয়ে আছে। এ না হয়ে যায় না। কারণ সুরই কবিতার প্রাণ। এ-কথা যদি সাধারণ কবির বেলায় সত্য হয় তা হলে যে-কবির মধ্যে একই কালে কাব্যশক্তি ও সঙ্গীতশক্তির অভিপ্রকাশ ঘটেছে, তাঁর বেলায় এ-কথা আরও কত বেশী সত্য হবে তা না বললেও চলে।

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানদণ্ড আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলতে পারি, দ্বিজেন্দ্রলাল একজন যথার্থ শক্তিধর কবি ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নাট্যকার ও সুরকার। অর্থাৎ যুগপৎ তিনটি ক্ষেত্রে তিনি ধ্বনির চর্চা করেছেন এবং তার ফলে তাঁর কাব্যশক্তি যে সবিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছিল সে-কথা বলাই বাহুল্য। সত্য বটে যে, তাঁর কাব্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য নেই—প্রকৃতি, প্রেম ও স্বদেশপ্রীতি এই তিনটি ভাবকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্যকল্পনা প্রধানতঃ আবর্তিত হয়েছে, শেষের দিকে কিছু ভক্তিভাবের কবিতারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়— ; সত্য বটে যে তাঁর নাটকে বিষয়মুখীনতা অপেক্ষা আবেগোচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে বেশী, সুরের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশের অবকাশ ঘটেনি তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য—এই সবই স্বীকার্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, সব জড়িয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টিপ্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর কাল তিনি বেঁচেছিলেন। তিনি যদি আরও আয়ুর আশীর্বাদ পেতেন এবং দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সাহিত্য চর্চায় আরও একান্তভাবে মনোনিবেশ করার অবসর পেতেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা সাহিত্যের কাব্য ও নাট্য বিভাগকে আরও

অনেক বেশী সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল প্রয়াণ তাঁর স্বীয় প্রতিভার স্ফূর্তি এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি —সমভাবে দুইয়েরই বিঘাতক হয়েছিল।

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশী নয়। আর্যগাথা (১ম ও ২য় খণ্ড), আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০) মন্দ্র (১৯০২), অলেখ্য (১৯০৭) ও ত্রিবেণী (১৯১২)। এর মধ্যে আর্যগাথা ১ম ও ২য় খণ্ড নিতান্ত প্রথম বয়সের রচনা। কবির আটাশ থেকে তেত্রিশ বছরের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত হয়। এই কবিতাগুলিতে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, ভাষার বল্গাহীনতা আছে, ছন্দও তেমনি সুপরিণত নয়। তবে ওই কবিতার মধ্যেই কবির ভবিষ্যৎ কাব্য-ব্যক্তিত্বের প্রবণতা কোন্ খাত বেয়ে অগ্রসর হবে তার আভাস বিদ্যমান। আমরা বলেছি দ্বিজেন্দ্রকাব্যে স্বদেশপ্রীতি ও প্রেম দুটি বলবৎ ভাব। এই দুই ভাবেরই অঙ্কুর আর্যগাথার কবিতাগুলির মধ্যে আছে। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্র-নাট্যরচনায় স্বদেশানুরাগের আদর্শের প্রকৃষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। হাসির গানের কবিতাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল বিজাতীয় রীতিনীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ও জাতীয় মর্যাদার আদর্শে অসংশয় আস্থাশীলতা। কাপুরুষতার প্রতি ধিক্কার-বাক্য দ্বিজেন্দ্র-কাব্যে বারে বারেই উচ্চারিত হয়েছে—তা সে হাসির গানেই হোক আর অন্য ধারার কবিতাতেই হোক। এ-সবেরই আদল পাওয়া যায় আর্যগাথার কবিতাগুলির মধ্যে। তার উপর প্রেমানুভূতির প্রকাশও আর্যগাথার কবিতায় অলক্ষ্য নয়। আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডের রচনায় প্রেম একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। প্রেম মানে দাম্পত্য প্রেম, পারিবারিক শুচিতার সংস্কার দ্বারা মার্জিত স্বামী-স্ত্রীর বৈধ ভালবাসা। পরকীয় বা আধুনিক কালোচিত 'স্বাধীন' প্রেমের আদর্শের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের

কোন আকর্ষণ ছিল না। তার প্রতি তাঁর কোন সায়ও ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত জীবনের কাব্য-গ্রন্থাদিতে এই সংসারমুখাশ্রয়ী দাম্পত্য প্রেমের ছবি বারেবারেই প্রকাশমান হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ ১৯০৩ সনে স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁর এই বিশেষ হৃদয়ানুভূতিটি যেন আরও বেগবতী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের বাঙ্গালী কবিদের এই এক বিশিষ্ট প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়—প্রায় সকলেই তাঁরা গভীরভাবে গৃহগতপ্রাণ ও দাম্পত্য অভ্যাসের বশীভূত। তাঁদের ভাবনার কেন্দ্র-মধ্যে প্রেমের প্রতীকরূপে সাংসারিক প্রেম সবটুকু জায়গা জুড়ে আছে। নাগরিক মধ্যবিত্তের সংস্কার অনুযায়ী তাঁদের প্রেম একান্তভাবে গৃহকেই আশ্রয় করেছে, সেই প্রেম দৃষ্টিগ্রাহ্যের সীমা ছাড়িয়ে বা একান্ত আপনার জনদের আকর্ষণ অতিক্রম করে পরিশোধিত বা বিমূর্তভাবে উদার মানবীয় প্রেম রূপে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ভালবাসা বলতে গৃহের চতুঃসীমার প্রাচীরাবদ্ধ এঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে কেবল মাতৃস্নেহ পত্নীপ্রেম বাৎসল্য স্বজনানুরাগ প্রভৃতি মৌলিক অনুভূতিগুলি, এদের শুদ্ধতর বা উদারতর রূপের অভিব্যক্তির বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, এমন কি প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ—সকলেই অল্পবিস্তর এই ভাবের ভাবুক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, এঁদের কল্পনা অন্যান্য মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা আবিষ্ট উনিশ শতকীয় বাঙ্গালী কবির মত কেবলমাত্র গৃহচেতনাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি ; তাঁদের উদার দৃষ্টির কল্পনা নিকটজনদের প্রেমকে ছাড়িয়ে আরও বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েরই পরিণত রচনায় যাকে বলে বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধি তার প্রকাশ হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বও বড় কম নয়। যে দ্বিজেন্দ্রলাল মন্দ্র আলেখ্য ও ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থে একাধিক

কবিতায় হৃদয়ানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রাবল্যের মুখে দাম্পত্য প্রেমের উচ্ছ্বসিত বন্দনা গান করেছেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলালই আবার নাটকের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রেমকে মানবতার শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নাটকে মধ্যবিত্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সার্বভৌম উৎকর্ষের লক্ষণমণ্ডিত বিশ্বকবিতে পরিণত হয়েছেন। নাটকের প্রসঙ্গে একথাটিকে আমি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার অবসর পাব; আপাতত এই বলা যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক যতই মেলোড্রামা আর রোমান্টিক আবেগাতিরেকের উপাদান দ্বারা ভারাক্রান্ত হোক না কেন, দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে তাঁর নাটকেই। তিনি যে যথার্থ কবি, তার পরিচয় তাঁর নাটকের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। নাট্যরচনার আঙ্গিকগত কলা-প্রকরণের দিক থেকে যেমনই হোক, ভাবের মহিমার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি নাটককে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের নাট্যসৃষ্টি আখ্যা দেওয়া যায়। কেন এ কথা বলছি, যথাসময়ে তার সবিস্তার আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল হৃদয়বত্তার ঐশ্বর্যে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগের আতিশয্যকে তিনি কাব্যপরিমণ্ডলের মধ্যে অপাংক্তেয় জ্ঞান করতেন না। আন্তরিকতা তাঁর কবিতার সহজ বর্মের মত ছিল। তিনি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং মননশীলতার কিছু অভাব ছিল না তাঁর ব্যক্তিত্বের গঠনের মধ্যে ; কিন্তু কাব্যে ও নাটকে তিনি মননশীলতারও বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন আন্তরিকতার সম্পদকে। আধুনিক কবির রচনায় হৃদয়তাপবর্জিত যে-বুদ্ধির জৌলুষ দেখা যায়, সে-রকম একতরফা বুদ্ধির ঝলকানির প্রতি কবির বিশেষ আস্থা ছিল না। কবি লিখেছেন—

> কাব্য নয়ক' ছন্দোবদ্ধ মিষ্টি শব্দের কথার হার,
> কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার তাহার কাব্য শব্দসার।
> যেথায় ভাস্বর যেথায় মূর্ত ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ,

উৎসারিত মহাপ্রীতি—তাহাই কাব্য তাহাই গান।

('কবি', আলেখ্য)

কবির নিবিড় দাম্পত্য প্রেম ও সংসার-স্নেহের বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের 'বিপত্নীক', 'চিরবিচ্ছেদ'; ত্রিবেণী কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম চুম্বন', 'সোনার স্বপ্ন', 'স্মৃতি', 'আহ্বান' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবির পত্নী-প্রেমের নিষ্ঠা ও গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। লোকান্তরিতা পত্নীর ভালবাসার স্মৃতি যেন একটা প্রবহমান ধূয়ার মত কবির কাব্যে ও গানে বারে বারেই ফিরে ফিরে আসতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে কবির নিবিড় পত্নীপ্রেমের স্মৃতি এক জায়গায় সংহত হয়ে আছে; আর দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তা নানা স্থানে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ হয়ে আছে। শোকের হাহাকারে তাঁর কাব্য পূর্ণ। দু-একটি উদ্ধৃতি এখানে উৎকলন করছি—

সে গেছে, আমার মর্মপটে ছায়ার মত ভেসে,
সে গেছে, আমার হৃদয়-তটে ঢেউয়ের মত এসে,
তারে, নয়ন ভরে দেখেছিলাম
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম
সোনার স্বপ্নটিরে।

('সোনার স্বপ্ন')

'প্রথম চুম্বন' কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অপূর্ব—

প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর চুম্বনে,
সে গীতে সর্ব কোলাহল যায় থামিয়া,
মানবের ঘোর দৈন্যে, দুঃখে, দুর্দিনে,
আসে একবার স্বর্গরাজ্য নামিয়া।

জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে ;
যৌবনসার প্রথম মধুর প্রণয়ে ;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে ;
—মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ-এ।

কবি কতভাবে যে স্বীয় অন্তরের পত্নী-বিয়োগজনিত বিরহের আর্তি ও শূন্যতার হাহাকারকে প্রকাশ করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। 'মাতৃহারা' কবিতার একটি স্তবক এইরূপ—

না না, তুইই সইতে পারিস, আমিই সইতে পারি না—
কী জিনিস যে হারিয়েছিস বুঝিস না ক তুই।
এখন রে তোর কাছে,
তুল্যমূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, দুই।
তাহার উপর শিশুর হাড় ভেঙে গেলে জোড়া লাগে,
আমাদের আর লাগে না ক জোড়া ;
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকায় শুধ্ গাছের ডগা,
আমাদের যে একেবারে গোড়া।

'বিপত্নীক' কবিতার শেষাংশে আছে—

চলেছি তো এইরূপেই এ-জীবনপথে শান্তিসুপ্তিহীন ;
জানি না তো কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা হবে কোন দিন !
যতখানি দেখা যাচ্ছে,—ধূ ধূ করে শুধ্ অসীম বারিনিধি।
অহো—কী মনুষ্যজন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের করেছিলে বিধি !

এ-ভিন্ন বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের কবিতাও কবি অনেক লিখেছেন। এই বর্গের কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্রকন্যার বিবাদ', 'নূতন মাতা', 'আশীর্বাদ', 'জীবন-পথের নবীন পান্থ' প্রভৃতি রচনাগুলি। এখানে ঘুমন্ত শিশু কবিতার শেষাংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না—

না না,—ঘুমা এমনি করে—আহা মরি, একি
মধুর ছবি ! ঘুমা আমি নয়ন ভরে দেখি !

এমন বকুলতলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।
চিত্রকরটি হতাম যদি, তোরে এমন দেখে,
রেখে দিতাম যত্ন করে সোনার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হয়ে দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোনার যাদু, ঘুমা আমার মানিক।

'জীবন-পথের নবীন পান্থ' কবিতার অনবদ্য একটি স্তবক—

দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত,
দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত
নিদাঘে, নির্মেঘ প্রভাতের ছটা
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি,
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা ;
শরতে, চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি ;
এ বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই,
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য কিছু দেখি নাই,
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট।

আমরা কথঞ্চিৎ সবিস্তারেই এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহগতপ্রাণ প্রেমিক ও সন্তানস্নেহাসক্ত চিত্তের ছবিটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। শুধু যে কবির কাব্য-মানসের পরিচয় দেবার জন্যই এইরূপ করা হয়েছে তা নয় ; এইরূপ উৎকলনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কাব্যের নিজস্ব ক্ষেত্র অর্থাৎ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবির কল্পনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েও উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। এ-কবিতায় বড্ড বেশী গার্হস্থ্য লালিত পত্নী পুত্র কন্যা সার

জীবনের ছবিটি আঁকা রয়েছে, এর মধ্যে বৃহতের আহ্বান নেই, মহতের আহ্বান নেই। বহির্বিশ্বের কর্মচাঞ্চল্যের অভিমুখে এখানে দৃষ্টি প্রসারিত নয়, এবং যে পরিমাণে এই কাব্যে আত্মকেন্দ্রিকতা বেশী, বহির্মুখীনতা অনুপস্থিত, সেই পরিমাণেই এই কাব্য sublime এর স্পর্শবর্জিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় sublimityর ছোঁয়া লেগেছে মাত্র তাঁর গুটিকয় কবিতায়—যথা 'প্রবাসে', 'সত্যযুগ', সমুদ্রের প্রতি', 'তাজমহল', 'সমুদ্র', 'কলি' প্রভৃতি কবিতায় ও একাধিক গানের বাণীতে। গান দ্বিজেন্দ্রলালের এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি—কি বাণীরচনার দিক থেকে, কি সুররচনার দিক থেকে, কি গীতিমধুর সঙ্গীতরচনায়, কি স্বদেশভাবাত্মক সঙ্গীত রচনায়, কি একক গানে, কি যৌথ বা কোরাস গানে। আর যে-কথা পূর্বেই বলেছি, তাঁর নাটকের মধ্যে লেগেছে সেই সুর যা মনকে ক্ষুদ্র পারিবারকেন্দ্রিক সংসার সীমানার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে মহতের অভিসারের পথে নিয়ে যায়, মনকে অনুপ্রাণিত করে উন্নীত করে।

দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃত কবিতাংশগুলির বাক্য, ছন্দ ও মিলের বাঁধুনি লক্ষ্য করে বিচক্ষণ পাঠকের স্বতঃই এ কথা মনে হবে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্বনির এক ওস্তাদ জাদুকর ছিলেন, ছন্দ-লয়ে তাঁর হাত ছিল অতিশয় কুশলী! রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' নামক সমালোচনা গ্রন্থে। সেখানে তিনি এই দুই কাব্যগ্রন্থের ভাবের স্বতঃস্ফূর্তি, ছন্দের অবলীলায়িত প্রবাহ ও মিলের কারুনৈপুণ্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করেছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে কবির মনে খটকা থেকে গেছে। শব্দ-ব্যবহারে জায়গায় জায়গায় ইচ্ছাকৃত ভাবে যে গদ্যের চাল অবলম্বন করা হয়েছে, কবিগুরু তার অনুমোদন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ে'র আলোচনায় লিখেছেন—"কিন্তু···পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোন হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ কবিতা পড়িবার সময়ে পদ্যের নিয়মরক্ষা

করিয়া পড়িতে স্বতঃই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।...আষাঢ়ের অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনবত্ব প্রয়াস—এই কাব্যবন্ধের ভিতর সচেতন গদ্যভঙ্গির আমদানির ফলে তাঁর কাব্যের আবৃত্তিযোগ্যতার হানি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরবর্তীকালীন বাংলা কবিতার পৌরুষব্যঞ্জকতা তথা বাস্তবধর্মিতার মূল এখানেই নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে যে প্রয়াসের বলিষ্ঠ সূচনা, আধুনিক কবিতায় তারই সার্থক ফলশ্রুতি বহমান। দ্বিজেন্দ্রলালকে নিঃসন্দেহে এই দিক দিয়ে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যায়। তিনিই প্রথম সজ্ঞানভাবে পদ্যের চালের ভিতর গদ্যভঙ্গীর অবতারণা করলেন। 'সত্যযুগ' কবিতাটি এ কথার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। একটি অংশ তুলে দিচ্ছি—

নির্মেঘ অমাবস্যা রাত্রি, শুয়ে আছি
ঊর্ধ্বমুখে হাতে মাথা রাখি,
বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে,
জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে আমিই একাকী
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে
চেয়ে দেখি দূরে ;
ভাবি এত মহাজ্যোতি কী মহৎ উদ্দেশ্যে
ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে ঘুরে ?

এই চালের ছন্দকে প্রসিদ্ধ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন সাক্ষরিক ছন্দ আখ্যা দিয়েছেন এবং এর আলোচনায় বলেছেন—

"দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত কৃতিত্বই এইখানে যে, তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের সমাহিত কদম মিশিয়ে এক নবছন্দের রসসৃষ্টি করেছেন—এমন কি মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ

বজায় রেখে। আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় দেখেছি যে, সে ছন্দে হাল আমলে এক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ছাড়া আর সব মৌখিক ক্রিয়াপদই পাংক্তেয় হয়েছে (যথা, পেরেছি, ছিলাম, দিয়েছিল···)। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম দেখালেন যাচ্ছি কর্‌ছি কর্‌তে বল্‌তে বস্‌লাম জাতীয় হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এনেও অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।

এ সব দৃষ্টান্ত ও মন্তব্য থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ হবেন আশা করি।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নামে হাসির হলেও আসলে সুতীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনা। সমাজ সমালোচনা এই গানগুলির মূল উপজীব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক বাঙ্গালী বাবু সমাজের দাস্যতা, পরানুকরণপ্রিয়তা, বিজাতীয় আচার-আচরণের প্রতি মোহ, শাঠ্য ও কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা, হুজুগেপনা, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি বিচিত্র অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্মল বিদ্রূপের চাবুক চালিয়েছেন তিনি একাধারে কবিতা রূপে পাঠ্য ও গান রূপে শ্রাব্য এই বিখ্যাত রচনাগুলিতে। হাসির গানেই দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি প্রথম ছড়িয়ে পড়ে। এই হাসির গানগুলিতে যে সমালোচনা প্রকটিত হয়েছে, তা নেহাৎ মিছরির ছুরি নয়, তা ধারালো ফলাবিশিষ্ট ছুরি, উদ্দিষ্টের মর্মস্থলে কেটে কেটে গিয়ে বসে। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যায়-অসহিষ্ণু পৌরুষব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের ছাপ এই রচনাগুলির উপর বিশেষভাবেই গিয়ে পড়েছে। মনোরঞ্জনের স্থূল লক্ষ্য ছাড়াও এই রচনাগুলির গূঢ় লক্ষ্য আছে—জাতিকে নানাপ্রকার অবিচার, মূঢ়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগ করে তোলাই সেই লক্ষ্য। হাসির গান সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্যটি বেশ সুন্দর। তাতে হাসির গানের চরিত্র ও অভিপ্রায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। সেটি এখানে উদ্ধার করি।—

"তৎকালীন সমাজে চারিদিকে কাপট্য, অসারল্য, অনাচার, অসংগতি, দাম্ভিকতা, ইতরতা, বাক্যের সহিত আচরণের অসামঞ্জস্য,

পরানুচিকীর্ষা, স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন ইত্যাদির অজস্র নিদর্শন দেখে তাঁর মনে যেমন বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছিল, তেমনি তাঁর দেশভক্ত মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ জন্মেছিল। তিনি সমাজ সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে এসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন, নানা সংঘ সমিতি গড়তেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই কবিতা লিখেছেন।···রঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত।"

কিন্তু হাসির গানের কবিতায় দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের একটি দিক মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যায় অসহিষ্ণুতা, তাঁর আপোষহীন সমাজ-সমালোচনা, তাঁর রঙ্গব্যঙ্গপ্রিয়তা, তাঁর বৈঠকী মেজাজ, তাঁর ছন্দমিল নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ—এ সব হাসির গানে কখনও আলাদাভাবে কখনও একত্রে উপস্থিত দেখতে পাই। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মন প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। দুঃখ ও বেদনার অভিষেকে তাঁর মনের নব রূপান্তর লাভ হতে চলেছিল। আঘাতের উল্লাসে তিনি আর আগের মত আনন্দ পাচ্ছিলেন না, মানুষের ব্যথায় সমব্যথী হবার একটি অনাস্বাদিতপূর্ব নূতন আকুলতা বোধ করলেন তিনি স্বীয় হৃদয় মধ্যে। দীর্ঘবিস্তৃত কবিতা "প্রবাসে"র এই কয়টি চরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—

হাস্য শুধু আমার সখা?
অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়।
চলে যা রে সুখের রাজ্য,
দুখের রাজ্য নেমে আয়।
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়ঃ
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি
দুখের সঙ্গে সহবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক,
ইহাই আমার অভিলাষ।

তার পরেই বলেছেন—

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—
তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—
তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

দুঃখের অভিঘাতে দ্বিজেন্দ্রলালের মন যে ক্রমশঃ আপনার জানা-চেনার সংকীর্ণ জগৎকে ছাড়িয়ে উদার মানবপ্রেমের জগতের অভিমুখে প্রধাবিত হচ্ছিল, এসব ভাব তারই প্রমাণ। নাটকে এই উদার ভাব আরও বেশী দানা বেঁধে উঠেছে।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনার অবসর আছে। এখানে তার সুযোগ নেই। কাজেই অল্প কথায় আমি দ্বিজেন্দ্র-নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মূল কথা হল দেশপ্রেম। জাতীয়তার আদর্শকে তিনি নাটকগুলিতে অতি উচ্চে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে 'প্রতাপসিংহ', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস', 'তারাবাঈ' প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক প্রসিদ্ধ নাটকে। মুঘল শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির সংহতি, আত্মত্যাগ, শৌর্যবীর্যের প্রকাশের মধ্যে তিনি যেকোন প্রকার পরশাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির একটি মানুষে সংহত হয়ে মৃত্যুপণ প্রতিরোধের আদর্শটিকে জীবিত করেছেন। তাঁর মুঘল-রাজপুত সংঘর্ষকে অনায়াসে ইংরেজ-ভারতবাসীর সংঘর্ষের প্রতিরূপক ধরা যেতে পারে। এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদের কোন কথা নেই, এর ভিতর আছে বহিরাক্রমণকারী ও দেশরক্ষাকারী, পরশাসক ও পরশাসিতের অনিবার্য সংঘাতের সমস্যার চিত্রায়ণ। 'মেবার পতন' নাটকে রাজপুত সেনাপতি বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহের উক্তি, সগর সিংহের কন্যা চারণী সত্যবতীর মেবারের জনগণকে যে কোন ত্যাগের মূল্যে দেশরক্ষা করবার উদাত্ত আহ্বান, 'দুর্গাদাস'

নাটকে মাড়বার অধিপতি যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী রাণী মহামায়ার ঔরংজীবের বাহিনীর আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে জাতির উদ্দেশে তেজোদৃপ্ত ভাষণ—এ সবই গভীর জাতীয়তাবাদী অভীপ্সার স্মারক।

কিন্তু সকলেই জানেন যে, জাতীয়তাবাদী আদর্শের কোন-না-কোন পর্বে সংকীর্ণচিন্তুতার সম্মুখীন হতে হয়ই। পরবিদ্বেষ, স্বজাতি-অভিমান, জঙ্গীবাদ, হিংসা—এগুলি জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে ঢুকে তার শুদ্ধতাকে আবিল করে তোলে। যখন এইরূপ হয় তখন আর জাতীয়তাবাদ প্রগতিশীল থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই এক সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জঙ্গীবাদী জাতীয়তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মনও যে প্রচলিত জাতীয়তাবাদের এই অনুদার সাময়িক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন ছিল তার পরিচয় তাঁর নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়। জাতীয়তার দৃঢ়সংবদ্ধ ঐক্যের ভিতর অনৈক্যের কীলক রূপে বিদ্যমান হিন্দু-মুসলমান ভেদকেও তিনি স্বীকার করেননি। এই জাতীয় একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি মুখ্যতঃ হিন্দুর অতীত গৌরব নিয়ে নাটক রচনা করেছেন, তা বলে তাঁর নাটকে অহিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি মুসলমান চরিত্রকে যথেষ্ট মহত্ত্ব দান করেছেন। যেমন দুর্গাদাস নাটকে দিলীর খাঁ চরিত্র, কাসেম চরিত্র ; সাজাহান নাটকে সাজাহান, দারা, সোলেমান, জাহানারা চরিত্র ; মেবার পতন নাটকে অংশতঃ মহাবৎ খাঁর চরিত্র। জ্ঞানীর যা প্রধান লক্ষণ, সমদর্শিতার অভাব ছিল না দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক গঠনের ভিতর।

এই সমদর্শিতার উদাহরণ হিসাবে দুর্গাদাস নাটক থেকে সম্রাট ঔরংজীব ও দিলীর খাঁর মধ্যে কথোপকথনের একটি অংশ এখানে তুলে ধরছি ঃ

দিলীর ॥···কিন্তু সম্রাট, বাহুবলে কি ধর্মপ্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদাঘাতে রাজভক্তি তৈয়ের হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মস্‌জিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মার নাম নিনাদিত হোক; একসঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি বেজে উঠুক।···

ঔরংজীব ॥ হিন্দু মুসলমান এক হবে, দিলীর খাঁ?

দিলীর ॥ কেন হবে না সম্রাট? তারা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে, একই জল পান করে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয় নি? তারা একবার ধর্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তিবাষ্পগদগদ স্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে প্রাণ ভরে মা বলে ডাকুক দেখি, সম্রাট।

ঔরংজীব ॥ দিলীর খাঁ, তুমি স্বপ্ন দেখছ।

দিলীর ॥ আমায় মাফ করবেন জাঁহাপনা! —আমি স্বপ্নই দেখছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন। ভেঙ্গে গেল।

মেবার পতন নাটকের মানসী দ্বিজেন্দ্রলালের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেশাত্মিকা বুদ্ধির উপরে বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সমালোচকেরা বলতে পারেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের মানসী চরিত্র রক্তমাংসের মানুষী হয়ে ওঠার তেমন অবসর পায় নি, তাকে শুধু ভাবের বাহিকারূপেই এখানে আঁকা হয়েছে; তার উত্তরে বলব যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে সময়ে এই বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচার করেন তখনও এই ভাবটি ভারতীয় চিন্তায় নিতান্ত অপরিস্ফুট আকারে বিদ্যমান ছিল, আর কোন ভারতবর্ষীয়ের ভাবনায় সেটি স্পষ্টগ্রাহ্য রূপ লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বিশ্বমৈত্রী-ভাবনার স্ফুরণ আরও পরেকার ঘটনা; মহাত্মা গান্ধীর নাম তখনও এই দেশে অল্প-বিস্তর

অপরিজ্ঞাত। সেই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালকে একটা বলিষ্ঠ প্রাগ্রসর ভাবের অগ্রপথিক বলা যায়। যুগের ভাবনাকে ছাপিয়ে অগ্রবর্তী হয়ে চিন্তা করতে যে তিনি পিছপা ছিলেন না, মানসী চরিত্রের পরিকল্পনা তাঁর প্রমাণ। মানসী সত্যবতীকে উদ্দেশ্য করে এক জায়গায় বলছে—"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি বিরোধী হয় তো মনুষ্যত্বের মহা-সমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্! দেশের স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।"

"গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—

আবার তোরা মানুষ হ।"

এই যে দেশ জাতি সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, ভৌগোলিক সীমাচিহ্নহীন মনুষ্যত্বের বাণী—এই বাণীই হল রবীন্দ্রনাথের বাণী, মহাত্মা গান্ধীর বাণী, যে-কোন উদারচরিত মানবের বাণী। এই বাণীরই পথিকৃৎ হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে।

মেবার পতন নাটকে তিনটি নারী চরিত্রকে আমাদের মানসিক ভাবের বিবর্তনের তিনটি স্তরের প্রতীক রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। কল্যাণী গার্হস্থ্য প্রেমের প্রতীক, সত্যবতী জাতীয়তাবাদী প্রেমের প্রতীক, মানসী বিশ্বপ্রেমের প্রতীক। মানসী ও অজয় সিংহের কথোপকথনের একটি খণ্ডাংশ এখানে উৎকলনযোগ্য।

অজয়॥ তুমি আমায় ভালোবাসো না?

মানসী॥ বাসি।

অজয়॥ না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসো!

মানসী॥ মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি।

অজয়॥ নিষ্ঠুর!

মানসী॥ কেন অজয়। তোমায় ভালোবাসি বলে কি আমার আর কাউকে ভালোবাসতে নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়খানিকে গ্রাস করে রাখতে চাও? কি স্বার্থপর!

অজয় ॥ এত বালিকা কি তুমি মানসী!

মানসী ॥ তুমি আমায় ভর্ৎসনা কচ্ছ? আমার কি অপরাধ অজয়? আমি মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি, এই অপরাধ? তবে সে অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।

এর পর এই মানসীই যুদ্ধক্ষেত্রে সেবিকারূপে আবির্ভূত হল ও শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আহত মাত্রের সেবা করতে লাগল। তার আর্তত্রাণ মূর্তিটি মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

আমি সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের একটি মহদ্‌গুণের উল্লেখ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের এই উদার দৃষ্টির প্রসাদে তিনি তাঁর গণ্ডীবদ্ধ মানসিকতার সীমা ছাড়িয়ে বৃহৎ ও মহতের সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। থাকুক তাঁর নাটকে আঙ্গিকগত ত্রুটি ও ভাবের উচ্ছ্বাস, কিন্তু তাঁর নাটকের এই বিশেষত্বের তুলনা নেই।

নাটক সম্বন্ধে এখানে সূত্রাকারে মাত্র আলোচনা করা হল। যাঁরা এ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে চান তাঁদের ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়-কৃত 'দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। মদীয় 'বাংলার সংস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ "জাতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল" ও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সহায়ক হতে পারে।

॥ ৪ ॥

গীতিকার ও সুরকার রূপে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের পরিচয় সংক্ষেপে নিবেদন করবার চেষ্টা করব।

সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। পরিতাপের বিষয়, তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর এ শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারেনি। তিনি বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডারে একটি অপূর্ব বস্তু দান করেছেন—স্বদেশভাবোদ্দীপক কোরাস গান। দ্বিজেন্দ্রলালের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ",

"বঙ্গ আমার। জননি আমার। ধাত্রি আমার। আমার দেশ, উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।" "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে," "ধন্যধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা," "আজি গো তোমার চরণে, জননি, আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান", "মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যথা প্রতাপবীর," "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা!" "জাগো জাগো, পুরনারী", "কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ"—এ সব গানের সঙ্গে বাংলাদেশের কে না পরিচিত? একমাত্র বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে বাদ দিলে আমাদের হৃদয়ভাবকে পবিত্র দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তিসন্নত করতে এ গানগুলির জোড়া গান আজও রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। জাতীয়তার উদ্দীপক কোরাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাংলার প্রসিদ্ধ গীতিকারগণ সকলেই শক্তিনিয়োগ করেছেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন বলা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানগুলির সুররচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলির সুরের গঠন আপাতবিচারে মনে হবে বিদেশী ভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু মূলত সব কয়টির সুরই ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ইমন-কল্যাণ, ঝিঁঝিট, ভূপালী, কেদারা, জয়জয়ন্তী, দেশ, হাম্বীর প্রভৃতি বাঙ্গালীর সবিশেষ প্রিয় পরিচিত রাগিণী এই গানগুলির মূলে আছে। পাশ্চাত্ত্য সুরভঙ্গি ও দেশীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে বেশ একটা ওজস্বিতা ও ছন্দের স্ফূর্তি প্রকাশ পেয়েছে গানগুলির মধ্যে। এসব গান বার বার গাইলেও পুরনো হবার নয়।

একক বা সোলো সঙ্গীতেও দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ, এই বর্গের গানের মধ্যে যেগুলি কাব্যভাবপ্রধান তাদের জুড়ি নেই। "নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো," "(ওই) মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত এক ভেসে আসে," "যাও হে

সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই”—এ সব গানের অপূর্ব কাব্য ও সুরের জাদুতে মুগ্ধ না হয়েছেন এমন প্রবীণ বয়সী শ্রোতা কি বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে আছেন? সুরকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, তিনি ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের রাগ প্রকরণ ও বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত ঐতিহ্য এই দুইয়ের সঙ্গেই সমভাবে পরিচিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবারে দীর্ঘকাল যাবৎ রাগসঙ্গীতের চর্চা হয়ে এসেছে। তাই সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে আবাল্য লালিত হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে রাগসঙ্গীত জ্ঞান বাংলা গান রচনার খুবই সহায়ক হয়েছে। খেয়াল গানের ঢঙ বাংলা গানে কী রকম অবলীলায় মিশতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের “প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা,” “ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী” প্রভৃতি গানে। হিন্দুস্থানী খেয়ালের ঢঙে বাংলা গান বাঁধায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালকেই বোধ হয় পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যায়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার এই যে, বাংলাদেশে যে কজনই সঙ্গীতস্রষ্টা হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি—তাঁদের সকলেই একাধারে গীতিকার ও সুরকার। যিনি গানের বাণীর রচয়িতা তিনিই সুর-যোজয়িতা। আজকালকার রীতি অনুযায়ী এঁদের বেলায় গীতিকার ও সুরকারের দায়িত্বের দ্বিধা-বিভাজন হয়নি। সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে এই দায়িত্বের বণ্টন অস্বাভাবিকও বটে, সঙ্গীতের হানিকারকও বটে। এভাবে গান বাঁধলে গানের সুরে কৃত্রিমতা আসতে বাধ্য। পূর্বোক্ত সকল সুরকারের মধ্যে বাণী ও সুরের হরিহরাত্মা মিলন সাধিত হয়েছে। কাব্য ও সঙ্গীতের অচ্ছেদ্য যোগই এতে শুধু প্রমাণিত হয়।

সংস্কৃতি পরিষদের সভায় পঠিত (১৯৬৩)

রজনীকান্ত সেনের ভক্তিসংগীত

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রী) তাঁর ৪৫ বৎসরের জীবনকালের মধ্যে একটি বিশেষ রূপে দেশবাসীর চিত্তে আসন লাভ করেছিলেন— সংগীতকার রূপে। সংগীতরচয়িতা এবং গায়ক এই দুই ভূমিকাতেই তাঁর সমান কৃতিত্ব ছিল। যে-সব গান তিনি রচনা করতেন তাতে তিনি নিজেই সুর সংযোগ করতেন এবং স্বয়ং সে সব গানের কণ্ঠরূপায়ণ করতেন। স্বরচিত গান গেয়ে তিনি একদা বাঙালীর চিত্ত জয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পঞ্চান্ন বছর অতীত হয়ে গেছে, সুতরাং স্বভাবতই এখন আর তাঁর কণ্ঠের কৃতিত্বের স্মৃতি জাগরূক থাকবার কথা নয় কিন্তু তাঁর গানগুলি অম্লান হয়ে আছে।

রজনীকান্ত প্রধানতঃ তিনটি ধারায় গান রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন—স্বদেশী গান, হাসির গান ও ভক্তিমূলক গান। স্থায়ী মূল্যের দিক দিয়ে বিচার করলে এর ভিতর ভক্তিমূলক গানগুলির আবেদনই সবচেয়ে বেশি। এর একটি কারণও আছে। স্বদেশী গান আর হাসির গান যতই নিপুণ রচনা হোক, বিশেষ স্থান কালের সংযোগে তাদের মহিমা। সেই বিশেষ স্থান ও কালের স্মৃতি অপগত হলে তাদের আকর্ষণও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু ভক্তিসংগীতের বেলায় তেমন নয়। ভক্তিসংগীতের বিষয়টি শাশ্বত—চিরপুরাতন হয়েও তা চিরনূতন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আকূতি একটি চিরন্তন আবেগ, স্থান-কালের পরিবর্ত্তনের উপর সেই আবেগ নির্ভরশীল নয়, কাজেই স্থান-কালের পরিবর্তনে তার তারতম্য হয় না। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর ও আত্মনিবেদনের মনোভাব যতদিন মানুষের স্বভাবে বেঁচে থাকবে ততদিন ভক্তিসংগীতের লয়ক্ষয় নেই।

এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, রজনীকান্তের ভক্তি-সংগীতগুলির একটি স্থায়ী মর্যাদা আছে বাংলার সাহিত্য-সংসারে,

মানুষ তার অন্তরের সহজ প্রবণতাবশে চিরদিন এই ভক্তিসংগীতগুলির প্রতি আকৃষ্ট হবে। বাংলায় ভক্তিসংগীতের ঐতিহ্য পুরাতন। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদকারগণ, শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষত রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত প্রভৃতি, বাউল ও অন্যান্য সহজিয়া ধারার সংগীত-রচয়িতা, এই যুগের পরিধিতে রামমোহন, বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ব্রহ্মসংগীত রচয়িতাগণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কবি ও সংগীতকারেরা বাংলা ভাষায় ভক্তিসংগীতের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন নানা সময়ে নানা ভাবে। এই ধারার বিস্তার ও গভীরতা সম্পাদনে কান্তকবি রজনীকান্তের ভক্তিসংগীতগুলি একটি বিশেষ স্রোতঃপ্রবাহের মর্যাদা দাবি করতে পারে। রজনীকান্তের নাম এই-সব বিশ্রুতকীর্তি সংগীতরচয়িতাদের নামের পাশে স্থানলাভেরই শুধু যোগ্য নয়, অতি সসম্মান স্থানলাভেরও অধিকারী তার কারণ তাঁর ভক্তিসংগীতগুলির সারল্য ও আন্তরিকতা প্রথম শ্রেণীর বললেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য বিশিষ্ট কবি ও লেখকদের তুলনায় রজনীকান্তের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অনেক ন্যূনতা হয়তো ধরা পড়বে। —তাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার পরিচয় কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ এবং সংগীত ছাড়া জীবনে তিনি বিশেষ কিছুই আর রচনা করেন নি। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি অনন্য বলা যায়ঃ জীবনের একটি স্থায়ী ধুয়ার মত, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে শোকে ও অনুরাগে, তিনি ভগবানের চরণে অসীম নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করেছেন, সকল অবস্থায় ঈশ্বরের করুণা যাচ্ঞা করেছেন। সাধক ও মরমী কবিদের কথা অবশ্য আলাদা, তাঁরা তাঁদের পরম দেবতার ধ্যানে তদ্গতচিত্ত হয়ে সংসারের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকেন; কিন্তু তাঁদের বলয়সীমার বাইরে যে-সব কবি রয়েছেন, যাঁরা জাগতিক জীবনে বিচরণ করেন ও জাগতিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই মুখ্যতঃ তাঁদের কাব্য প্রণয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে এমনতরো ঐকান্তিক ঈশ্বরবিশ্বাস বড়ো একটা

দেখতে পাওয়া যায় না, যেমনটা আমরা রজনীকান্তের মধ্যে দেখেছি। এই অপরিসীম ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁকে জীবনের বহু শোকতাপ হাসিমুখে সহ্য করতে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং জীবনের অন্তিম দিনগুলিতে যখন দুরন্ত কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন এবং ওই সংগ্রাম সত্ত্বেও তিলে তিলে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁকে সকল কষ্ট ও বেদনা ঈশ্বরের অনুগ্রহজ্ঞানে সহ্য করে অবিচলিত থাকবার শক্তি দান করেছে। বস্তুতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখতে এসে তাঁর এই প্রগাঢ় ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখে গভীরভাবে অভিভূত হন এবং পরে এক পত্রে তাঁর সে মনোভাব তিনি রজনীকান্তকে লিখে জানান। ওই পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলাম।" রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই যে 'মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ', এই সংঘটনের মূলে ছিল রজনীকান্তের নিবিড় ও গভীর ঈশ্বরানুরক্তি। ঈশ্বরে তিনি বাধাবন্ধহীনভাবে সর্বসমর্পণ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর দেহের কষ্টকে অতিক্রম করে আত্মার জ্যোতি এমন অমলিন শিখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পেরেছিল।

রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফিরে যাবার পর রজনীকান্ত কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একটি গান রচনা করে পাঠিয়েছিলেন—"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে গর্ব করিতে চুর" ইত্যাদি। গানটির ছত্রে ছত্রে যেন ঈশ্বরের প্রতি সর্বসমর্পণের আকুতি ঝরে ঝরে পড়ছে। অহংবোধের নিঃশেষ বিলুপ্তির জন্য যে আর্তি ও দীনতার বেদনা এই গানটিতে

পরিমূর্ত হয়ে উঠেছে, ভক্তিসংগীতের ইতিহাসে তার তুলনা সচরাচর মেলে না—

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে
গর্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছে দূর।
ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর। —'শেষ দান'

পূর্বোল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন—"আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্ত তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ, সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভ্রান্ত নিরূপণ-শক্তির সাহায্যে রজনীকান্তের অন্তিম পর্বের জীবনবৈশিষ্ট্যের একেবারে ঠিক কেন্দ্রস্থানটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—রজনীকান্তের এই পর্বের প্রাণ, গান, আনন্দ সমস্তই 'তাঁকে' অবলম্বন করেই ছিল, অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

রজনীকান্তের এই ভক্তিভাবাকুলতা, এই গভীর ঐশী প্রবণতা তাঁর কবিত্বের একটি প্রধান আধার ও শক্তি। আর শুধু কবিত্বই বা বলি কেন, তাঁর সমগ্র জীবনেরই এটি মুখ্য অবলম্বন। তিনি জীবিকায় ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী। কিন্তু আইন-ব্যবসায় তেমনভাবে তাঁর মনোযোগ অধিকার করতে পারে নি যেমনভাবে কাব্য ও সংগীত তাঁর মনোহরণ করেছিল। আবার কাব্য ও সংগীতের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এসেও দেখতে পাই, একটি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ভগবদ্ভক্তি তাঁর তাবৎ কাব্য ও সংগীত-প্রয়াসকে ধারণ ও ব্যাপ্ত করে ছিল। বাইরে তিনি ছিলেন খুবই মিশুক, উৎসাহ ও আনন্দ-পরায়ণ—হাসি-গানে অবাধ প্রাণপ্রাচুর্যের বাহক, উৎসবমুখর (এই সকল গুণের জন্য কবি-সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁকে 'উৎসবরাজ' আখ্যা দিয়েছেন); কিন্তু এই-সব আপাত-প্রতীয়মান উৎসাহ-উচ্ছ্বাসের অন্তরালে স্বভাবের গভীরে নিবিড় ব্যাকুলতা বহন করতেন—ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় আর্তি ও আকূতির বোধে তাঁর সমগ্র জীবন একটি পরিপূর্ণ রসভারনত নিটোল ফলের মত অবনত হয়ে ছিল। বাইরে থেকে তাঁর এই ভক্তি টের পাওয়ার কারণ ছিল না, যদি-না অবশ্য নিজে তিনি তাঁর বহুসংখ্যক গানে তাকে অভিব্যক্ত করতেন।

কান্তকবি রজনীকান্তের 'বাণী' (১৯০২ খ্রী) ও 'কল্যাণী' (১৯০৫ খ্রী) দুটি সুপরিচিত সংগীত-পুস্তক মূলতঃ ভক্তিসংগীতেরই সংকলন পুস্তক বলা যেতে পারে। সংকলন দুটিতে দেশাত্মবোধক গান ও হাসির গান দুইই ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ভক্তিভাবের গানেরই সংখ্যাধিক্য উভয়ত্র। একটি মূল ভাবের মত ভক্তি সেখানে অন্য দুটি আবেগ—দেশপ্রেম ও কৌতুকমুখী সমাজ-সমালোচনাকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। তাঁর বিখ্যাত ভক্তিভাবাত্মক গান সকল, যথা "তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে", "আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ", "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ", "পাতকী বলিয়া কিগো পায়ে

ঠেলা ভালো হয়", "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে", "কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত শীতল রাগে, মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয় বয়" প্রভৃতি এই সংকলন দুটিতেই বিধৃত আছে। রজনীকান্ত যখন 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র গানগুলি রচনা করেন তখন তাঁর জীবনে মাঝে মাঝে আত্মীয়বিয়োগজনিত শোকের ছায়াপাত ঘটলেও আনন্দরঙ্গ আর উৎসবমুখীনতাই ছিল তাঁর অন্তরের মূল ভাব। অফুরন্ত গানে রঙ্গে-ব্যঙ্গে পরিহাসরসরসিকতায় স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনায় তিনি তখন উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের সমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন এবং তার ঢেউ কলকাতার তটপ্রান্তে এসেও প্রবলভাবে আছড়ে পড়ছিল। এই সময়টায় তাঁর জীবনে প্রাণের জোয়ার এসেছিল বলা যায়। কিন্তু দেখা যায় ওই সময়েও তিনি অন্তরের নিভৃতে ভগবানকে আশ্রয় করে আত্মসমাহিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যখনই সুযোগ পেয়েছেন, ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছেন বাণীতে ও সুরে। তার অর্থ, যে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর প্রধান ধ্যানের বিষয় ও চির-আশ্রয়। শেষ বয়সে পরম দুর্দৈবের মুখোমুখী কিংবা বিপদে মুহ্যমান হয়ে তিনি ভগবানের চরণাশ্রয় করেননি, এ আশ্রয়ের নির্বিঘ্নতায় তিনি বহু পূর্ব থেকেই আপনাকে লালিত করে তুলেছিলেন। সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ যে একই পরমপ্রভুর অনুগ্রহের দান, একই অনুগ্রহের দুই দিক্—এই চেতনা তাঁর নিত্য-সহচর ছিল অনুমান করা যায়। যদি কান্তকবি রজনীকান্তের জীবনকে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করতে হয় তবে সেই অবধারিত চিহ্ন হল —ভক্তি। ভক্তিভাবই রজনীকান্তের জীবনের ও ব্যক্তিত্বের মূল উজ্জীবন।

এইবার আমরা সংক্ষেপে রজনীকান্তের কিছুসংখ্যক ভক্তিমূলক সংগীত আলোচনা করব। তা-থেকে দেখা যাবে যে রজনীকান্তে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা, সুখদুঃখ বিপদবাধা প্রভৃতি অপ্রতিবাদে

মেনে নেওয়ার সদাপ্রস্তুতি, অহংভাব অবলোপের তীব্র কামনা, পাপবোধ, মরমী ভাব, দার্শনিক জনোচিত ভাবুকতা—কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না। দীনতা ও অহংবিলুপ্তির ভাবটি যে তাঁর জীবনে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল তার একটি নিদর্শন এই প্রবন্ধের পূর্বাংশে সংকলন করা হয়েছে ; এখানে আরও দু-একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে।
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক স্পন্দনে। —'কল্যাণী'

অথবা, তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।…
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত।
আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

পাপবোধের নিদর্শনমূলক বাণীসংবলিত গান একাধিক আছে। তার দু-একটি নমুনা এখানে উৎকলন করছি :

তব করুণা-অমিয় করি' পান—
যত, পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষণ্ণতা,
নিরাশ, নিরুদ্যম, পায় অবসান।
এই, পাপ-চিত্ত সদা তাপ-লিপ্ত রহি'
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি',

দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',
দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিত্রাণ। —'বাণী'

অন্য একটি গানের একাংশ :

(মম) সুপ্তহৃদয় করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অনুশীলন ;
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে, হায় !
(এসো) দীনদয়াময়ি ! রক্ষ, রক্ষ, লহ
কোলে, ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ ;
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়। —'বাণী'

অনুরূপ ভাবের আর একটি গান :

স্থান দিও করুণাময় তব চরণ-তলে,
যদি, না পারি লভিতে নিজ ধরম-বলে !
দৃঢ় পণ করি, "পাপ করিব না আর,
করিব না" ব'লে, পাপ করেছি আবার ;
তবু তোমারে না আনি ডাকি', আপন গরবে থাকি,
ব্যর্থ পুরুষকার করম-ফলে। —'কল্যাণী'

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে যে পাপবোধের বর্ণনা করা হয়েছে তা জীবজীবনসুলভ পাপবোধ—প্রতি মানুষের জীবনেই বিশেষ সময়ে ও ক্ষণে তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়, ব্যক্তিভেদে কারও জীবনে বেশি কারও জীবনে কম। কিন্তু তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাবার উপায় বোধকরি কারও নেই। কবি মনুষ্যজীবনের সেই সহজাত ও একান্ত স্বাভাবিক পাপবোধকেই এখানে রূপায়িত করে তুলেছেন উপযুক্ত বাণী ও সুর সংযোগে। পাপবোধ খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মজ্জায় অনুস্যূত। কবি খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের, বিশেষত ক্যালভিনীয় ধর্মমতের, অনুশীলন করেছিলেন কিনা সঠিক জানবার পথ নেই, তবে দেখা যায়

জ্ঞাতসারেই হোক অজ্ঞাতসারেই হোক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসসুলভ পাপবোধের অভিব্যক্তিমূলক পদ তাঁর একাধিক গানে ছড়িয়ে আছে। এই সাদৃশ্য আপতিক বলেই আমাদের বিশ্বাস। যে কথা এইমাত্র বলা হয়েছে, প্রতি মানুষের মধ্যেই কম-বেশি যে সহজ পাপবোধ থাকে কবির চেতনা সেই উপলব্ধি প্রসূত হওয়াই সম্ভব। রজনীকান্ত নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন। তাঁর ভক্তিভাবের গানগুলিতে হিন্দুধর্মের ভাবের ছড়াছড়ি। অবশ্য এ হিন্দুধর্ম প্রথাবদ্ধ হিন্দুধর্ম নয়, পরিশোধিত হিন্দুধর্ম, যুগোচিত চেতনার দ্বারা মার্জিত ও সংস্কৃত। খ্রীষ্টীয় পাপবোধের সঙ্গে রজনীকান্তের গানের পাপবোধের সাদৃশ্য আসলে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মূলগত ঐক্যের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবির আত্মসমর্পণের আকূতিপূর্ণ গানগুলিই সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, সরল ও মধুর। দু-তিনটি টুকরো নমুনা :

তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।....
আছ অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া ;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে। —'বাণী'

* *

প্রেমে জল হয়ে যাও গ'লে,

কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মত,
কল্‌কলে অবিরত 'জয় জগদীশ' ব'লে। —'বাণী'

* *

আর কত দিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরান রাখিব মা ?— —'কল্যাণী'

কবির প্রসিদ্ধ বেহাগ সুরের গানটিও একই গভীর আত্ম-নিবেদনের আকৃতি বহন করছে :

পাতকী বলিয়ে কিগো, পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ।
করিতে এ ধূলাখেলা অবসান হল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময় ।....
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামি !
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?— 'কল্যাণী'

পূর্বেই বলেছি যে, কান্তকবি রজনীকান্তের কল্পনা ও ভাব কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে আবর্তিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি তার মধ্যে একটি। ভগবদ্ভক্তিরও কতকগুলি সুপরিচিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গানে—আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা, দীনতা, পাপবোধ, অহংকার, তীব্র কামনা, ইত্যাদি। এই কয়েকটি সুচিহ্নিত ভাবে তাঁর গীতভাণ্ডার পূর্ণ।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

১

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণেতা আচার্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬—১৯৩৯)-এর এটি জন্মশতবার্ষিকীর বৎসর। ১৮৬৬ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে ঢাকা জিলায় তাঁর জন্ম। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্যসাধনায় আজীবন তদ্গতচিত্ত ও একনিষ্ঠ এই মনীষী লেখকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। তখন তাঁর তিরিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ওই তাঁর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম সার্থক আত্মপ্রকাশ। তার আগে অবশ্য তিনি অনেকদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সময়কালীন বাংলা ভাষায় রচিত নানা হাতে-লেখা পুঁথি সংগ্রহের কার্যে ব্যস্ত ছিলেন এবং ওই সব বিষয়ে মাঝে মাঝে 'ভারতী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথি-পাণ্ডুলিপির ভিতর বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির অনুবাদ, লোকগাথা ইত্যাদি নানা ধরনের উপকরণ ছিল। এই সব বিচিত্র উপকরণের উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

যখন তাঁর এই গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন তিনি পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেডমাস্টার। বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপরিজ্ঞাত শিক্ষাজীবীর জীবন থেকে তাঁর সাহিত্যের

গৌরবোজ্জ্বল জগতে প্রবেশের সূত্রপাত হয় ওই ঘটনায় এবং বাংলাদেশ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে একজন খাঁটী সাহিত্যপ্রাণ লেখক ও অক্লান্তকর্মা গবেষক রূপে সাদরে বরণ করে নেয়।

দীনেশচন্দ্র যদি বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক টানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে না আসতেন এবং স্কুলের কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তবে হয়তো একজন সাফল্যমণ্ডিত কিন্তু জাতীয় জীবনের দিক থেকে কমবেশী অকার্যকর শিক্ষাব্রতী রূপেই তাঁর জীবনের অবসান হত। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। সেই অভিপ্রায়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের পুরুষকার যুক্ত হয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ গতিপথকে আরও সুনিশ্চিত করে তোলে। বাল্যকাল থেকেই দীনেশচন্দ্র অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর বিধবা দিদি দিগ্বসনী দেবীর মুখে পদাবলী কীর্তন শুনে নিতান্ত বাল্যকালেই তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন ও নিজেও একজন কবি হবার আকাজ্ক্ষা পোষণ করেন। কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু—যেমন আর দশজন সাহিত্যযশোপ্রার্থী বাঙালী তরুণের শুরু হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এইখানে যে, তিনি তাঁর শক্তির দিক্ ও সীমা সম্পর্কে যৌবনারম্ভেই অবহিত হতে পেরেছিলেন এবং সেই ভাবে আপনাকে তৈরী করবার কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর আত্মজীবনমূলক গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য'-এর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায় তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?" অন্যত্র তিনি লেখেন—"আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব। কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াইবেন।"

এই দুই উক্তি থেকেই তাঁর মনের গড়ন বোঝা যায়। তাঁর অপরিসীম উচ্চাশা ও আত্মপ্রত্যয়শীলতার সংকেত যেমন এর মধ্যে

পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে তাঁর গ্রহণবর্জনপন্থী বিচারশীল নির্বাচনী মনের পরিচয়। শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া যে একমাত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এবং সকলকে এই ভূমিকায় মানায় না এই বোধ জীবনের ঘাত-সংঘাতময় সংগ্রামের পথে নানা তিক্ত কষায় অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং তদনুযায়ী তিনি তাঁর লক্ষ্যকে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করে আনেন। শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া-রূপ আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনে শক্তিক্ষয়ের বদলে অধ্যবসায়ের অপেক্ষাকৃত ঘর্মজলঝরা বন্ধুর পথ পরিক্রমায়ই যে কর্মের অধিকতর সিদ্ধি, অন্তত তাঁর বেলায়, এ এক প্রকার দিব্যজ্ঞান বলতে পারা যায়। সকলের এই দিব্যজ্ঞান থাকে না। (হায়, যদি থাকত! তা হলে আর সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে এত-এত কবির ঠেলাঠেলি-ভিড় প্রত্যক্ষ করতে হত না এবং সাহিত্যের আঙ্গিনাও এত-এত বাহুল্য কবিতায় ভরে উঠত না।)

আসলে এই দিব্যজ্ঞান আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। নিজের শক্তির সীমা বোঝা—তা-ও অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সে—বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। দীনেশচন্দ্র প্রভূত-উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ তিনি বিনয়ী ছিলেন আর তাঁর চরিত্রে এই বিনয় ছিল বলেই তিনি তাঁর জীবনকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন।

বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তথা সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দীনেশচন্দ্রের। এর আগে যে বাংলাদেশে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা হয়নি তা নয়। এ চেষ্টার সূত্রপাত করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বাংলার প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করে। পরে একে একে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ও সর্বশেষে

রমেশচন্দ্র দত্ত এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।* কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও সকলেই তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের খণ্ডিত আলোচনা করেছেন, কেউ কেউ নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী মাত্র কবিবিশেষের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন—এঁদের ভিতর আবার বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের রচনা ইংরেজীতে। অনধিক এক হাজার বৎসরের পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এতই সুবিস্তৃত ও বিপুলায়তন যে খণ্ড আলোচনায় বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের আলোচনা-গুলিতে সেই সুবিচার হয়নি। তবে প্রাথমিক আলোচনামাত্রেই অপূর্ণতা থাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা সেগুলির মূল্যায়ন করি তবে অবশ্যই তাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারব। এসব রচনার দ্বারা সাহিত্যের এই বিশেষ বিভাগে পদক্ষেপ দীনেশচন্দ্রের পক্ষে সহজতর হয়েছিল—অন্তত তিনি যে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলি থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) বইখানি তাঁকে অনেকটাই উদ্বুদ্ধ করে থাকবে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ প্রণয়নে দীনেশচন্দ্রকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলার অভ্যন্তর ভাগে দূর-দূর অঞ্চলে তাঁকে পুঁথির খোঁজে যেতে হয়েছে এবং যেসব অনক্ষর কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরদের গৃহে এই সব পুঁথি সংরক্ষিত ছিল তাদের নানারূপ সংস্কারগত বাধা অতিক্রম করে এগুলি সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে। এগুলির উপর যদি দীনেশচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টি না পড়ত তা হলে কীট এবং কালপ্রভাবজনিত ক্ষয়ের আক্রমণে জীর্ণ

---

* এ বিষয়ে সবিশেষ জানতে হলে পাঠকবর্গ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীভবতোষ দত্ত-রচিত 'দীনেশচন্দ্র ও ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ' প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

হয়ে একদা এগুলি নিশ্চিত ধ্বংস কবলিত হত এবং ওই পথে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত। দীনেশচন্দ্র সে সবের উদ্ধার সাধন করে বাংলাদেশের কী যে মহদুপকার সাধন করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু সংগ্রহ অভিযানেই তাঁর ক্লেশ নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, সংগৃহীত মালমশলার পাঠোদ্ধার, সন তারিখ নির্ণয়, পর্বভাগ, বিন্যাস, ইত্যাদিতেও তাঁকে কম শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। এইভাবে কয়েক বৎসরের একাগ্র চেষ্টায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের কলেবর গড়ে ওঠে এবং তা' ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থখানি বাংলার সুধী-সমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। রাতারাতি দীনেশচন্দ্র বিখ্যাত হয়ে পড়েন। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—যিনি দীনেশচন্দ্রের সারস্বত সাধনার সংবাদ রাখতেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে পুঁথি-সংগ্রহে তাঁকে কয়েকবার সাহায্যও পাঠিয়েছিলেন— 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় ওই গ্রন্থের এক উচ্চপ্রশংসাপূর্ণ পরিচিতি লেখেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯০১) প্রকাশ উপলক্ষ্যে লিখলেন—"এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না, তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম। দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই, আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ ইতিহাস-বনস্পতিই বটে। বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার তার মধ্য দিয়ে গোটা বাংলাদেশের মর্মজীবনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাঙালী জাতির বিচিত্র কাব্যসাধনার শাখা-প্রশাখা এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাণ্ডকে আশ্রয় করে মহীরূহের আকারে চারদিকে ডালপালা মেলে ধরেছে—এমনতরো বিশালতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে গ্রন্থের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ধাঁচের ভিতর। পণ্ডিতদের মতে প্রত্যেক জাতিরই নাকি এক-একটি কৌলিক বা জাতীয় সংস্কার (racial consciousness) থাকে আর তা নিহিত থাকে মূলতঃ তার ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারার মধ্যে। ফ্রয়েড-শিষ্য যুঙ্গ-এর (Gustav Jung) মতে এই জাতীয় সংস্কারের পরিচয় মিলবে জাতির ছড়া, পাঁচালী, গাথা, প্রবচন, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে। মনোবিজ্ঞানী মাত্রেই দেশের রূপকথা, উপকথা, ছড়া, কিংবদন্তী প্রভৃতির উপর সবিশেষ জোর দেন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে দীনেশচন্দ্র বাঙালীর প্রাচীন, মধ্য ও প্রাগাধুনিককালীন সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে প্রকারান্তরে বাঙালী জাতির কৌলিক সংস্কারেরই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন তৎকালীন বাংলাভাষা-ভাষী পাঠকের কাছে।

মনে হয় বাঙালী জাতির মর্মগত সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের মনে একটি বিশেষ ধারণা ছিল। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' 'বৃহদ্বঙ্গ' প্রভৃতি সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাস পর্যালোচনামূলক গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে এবং ভিন্ন প্রকৃতিরও নানা লেখায় তিনি তাঁর এই ধারণা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই ধারণার সঙ্গে হয়তো আজকের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী আধুনিকের ধারণার মিল হবে না, তা বলে আধুনিক চিন্তার ধারণাটাই সত্য আর তাঁর ধারণাটা ভুল এমন মনে করবার কারণ নেই। বরং জাতীয় সংস্কৃতির মর্মমধ্যে প্রবেশকারী তথা পুরাতন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও গাথার পাথার মন্থনকারী দীনেশচন্দ্রের

ধারণাটাই একালীন মানুষের ধারণার তুলনায় সত্যের সমধিক কাছ-ঘেঁষা হওয়া সম্ভব। মাতৃস্তন্যের পোষণী শক্তির মতো মাতৃভাষার শক্তিও বড়ো অসাধারণ। যে ব্যক্তি মাতৃভাষা-চর্চায় ওতপ্রোত হয়ে আছেন এবং তারই স্তন্যরসধারায় আজীবন পরিপুষ্ট, সেই সঙ্গে ইতিহাসবোধে দীপ্ত, দেশ ও জাতির স্বরূপ লক্ষণ নিরূপণে তাঁরই কথা বলার অধিকার সর্বাধিক। একালের দু-পাতা-ইংরেজী পড়ুয়ারা বিদেশী সংস্কৃতির পরিচয়ের (তা-ও ছেঁড়া-খোঁড়া, আধ-খেঁচড়া) সূত্রে যতই কেন-না আত্মপ্রসাদ লাভ করুন, তাঁদের সে আত্মপ্রসাদের কোনো ভিত্তি নেই। জাতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেও পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়—আজকাল সেরকম পাণ্ডিত্যের নমুনাই বেশী—কিন্তু মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কখনও ও পথে হয় না। দীনেশচন্দ্রের লেখার ছত্রে ছত্রে যে আত্যন্তিক জাতীয়তার আবেদন আছে তা প্রথম দৃষ্টিতে পুরাতন ঘেঁষা বলে মনে হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে জীবনদায়িনী শক্তি আছে। তা মনুষ্যত্বের স্ফূর্তিকারক। বাঙ্গালীত্ব তথা ভারতীয়ত্বের চিহ্নমণ্ডিত যে-সকল মূল্যবোধগুলিকে তিনি সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তার কোনোটিই সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্রভাবাত্মক নয়, উল্টো, উদারতা ও মানবতায় মহীয়ান্। আজকের দিনের বিশ্বজনীন আদর্শের সঙ্গে সে সবের কোথাও অসামঞ্জস্য বা সংঘাত নেই, কেন-না প্রেমই ওই মূল্যবোধগুলির মূলকথা। আমাদের তাবৎ কর্মের অন্বিষ্ট প্রেম আর প্রেমের দ্বারাই নিঃসন্দেহে আমাদের সব-কিছু নিয়ামিত হওয়া উচিত। তা যদি হয় তো দীনেশচন্দ্র বাঙালী জাতির মৌলিক সংস্কার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রেমপ্রীতি দয়ামায়া বাৎসল্য পাতিব্রত্য ভ্রাতৃস্নেহ সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে কিছু অন্যায় করেননি, পুরাতনের উপর দাগা-বুলনোও তাকে বলা চলে না, বরং একালেও আমাদের যা আচরণীয়—শুধু একালের কেন সর্বকালের পক্ষেই যা সত্য—তারই আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। জাতীয় প্রতিভার

ইঙ্গিত দিতে পারা একটি মহৎ কাজ। কেন-না তার মধ্যে আত্ম-পরিচয় নিহিত। জাতির প্রতিভা কোন্ খাতে বহমান জানা থাকলে সেই ধারা অনুসরণ করে চ'লে যুগপৎ স্বভাবের স্ফূর্তি অনুভব ও শক্তির অপচয় রোধ করা যায়। দীনেশচন্দ্র তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে ওই বাঞ্ছিত কর্মই করেছিলেন—তিনি জাতীয় প্রতিভার অর্থাৎ বাঙ্গালীর সাধর্ম্যের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন।

অথচ দীনেশচন্দ্র ঠিক টুলো-পণ্ডিত-গোছের লেখক ছিলেন না। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের লোক ছিলেন—ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছিলেন। এটা অনেকের নিকট সংবাদ মনে হতে পারে যে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের সূত্রেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রেরণা পান। এই বাসনা আরও উদগ্র হয় ফরাসী, রুশ, জার্মান প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করে। তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগের অনুকরণে কৃত। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন The Elizabethan Period (এলিজাবেথীয় যুগ), The Age of Reformation (সংস্কার যুগ), The Age of Reason (যুক্তিপ্রধান যুগ) প্রভৃতি পর্ববিভাগ আছে, তিনিও সেই আদর্শে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছিলেন—হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, চৈতন্য-যুগ, সংস্কার যুগ ইত্যাদি। এই বিভাগ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক কারণ ইতিহাসের গতিপথ সুশৃঙ্খল প্রণালীতে অনুসরণের এটি সহায়ক। দীনেশচন্দ্রের পূর্বে একমাত্র পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বইয়ে এ-জাতীয় কালিক বিভাগের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

দীনেশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে কবিতার পথ ত্যাগ করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর ভিতর বরাবরই কবিপ্রাণতা ছিল। তিনি তাঁর ইতিহাসে তথ্য নিয়ে যথেষ্ট কারবার করলেও নীরস, বিশুষ্ক ধারার তথ্যাশ্রয়ী পণ্ডিত তিনি ছিলেন না। তাঁর ভিতর আবেগ প্রভূত পরিমাণে ছিল

এবং প্রায়শঃ সেই আবেগ সৃজনী-আকৃতি-মণ্ডিত ছিল। তথ্য ও সংবাদের খড়-মাটির কাঠামোর উপর যতক্ষণ না বর্ণের প্রলেপে তিনি লাবণ্যের সঞ্চার করতে পারতেন ততক্ষণ তাঁর সৌন্দর্যচেতনার তৃপ্তি ছিল না। কাব্যের সুষমা দিয়ে তিনি মৃন্ময়ী প্রতিমাকে চিন্ময়ী প্রতিমায় রূপান্তরিত করতেন।

তাঁর এই কবিপ্রাণতার প্রমাণ তাঁর ভাষা। ইতিহাস রচনায় এমন রসাপ্লুত, বর্ণাঢ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর আগে কিংবা পরে কেউ করেননি বাংলা সাহিত্যে। দীনেশচন্দ্রের ভিতর যে সহজাত কবিত্ব ছিল তা কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে নির্গমনের পথ না পেয়ে ইতিহাসকে আশ্রয় করেই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠতে চেয়েছে। পরবর্তী সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ দীনেশচন্দ্রের এই আবেগবহুল কাব্যালঙ্কারমণ্ডিত ভাষাকে তাঁর রচনার এক প্রধান ত্রুটি আখ্যাদান এবং তদ্বিচারে তাঁর ইতিহাসের মূল্যাপকর্ষের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা বলব দীনেশচন্দ্রের এই রচনাশৈলী তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেরই দ্যোতক এবং এটি তাঁর ত্রুটীও বটে, শক্তির প্রমাণও বটে। শক্তির প্রমাণ এইজন্য যে, এমন সরস ভঙ্গীর ঐতিহাসিক রচনাক্রমের সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে আর ইতিহাস পাঠে এমন সুখ কদাচ লভ্য। অজস্র শুকনো, খটখটে তথ্য একত্র সংগৃহীত করে তা দিয়ে ইতিহাস গড়বার চেষ্টা করলে—যেমন পরবর্তী কালে কেউ কেউ করেছেন, নাম না-হয় না-ই উল্লেখ করলাম—তাতে বড়োজোর কঙ্কাল রচিত হতে পারে কিন্তু কঙ্কালে রক্ত-মাংসের সংযোজন ওই উপায়ে কোনো কালেই সাধিত হবার নয়। এ-জাতীয় চেষ্টায় কঙ্কালের হাড়গুলি মুখ ব্যাদান করে চেষ্টাকারীকেই বরং সতত ব্যঙ্গ করতে থাকে।

যাক, অপরের সমালোচনায় কী-বা লাভ! আমরা দীনেশচন্দ্রের কথাতেই ফিরে আসি। দীনেশচন্দ্রের কবিপ্রাণতার আরও একটি প্রমাণ, তিনি নিছক ইতিহাস রচনার চেষ্টা পাননি, সেই সঙ্গে জাতীয় সংবিৎ গড়ে তোলারও প্রয়াস করেছেন। পূর্বে এ সম্বন্ধে কতকটা

সবিস্তারেই আলোচনা করা হয়েছে। শুধু প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করছি এজন্য যে, তাঁর জাতীয় প্রতিভার দিঙ্‌নির্ণয় কিংবা জাতীয় সংস্কারের স্বরূপলক্ষণ নির্দেশ চেষ্টা নিছক ইতিহাসবোধ সঞ্জাতই ছিল না, কবিত্বের আবেগ দ্বারা মণ্ডিত ছিল—এটা চিহ্নিত হওয়া দরকার। জাতীয় প্রতিভার স্বরূপ নিরূপণ মূলতঃ কবির কাজ, কেন-না কবি যেমন জাতির অন্তর্চেতনার পরিচয় পান এমন আর কেউ পান না—তাঁর স্বধর্মই তাঁকে এ কাজের বিশেষ উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। কবির থাকে তৃতীয় নয়ন, ইংরাজীতে যার শব্দান্তর করে বলা যেতে পারে sixth sense, এই তৃতীয় নয়নের প্রসাদেই কবি দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হন। ঠিক এই কবিকৃত্যই পালন করেছিলেন দীনেশচন্দ্র তাঁর কমবেশী চল্লিশ বৎসরের একাগ্র সাহিত্যসাধনার জীবনে, বার বার জাতীয় সংস্কারের উপর তাঁর সন্ধানী হস্তরক্ষার চেষ্টা করে। তাঁর ভিতর ঐতিহাসিকের আর কবির মিলন হয়েছিল। তাঁর রচনাবলীর সৃজনী আবেগের রহস্যও এইখানে।

২

ইতিহাস রচনার গুরুতর পরিশ্রমে দীনেশচন্দ্রের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য কোনোকালেই ভালো ছিল না। দেহের ক্ষীণতা তো ছিলই, উত্তর-জীবনে তার সঙ্গে স্নায়বিক পীড়া যুক্ত হয়ে অবস্থা আরও অসহনীয় করে তোলে। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর মনোবল—কোনো অবস্থাতেই তিনি বাণীর সেবা থেকে নিবৃত্ত হননি, বরং উত্তরোত্তর তাঁর জীবনে জ্ঞানচর্চা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছিল। অন্যান্য অনেক কারণের সঙ্গে দীনেশচরিত্র এইজন্যও আমাদের মুগ্ধ করে যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত বাদ দিলে এরকম একাগ্রচিত্ত একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধকের উদাহরণ আমাদের সাহিত্যে বিরল। জীবনভোর তিনি ক্লান্তিহীনভাবে লেখনী চালনা করে গেছেন এবং একমাত্র সাহিত্যেই স্থিতকর্ম ছিলেন। সাহিত্যানুশীলন ব্যতিরেকে অন্য কোনো কাজে তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়নি—এটি আজকের

নানামুখী পরস্পরবিরোধী কৌতূহলের সাংঘাতের যুগে প্রায় অভাবনীয় সংঘটন বলা চলে। সাহিত্যে অনুরাগ থাকে তো রাজনীতিও মনকে কম আকর্ষণ করে না, রাজনীতি ভালো লাগে তো গঠমমূলক সেবাদর্শও রাজনীতির কাজে ভাগ বসিয়ে সময় ও উদ্যমকে দ্বিধা-বিভক্ত করে—এইভাবে আজকের মানুষের মন ঘড়ির দোলকের মতো বিভিন্ন কর্মাদর্শের মধ্যে কেবলই দোল খেয়ে ফিরছে অনবরত। তাতে শক্তির বণ্টন, অর্থাৎ একমুখী কর্মে শক্তির পূর্ণপ্রয়োগের পথে বাধা। এরকম ৰিভক্ত মন নিয়ে কোনো কাজের প্রতিই যে সম্যক সুবিচার করা যায় না তা বোধ করি না বললেও চলে, যদি-না অবশ্য কারুর অমানুষিক ক্ষমতা বা দৈবী প্রতিভা থাকে। আচার্য দীনেশ-চন্দ্রের দৃষ্টান্ত এই দিক্ দিয়েও বিনয়ের দৃষ্টান্ত যে, তিনি তাঁর ক্ষমতার সীমা বুঝে কেবলমাত্র সাহিত্যের দেবীকেই তাঁর উপাস্য করেছিলেন, অন্য কোনো কাজের নেশায় নিজেকে জড়াননি। বাণী বীণাপাণির আশীর্বাদ লাভ করতে হলে বোধহয় এরকম একমুখী তন্ময়তাই দরকার —এমনকি আজকের দিনের অনিবার্য নানামুখী বিক্ষেপের দিনেও বুঝি এ কথা সত্য। যিনি সর্বাধিক পরস্পরবিরোধী আকর্ষণের টান সংবরণ করে স্বধর্মে অবিচল থাকতে পারেন তাঁরই শেষ পর্যন্ত জিত। এই ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত আমাদের খুবই অনুপ্রাণিত করে।

স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় দীনেশচন্দ্র শিক্ষকতার কর্ম পরিত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন এবং সেখানে থেকে জীবিকার সংস্থান করতে পারা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরীক্ষকের পদপ্রার্থী হন। অশেষবিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তার পূর্বেই এই শক্তিমান সাহিত্যসাধকের উপর পড়েছিল—তাঁর রচনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের প্রার্থনা অচিরেই মঞ্জুর হয়। পরে ১৯০৯ সনে একবার এবং ১৯১৩ সনে আর একবার স্যার আশুতোষ কর্তৃক দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের উপরে বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রিত হন। দীনেশ-চন্দ্রকে প্রদত্ত এই সম্মানে প্রকারান্তরে বাংলা ভাষাকেই সম্মান দেওয়া হয়েছিল, কেন-না তার কয়েক বৎসর পরেই—১৯২০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের জন্য পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হয়—বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দীনেশচন্দ্র এই বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা প্রবর্তনের কৃতিত্ব স্যার আশুতোষের সঙ্গে নিঃসন্দেহে দীনেশচন্দ্রেরও—কেন-না দীনেশচন্দ্রের যোগ্য সহায়তা না পেলে একার চেষ্টায় এ ব্যবস্থার রূপদান সম্ভব হত না। বাংলা ভাষার এই মর্যাদার জন্য বাংলাদেশের মানুষ এই দুই কৃতী পুরুষের নাম চিরকাল সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

১৯০৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে দীনেশচন্দ্র ইংরাজীতে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন তা-ই পরে ১৯১১ সনে 'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার' গ্রন্থরূপে সংবদ্ধ হয়ে প্রচারিত হয়। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের নাম পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার ভারত-জিজ্ঞাসুরা বইটির ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী সিলভাঁ লেভি দীনেশচন্দ্রকে লিখিত এক ব্যক্তিগত পত্রে তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানান: "আপনার বইয়ের সঙ্গে ভারত-সংক্রান্ত অন্য কোনো বইয়েরই তুলনা চলে না....সাহিত্যের এ'রকম বাস্তব বোধ আমি আর দেখিনি.... আপনি যে রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলছেন তাতে শেক্সপীরীয় ধরনের পণ্ডিত ও চাষী, যোগী ও রাজা গলাগলি করে বিরাজ করছে।" বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিত অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ 'ফ্র্যাঙ্কফুর্টার ট্রাইট্যুজ' নামক জার্মান পত্রিকায় গ্রন্থটিকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করেন। সচরাচর-প্রশংসাকৃপণ ইংলণ্ডের 'টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট'

পত্রিকার ২০ জুন ১৯১৯ তারিখের সংখ্যায় লেখা হয়ঃ "যথার্থ পণ্ডিতজনোচিত অকৃত্রিম ভাষায় তিনি (দীনেশচন্দ্র) তাঁর কাহিনীতে পাঠকবৃন্দের সমক্ষে হিন্দু মন ও হিন্দুর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর বার্তা উপস্থিত করেছেন। ইউরোপীয়দের লেখা পঞ্চাশটি ভ্রমণ বৃত্তান্তের বই থেকেও এত বার্তা জানা যেত না। তাঁর জন্মভূমি বাংলার সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তিনি যে স্থায়ী স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলেছেন তার জন্য সঙ্গতভাবেই তিনি গর্ববোধ করতে পারেন।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার এবং পরে অধ্যাপক পদে সমাসীন থাকা কালে দীনেশচন্দ্র অক্লান্তভাবে গ্রন্থরচনায় নিয়োজিত থাকেন।—পূর্বোক্ত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ও তার ইংরাজী সংস্করণ বাদে পর পর তাঁর ইংরাজী ও বাংলা এই বইগুলি প্রকাশিত হয়ঃ 'টীপিকাল সিলেক্সন্স ফ্রম দি বেঙ্গলী লিটারেচার ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইম্স্ টু দি মিডল্ অব দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী,' 'দি বৈষ্ণব লিটারেচার অব মীডিয়েভাল বেঙ্গল,' 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ এজ,' 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ কম্পেনিয়ন্স,' 'দি ফোক লিটারেচার অব্ বেঙ্গল', 'বেঙ্গলী প্রোজ স্টাইল,' 'বেঙ্গলী রামায়নস্,' 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল ব্যালাড্স,' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা,' 'মৈমনসিংহ গীতিকা', ইত্যাদি।

দীর্ঘ ভূমিকা সমৃদ্ধ 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাডস্' (চার খণ্ড) পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ এই বইয়ের ফরাসী অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। রোলাঁ পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির অভাবিত কবিত্বসৌন্দর্যের রসাস্বাদে মুগ্ধ হয়ে এগুলির আবিষ্কারের জন্য উচ্ছ্বসিত ভাষায় দীনেশচন্দ্রের প্রশংসা করেন। কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত শুধুমাত্র এই গাথাগুলির মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। প্রখাত চেকোশ্লোভাক ভারততত্ত্ববিৎ অধ্যাপক লেস্নীর শিষ্য ডক্টর দুযান জুবিটেল বাংলা-দেশে অবস্থিতি কালে দীনেশচন্দ্রের সংগৃহীত মৈমনসিংহ গীতিকা-গুলির বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন এবং তার কতকাংশ চেক্ ভাষায় অনুবাদ করেন।

পূর্ববঙ্গের গীতিকাসমূহের সংগ্রহ-কার্যে দীনেশচন্দ্রের সহায়ক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে, কবি জসিমুদ্দিন, যতীন্দ্র সেন প্রমুখ।

১৯২০ থেকে ১৯৩২ এই বারো বৎসর দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় মধ্যে বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজ কর্তৃক তিনি প্রচুর পরিমাণে সমাদৃত হন—বাংলা ভাষার অন্যতম প্রবীণ অভিভাবক তথা সাহিত্যাচার্যের পদে দেশবাসী অবলীলায় তাঁকে বরণ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীনেশচন্দ্রকে 'ডক্টর অব্ লিটারেচার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। শুধু যে দেশবাসীর কাছ থেকেই তিনি মান পেয়েছেন তা নয়, তদানীন্তন ইংরেজ সরকারও তাঁর গুণাবলীর স্বীকৃতিতে তাঁকে সম্মান দান করতে বাধ্য হন। এ দেশে 'রায় বাহাদুর' বা ওই-জাতীয় উপাধির পিছনে প্রায়শঃ তদ্বির-তদারকি, রাজানুগত্য, দাস্ত, স্বদেশীয়দের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি মনোভাবের আধিপত্য থাকে। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের 'রায় বাহাদুর' খেতাব প্রাপ্তি একান্তভাবেই তাঁর তন্নিষ্ঠ সাহিত্যসেবার ফলশ্রুতি। এ ব্যাপারে প্রায় সমসাময়িক কালে আর-একজন তাঁর দোসর হয়েছিলেন—জলধর সেন।

ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন ১৯৩২ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরেও তাঁর সাহিত্যচর্চা অবিচ্ছেদে চলতে থাকে। ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃহদ্বঙ্গ'। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যেমন বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস, এটি বাংলার সংস্কৃতি, ধর্ম ও লোকজীবনের ইতিহাস,—তেমনি ব্যাপক পরিকল্পনা সহকারে রচিত, দুই খণ্ডে সুবৃহৎ রচনা। এতেও বাঙালী জাতির কৌলিক সংস্কারের কথা সবিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা হয়েছে—বাঙালীর সাধর্ম্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দীনেশচন্দ্রের আর সব রচনা যদি মুছেও যায়, কেবলমাত্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ও 'বৃহদ্বঙ্গ'-এর জন্যই তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে কোদিত থাকবে।

৩

সৃষ্টিশীল লেখক হিসাবে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব তাঁর ঐতিহাসিক কৃতিত্বের সমতুল গণনীয় না হলেও এ ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তা-ও পরিমাণে যথেষ্ট স্ফীতকায়, গুণে ভারী। রচনার এই বিভাগেও যদি তিনি আর কোনো বই না লিখে কেবলমাত্র 'রামায়ণী কথা' বইখানি লিখে যেতেন তা হলেও তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকত। দীনেশচন্দ্রের ভাষাশক্তির কথা পূর্বেই বলেছি। ভাষার জাদু 'রামায়ণী কথা' বইখানির এক প্রধান সম্পদ্। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামায়ণের চরিত্রগুলির নিপুণ মনোবিশ্লেষণ, তাদের ক্রিয়াকলাপের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। এই বইয়ের চরিত্রব্যাখ্যায় তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা যদি নূতন চরিত্রসৃষ্টির কাজে লাগাতেন তা হলে খুব সম্ভব সেখানেও তাঁর হাত থেকে মূল্যবান কিছু পাওয়া যেত। তিনি দুই-একখানি উপন্যাস লিখেছেন সত্য (যথা, 'দেশমঙ্গল', 'চাকুরীর বিড়ম্বনা') কিন্তু তাতে তিনি তেমন অভিনিবেশ প্রয়োগ করেননি—তাঁর শক্তি মূলতঃ ইতিহাস আর পুরাতনচর্চার খাতেই প্রবাহিত হয়েছে।

'রামায়ণী কথা'য় তিনি ভরত চরিত্রকে রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর এই বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার না করলেও ('জয়শ্রী', বৈশাখ ১৩৭৩ সংখ্যায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যে, যুক্তিক্রমের সহায়ে তিনি ভরতকে এমনতরো শীর্ষ মর্যাদার গৌরব দিয়েছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীনেশচন্দ্রের স্বীয় বাচনিক তাঁর যুক্তিক্রমের কতকাংশ অনুধাবন করা যাক:

"রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রূঢ়

ও দুর্বিনীত হইয়াছে।...কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন—

'রামাদপি হিতং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।"

[রামায়ণী কথা, জিজ্ঞাসা সংস্করণ, পৃঃ ৮৭]

রবীন্দ্রনাথ বইখানির ভূমিকা লিখেছিলেন। রামায়ণ ভারতবাসীর জীবনে যুগ যুগ ধরে যে গভীর শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে আছে তার মাহাত্ম্য কীর্তন অন্তে তিনি গ্রন্থের লেখককে তাঁর অনবদ্য চরিত্রালেখ্যগুলির জন্য স্বীয় অননুকরণীয় ভাষায় সংবর্ধিত করেছেন। তিনি লিখেছেন—"কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন: এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।" (তদেব, পৃঃ ১০)

প্রাচীন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে বর্ণিত কয়েকটি সুপরিচিত আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে দীনেশচন্দ্র 'সতী', 'জড়ভরত', 'ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ', 'বেহুলা' ও 'ফুল্লরা'—এই কয়টি পুস্তক রচনা করেন। (পরে এই কাহিনীপঞ্চক 'পৌরাণিকী' গ্রন্থে একত্র সংবলিত হয়।) একই পর্যায়ের গ্রন্থমালিকায় তিনি কয়েকখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ভক্তিমূলক আখ্যায়িকার পুষ্পও সংযোজন করেন—যথা, 'মুক্তা চুরি', 'শ্যামলী খোঁজা', 'কানুপরিবাদ', 'রাগরঙ্গ', 'রাখালের রাজগী' ও 'সুবল-সখার কাণ্ড'।

এই দশখানি বইয়ের ভাষা অতি-মনোরম, সুললিতধ্বনিযুক্ত, ঝঙ্কারময়—দীনেশচন্দ্রের মত কবিপ্রাণ লেখকেরই উপযুক্ত ভাষা। ভূমিকাসমূহের সেই একই বক্তব্য—যার কথা পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি—স্বদেশের পুরাতন সম্পদের প্রতি আধুনিক শিক্ষিতজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁদের স্বত্ব হবার জন্য আহ্বান। 'সতী'

গ্রন্থের (পরে এই গ্রন্থের আখ্যায়িকা ইংরেজীতে রচিত হয়ে বিদেশে প্রচারিত হয়) ভূমিকায় তিনি লিখেছেন —

"আমাদের সর্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্তমানের উপযোগী সমাজ গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইব।...সেই পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি শিল্প, সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত।" ['সতী', জিজ্ঞাসা সংস্করণ, পৃঃ ৭]

দীনেশচন্দ্রের আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য'-এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এটিও একখানি পরম উপাদেয় বই।

কিশোর সাহিত্য রচনায়ও দীনেশচন্দ্রের সবিশেষ কুশলতা ছিল। পূর্বোক্ত কোনো-কোনো রচনা (যেমন 'কুশধ্বজ', 'সুবল-সখার কাণ্ড' প্রভৃতি) ও 'বৈশাখী' গল্পসঞ্চয়নের মধ্যে তাঁর এই কুশলতার পরিচয় নিহিত আছে।

দীনেশচন্দ্রের মন যে সৃষ্টিশীল ছিল তার আর একটি প্রমাণ, প্রাচীন, মধ্য ও প্রাগাধুনিককালীন সাহিত্যে তাঁর মুখ্য মনোযোগের বিষয় হলেও তিনি আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিমুখ ছিলেন না, বরং এই সাহিত্যের প্রতি তাঁর অন্তরে যথেষ্ট সহানুভূতি ও এক ধরনের সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। এ তাঁর উদারতা ও প্রগতিশীল মনোভাবেরই দ্যোতক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আজ থেকে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর আগে যে লেখকগোষ্ঠী তারুণ্যের পুরোভাগে ও বিদ্রোহের পতাকাবাহী ছিলেন, সেই 'কল্লোল' সাহিত্যপত্রের লেখকদের প্রতি তাঁর প্রীতি অনভিব্যক্ত থাকেনি, এ তাঁর মনের সচলতার বিশেষ নিদর্শন। ওই গোষ্ঠীর দু'জন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্প্রতি দীনেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে যা লিখেছেন তার থেকেই আমরা দীনেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই দিকটির পরিচয় লাভ করি।

পরিশেষে পুনরায় বলি, দীনেশচন্দ্র নিছক ইতিহাস প্রণয়নকারী তথ্যাশ্রয়ী গবেষণাধর্মী লেখক ছিলেন না, তাঁর রচনা সৃজনী আবেগ তথা কাব্যের সুষমায় ভরপুর ছিল। রচনার ছত্রে ছত্রে বহমান ছিল রসের প্রবাহ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-র (৯০ সংখ্যা) লেখক যথার্থই বলেছেন—"দীনেশচন্দ্র শুধু যে কীটদষ্ট পুঁথির একজন অক্লান্ত সংগ্রাহকই ছিলেন তাহা নয়, তিনি কবিত্ববোধসম্পন্ন প্রকৃত রসবেত্তাও ছিলেন। দীনেশচন্দ্রেরই ছাত্র অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের জবানীতে পাই "গুরুগৃহে বাস করে খুব কাছে থেকে তাঁর অতন্দ্র সারস্বত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু কবিজনোচিত সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি তাঁকে এই কাজে ('বৃহদ্বঙ্গ' রচনার কাজে) বেশি সহায়তা করেছিল।" [জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৭৩]

শতবার্ষিকীর বৎসরে বাংলা সাহিত্যের এই একাগ্রচিত্ত সাহিত্য-সাধকের পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমাদের প্রণতি জানিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যচিন্তা

বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী নেতা, মনীষী, ধ্যানী, দার্শনিক ও যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্ব বহুমুখী। তিনি একই সঙ্গে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও কাব্যসমালোচক। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'সাবিত্রী'। সাবিত্রীতে তিনি কাব্যাকারে তাঁর যোগদর্শনের শ্রেষ্ঠ সারাৎসার অনবদ্য ইংরেজী ভাষায় ও ছন্দে গ্রথিত করেছেন। নিরবচ্ছিন্ন উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার টানে মানুষের ক্রমাগত উর্ধ্বায়ন ও পরিণামে দিব্য সার্থকতা লাভের কাব্য সাবিত্রী। সাবিত্রী ভিন্ন শ্রীঅরবিন্দের আরও যে সব কাব্যগ্রন্থ ও খণ্ড কাব্যরচনা আছে তার মধ্যে এই কয়টি বিশিষ্ট—সঙ্গস্ টু মার্টিল্লা, লাইনস অন আয়ার্ল্যাণ্ড, ইন দি মুনলাইট, দি ঋষি (প্রথম পর্ব); দি মেডিটেশনস অব মাণ্ডব্য, দি মহাত্মাস, অহনা (মধ্য পর্ব); জীবন্মুক্ত, এ গডস লেবার, সনেটস, দি ওয়ার্লড গেম ইত্যাদি (উত্তর পর্ব)। সব কবিতাই ইংরেজী ভাষায় রচিত।

ইংরেজীর সঙ্গে আবাল্য নিবিড় পরিচয় ও যে-ইংলণ্ডীয় পরিবেশে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও প্রাক্-যৌবন অধ্যায় কেটেছে তার প্রভাব এই ভাষায় তাঁকে এমন অসামান্য অধিকার দান করেছিল যে, মাতৃভাষার মতোই তিনি ইংরেজীকে ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যরচনায়। মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে কাব্যরচনা স্ফূর্তিমন্ত হয় না, সার্থক হয় না, এই প্রচলিত ধারণা এবং ধারণাটি যথার্থও বটে। কেননা কাব্য হলো মানুষের নিগূঢ় ভাব-ভাবনা-কল্পনার প্রকাশ। সত্তার মর্মমূল থেকে ওই সব অনুভবের উৎসার। মায়ের কোলে বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-ভাষার সংস্কার মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে নিশ্বাস-বায়ুর মতো জড়িয়ে যায়, সেই ভাষা ভিন্ন

অন্য কোন ভাষায় আর যে-কিছু মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব হোক না কেন, কবিতার মতো গভীর-গূঢ় অনুভূতির শিল্পকে যে প্রকাশ করা যায় না এ বিষয়ে সব দেশের সমালোচকেরাই অল্পবিস্তর একমত। কবিতার ভাষা মাতৃস্তন্যে লালিত না হলে তার সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হয় না এটিকে কাব্যের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সত্য হিসাবে বোধহয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাব্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম। পরিবেশগত কারণে, সাধনার বলে ও প্রতিভার জাদুক্রিয়ার ফলে তাঁর জীবন এমন ধারায় গড়ে উঠেছিল যে, পূর্বোক্ত মানদণ্ড তাঁর বেলায় অন্ততঃ প্রযুক্ত হওয়ার উপায় ছিল না। মাতৃক্রোড়ে অর্জিত না হলেও ইংরেজী ভাষা তাঁর ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বাড়া ছিল। এটি তাঁর হস্তামলকবৎ ছিল। কাজেই আপাতদৃশ্য বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করলেও তিনি যে-কোন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ জাতীয় কবির মতোই তাতে সর্বোৎকৃষ্ট ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করে গেছেন। একজন সর্বোত্তম ভাষাজ্ঞানী ইংরেজের চেয়েও ইংরেজীতে তাঁর দখল ছিল বেশী। ইংরেজী সাহিত্য বা সাহিত্যের ইতিহাস মাত্রই নয়, ইংরেজী কাব্য পূর্বাপর তিনি কী নিবিড় ও অন্তরঙ্গভাবে অনুশীলন করেছিলেন তার পরিচয় বিধৃত আছে তাঁর 'ফিউচার পোয়েট্রি' নামক কাব্যসমালোচনার গ্রন্থটিতে। বস্তুত এই গ্রন্থটিকে তাঁর কাব্যচিন্তার নির্দেশক গ্রন্থ বলতে পারা যায়। এই মহামূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে কাব্য কী রূপ পরিগ্রহ করবে, তার একটি আভাস তিনি দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যচিন্তার এই একটি মস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি এই বইয়ে ইংরেজী কাব্যের বিবর্তনের ঐতিহাসিক আলোচনা করলেও কাব্যের যে-আদর্শ তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তা কিন্তু ভারতীয়তার সুবাসে আগাগোড়া মণ্ডিত। তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতের যিনি কবি হবেন তাঁকে শুধু প্রাণসমৃদ্ধ মন্ময় কবি

হলেই চলবে না, তাঁকে হতে হবে ক্রান্তদর্শী কবি, মন্ত্রদ্রষ্টা কবি, আত্মার কবি। তিনি শুধু সৌন্দর্যের উপাসক হবেন না, একই সঙ্গে তাঁকে হতে হবে শিব ও সত্যের উপাসক। ইংরেজী সাহিত্যের এলিজাবেথীয় যুগ থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক ধারার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত ইংরেজী কবিতার ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, কোন একক কবির কবিতায় কিংবা কোন এক যুগের কবিকুলের রচনাতেই উপরের ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য একত্র সমাবিষ্ট দেখা যায় না। হয় কোন কবির রচনায় প্রাণের প্রাচুর্য, কিন্তু মনীষার দৈন্য; কারও রচনায় মননশীলতার দীপ্তি কিন্তু প্রাণস্ফূর্তির অভাব, অর্থাৎ চিন্তা আছে কিন্তু কল্পনা নেই; আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর কবির রচনায় আধ্যাত্মিক ভাবভাবনার দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু মননের প্রাচুর্য অনুপস্থিত। অর্থাৎ এককভাবে কোন কবিই সমালোচক-কথিত তিনটি সর্ত পূরণ করেন না। ভবিষ্যতের কবিকে এই তিনটি সর্তকেই এককালীন পূরণ করতে হবে। ক্রান্তদর্শী কবি হতে হলে সে-কবির প্রাণন ও মননে সমৃদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে অপরোক্ষ বা দিব্য অনুভবেরও বাহক হতে হবে। সৌন্দর্য শিব ও সত্যের যুগপৎ প্রকাশেই শুধু কাব্যের চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জিত হওয়া সম্ভব।

এ কথা কাউকে বলে দিতে হবে না বোধহয় যে, শ্রীঅরবিন্দ এখানে যে-কাব্যাদর্শের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা একান্তরূপে ভারতীয় কাব্যাদর্শের অনুগত। আমাদের বেদ ও উপনিষদের স্তোত্রকার কবিদের রচনায় কিংবা আমাদের চিরায়ত কবি, ব্যাস ও বাল্মীকির কাব্যের মধ্যে আমরা এই ত্রয়ী আদর্শেরই এককালীন সমাহার দেখতে পাই। এইজন্য তাঁরা ঋষিকবি, ক্রান্তদর্শী কবি, মন্ত্রদ্রষ্টা কবি। রামায়ণ ও মহাভারতে একদিকে যেমন আছে কাহিনী, প্রকৃতিবর্ণনার সৌন্দর্য, নীতি উপদেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন সম্বন্ধে বহু তত্ত্বপূর্ণ কথা; অন্যদিকে তেমনি আছে এই নশ্বর জীবনে কেমন

করে অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করা যায় তার নির্দেশ। দুই মহাকবিই এ বিষয়ে একমত যে ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই মনুষ্য-জীবনের চরিতার্থতার সর্বোৎকৃষ্ট পথ। কাব্যের এই অপরোক্ষ সুরের জন্য ব্যাস-বাল্মীকি নিছক বর্ণনাকার কবি হয়েই থাকেন নি, তাঁদের রচনায় সত্যের দিব্যজ্যোতি ঝলসিত হয়ে উঠেছে। ভুললে চলবে না যে, যে-মহাভারতকার ব্যাসদেব সাড়ম্বরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন, তিনি একই সঙ্গে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বলে কথিত গীতারও স্রষ্টা। কাব্যের এই অপূর্ব রসায়ন সম্ভব হয়েছে কবির ক্রান্তদর্শিতার জন্যই। বেদের কোন কোন সূক্তে এবং উপনিষদের একাধিক শ্লোকে সমৃদ্ধ কাব্যকল্পনা এবং ভাবমহিমার সম্মিলিত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। সেখানেও দেখতে পাই মোহঘোর বশতঃ সত্যের যে রূপ সাধারণ মানুষের কাছে সচরাচর আবৃত থাকে তার নির্মোকবিহীন দীপ্তিময় প্রকাশ। উপনিষদের কবিরা তাঁদের কোন কোন রচনায় কবিত্বের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ বিন্দু স্পর্শ করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ক্যাব্যালোচনায় এই আদর্শেরই দিগ্‌দর্শন করেছেন। যদিও তাঁর আলোচনায় ইংরেজী কাব্যের বিশ্লেষণই প্রায় চোদ্দআনা জায়গা জুড়ে আছে, তা হলেও এটা লক্ষণীয় যে, তিনি কাব্যাদর্শের ঘোষণায় সনাতন ভারতীয় কাব্যাদর্শের জয়মাহাত্ম্যই কীর্তন করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের একান্তরূপে ভারতীয় মনোগঠনের জন্য। তিনি পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের সপ্তসিন্ধু মন্থন করলেও, ভিতরে ভিতরে তাঁর অন্তরের পক্ষপাত ছিল ভারতের আর্যধারার কাব্যের প্রতি, অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির প্রতি। রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের অন্তর্গত হলেও অন্যান্য পুরাণের মত সে দুটি অলৌকিকতার বা অসম্ভবনীয়তার কাব্য নয়, তার দুটিতেই প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণ কাব্যগুণের সঙ্গে ধ্রুব সত্যের ব্যঞ্জনা, ঋষিদৃষ্টির

অনশ্বর ভাস্বরতা। লৌকিক পুরাণগুলির এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এদিকে, কালিদাসের রচনা বা সংস্কৃত কাব্যযুগের অন্যান্য বিশিষ্ট কবির রচনা উচ্চস্তরের সৃষ্টি সন্দেহ নেই কিন্তু যে-মানদণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ শ্রেষ্ঠকবির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, সেই মানদণ্ডের পরীক্ষায় এই কবিরা সসম্মানে উত্তীর্ণ কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কালিদাসে আছে সুতীব্র নিসর্গ-চেতনা ও সৌন্দর্যের আত্মহারা প্রীতি, এককথায় রূপতন্ত্রের ধারার একজন শ্রেষ্ঠ কবি তিনি কিন্তু আর্ষধারার কবি বোধহয় তিনি নন। তাঁর কাব্যে দার্শনিকতা কম, আধ্যাত্মিকতা কম, সত্যোপলব্ধির গভীরতা কম। প্রাণ আর মনের লীলা প্রকাশ করেই তিনি থেমে গেছেন, কিন্তু প্রাণ আর মনের লীলার ওই পারে যে অপরোক্ষ অনুভবের বিস্তৃত এলাকা ছড়িয়ে আছে তার সিংহদ্বার তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের ক্লাসিকাল যুগের কালিদাস প্রমুখ রূপতান্ত্রিক কবিদের যে মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করেছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের দুই-একজন শ্রেষ্ঠ কবিকেও একই মানদণ্ডে প্রয়োগ করে তাঁদের কাব্যের শিল্পোৎকর্ষ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অসম্পূর্ণতার দিকটিও তুলে ধরেছেন। মোটকথা, শ্রীঅরবিন্দের কাব্যবিচারের মূল ভিত্তি হল আর্ষ—এই আর্ষভিত্তির বুনিয়াদ নির্মাণে কল্পনা আর মননের উপাদানই যথেষ্ট নয়, যাকে বলে প্রজ্ঞা বোধি অপরোক্ষ অনুভূতি অতি-মন সেগুলিরও একটা মস্ত বড়ো ভূমিকা আছে।

॥ ২ ॥

এইবার 'ফিউচার পোয়েট্রি' বইয়ের কয়েকটি সূত্রের আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের উপরে বর্ণিত কাব্যাদর্শের বোধ সহজতর হতে পারে। আলোচনায় কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন হবে, তবে মূল ইংরেজী ব্যবহার না করে তার তর্জমাটাই পাঠকদের উপহার দেওয়া বোধহয় সমধিক যুক্তিযুক্ত।

'কবিতার অন্তঃসার' (দি এসেন্স অব পোয়েট্রি) নামক অন্তরঙ্গ প্রারম্ভিক অধ্যায়ে যথার্থ কবিতার স্বরূপলক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার লিখছেন—"সাধারণ অকর্ষিত মনের কাছে কবিতা কল্পনা মনন ও শ্রবণের নান্দনিক উপভোগ ছাড়া আর কিছু নয়—যেন সেটা একটা উচ্চতর বিনোদন মাত্র। অন্যপক্ষে বুদ্ধিসচেতন সমালোচক কিংবা শিল্পীর কাছে কবিতার আঙ্গিকটাই বড় কথা। সকল সৎ শিল্পেই অবশ্য আঙ্গিক হল উৎকর্ষের প্রাথমিক সোপান, কিন্তু তা ভিন্ন আরও অনেক সোপান আছে। কবিকে আঙ্গিককুশল হতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে আঙ্গিকের কথা তাঁর বেমালুম ভুলে যাওয়াই বোধকরি উচিত। কারণ মনন কল্পনা কিংবা শ্রুতি (অথবা আঙ্গিক)-এর কোনটাই কাব্যানন্দের যথার্থ বাহক নয়, যেমন নয় তারা কাব্যানন্দের সত্যিকারের স্রষ্টা। এগুলি কাব্যানন্দের উপায় বা প্রকরণ মাত্র। কাব্যের সত্যিকারের স্রষ্টা হল—আত্মা।"

এই নির্ধারণ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীঅরবিন্দ আলোচনার সূত্রপাতেই মনন আর কল্পনা, এমনকি ধ্বনি আর আঙ্গিককে গৌণ স্থান দিয়ে আত্মার সৌন্দর্যকেই কবিতার প্রধান গৌরবদান করেছেন। তাঁর কাছে বুদ্ধির ঝলকানি, কল্পনাকুশলতা, ধ্বনিমাধুর্য, আঙ্গিকনৈপুণ্য অপেক্ষাও কবিতায় আধ্যাত্মিক ভূমিকার মূল্য বেশী। কবিতার পরিকল্পনায় বুদ্ধি, কল্পনা ইত্যাদির গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করছেন না কিন্তু তার চাইতেও বড়ো স্থান দিচ্ছেন আত্মার মহনীয়তাকে। অথবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায়, বুদ্ধি কল্পনা ধ্বনি আঙ্গিক প্রভৃতি সব উপকরণ মিলিয়ে কবিতায় যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দ্যোতনা সৃষ্টি করে তার গুরুত্বই শ্রীঅরবিন্দের চোখে সবচেয়ে বেশী।

এই বিশ্লেষণের আলোকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, কেন শ্রীঅরবিন্দ প্রাণ আর মনের স্তরের কাব্যকে খুব বেশী গুরুত্ব দেন নি, কেন বেদ উপনিষদের আর্ষকবিদের তিনি সর্বোচ্চ মহিমায় ভূষিত

করেছেন। কেন কালিদাস বা সমস্তরের অন্যান্য কবিকুল—রূপতান্ত্রিক তথা রোমান্টিক ঘরানার কবিরা তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুরাগ আকর্ষণ করতে পারেন নি। যে কবিতায় আত্মা ও অধ্যাত্মের ব্যঞ্জনা নেই সে কবিতা তাঁর পুরোপুরি মনোহরণ করে নি।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সর্বৈব মতৈক্য না হতে পারে কিন্তু ঋষিকবি শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারাকে বুঝতে হলে তাঁর ভূমিতে দাঁড়িয়েই তাঁকে আমাদের বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা একালীন কাব্যভোক্তারা কমবেশী সকলেই তথাকথিত আধুনিক ধ্যান-ধারণার আবহাওয়ায় লালিত. পার্থিব মূল্যবোধের জগতেই আমাদের সচরাচর বিচরণ। কাজেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের এই সুমহান্ কাব্যাদর্শের তাৎপর্য বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেও হৃদয় দিয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারব এমনটা বোধহয় আশা করা উচিত হবে না। তবু একটা চেষ্টা আমরা করতে পারি। নিজেরা আধ্যাত্মিক গুণমণ্ডিত না হয়েও তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার গতি অনুধাবন করতে পারি। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যচিন্তা সাধারণ কাব্যামোদীর কাছে দুরূহ মনে হওয়াই শুধু স্বাভাবিক নয়, কতকটা alien মনে হওয়াও স্বাভাবিক। তিনি ধ্যান ও যোগের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে সাধনার এক শীর্ষ থেকে অন্য শীর্ষে আরোহণ করেছেন তার কণামাত্র ধারণাও সাধারণের নেই। কাজেই তাঁর কাব্যসম্পর্কিত উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের পুরোপুরি মর্ম অন্তরস্থ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। জীবনে আধ্যাত্মিক গুণাবলীকে মূল্য দিতে না জানলে কবিতায়ই বা কী প্রকারে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করা সম্ভব? কাজেই কাব্য সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধির নিকষ স্বরূপ যে সব উক্তি নীচে দেব সেগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে মাঝেমাঝে আমাদের হোঁচট খাওয়া অনিবার্য। তবু এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই ঋষিকবিও তাঁর সমগ্র জীবনের তপস্যা, যোগ সাধনা, অধ্যয়ন, অনুশীলন, আত্মনিরীক্ষণ প্রভৃতি বিচিত্র

পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে উত্তুঙ্গ কাব্যদর্শনের সৌধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সাতমহলা প্রাসাদের একটি মহল হল তাঁর কাব্য-দর্শনের মহল। তাতে প্রবেশের সম্যক্ প্রস্তুতি আমাদের নেই, উপযুক্ত আধ্যাত্মিক চেতনার অভাবে তাতে প্রবেশের চাবিকাঠির সন্ধানও আমাদের জানা নেই। কাজেই ওই দুরূহ চিন্তা-সৌধের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বিমূঢ় বোধ করা আশ্চর্য নয়। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির অভাবকে আমরা শ্রদ্ধা দিয়ে পূরণের চেষ্টা করতে পারি। শ্রদ্ধার অভিসিঞ্চনে অনেক সময় জটিল জিনিসও সহজ হয়ে যায়। অন্তত আমাদের দেশের শিক্ষা তা-ই।

উৎকৃষ্ট কাব্যের মন্ত্রগুণের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "দৃষ্টিশক্তি (ভিসন) কবির এক বিশিষ্ট শক্তি। প্রাচীনদের ধারণানুসারে তাঁকেই বলা হত কবি, যিনি সত্যের দ্রষ্টা ও প্রকাশক। এটা এমন এক অন্তর্দৃষ্টি যা তিনি আমাদের মধ্যে খুলে দেন।...শ্রেষ্ঠ কবি হলেন তাঁরাই যাঁদের আছে প্রবল স্বজ্ঞা (ইনটুইশন)-জাত দৃষ্টি। দৃষ্টিশক্তি কবিত্বের একটি অপরিহার্য উপাদান।" ম্যাথু আর্নল্ড শিল্পকে বলেছিলেন "ক্রিটিসিজম অব লাইফ"। কাব্য শিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং আর্নল্ডের সংজ্ঞা কাব্যের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু ম্যাথু আর্নল্ডের এই সংজ্ঞায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন কাব্যের এর চেয়ে বিপজ্জনক বর্ণনা আর কিছু হতে পারে না। কবিত্বের শক্তি-সমালোচনায় বা মননশীলতায় নিহিত নয়, সেটি নিহিত দৃষ্টিশীলতায়, বীক্ষণক্ষমতায়। "কবিতাকে শুধুমাত্র শব্দ আর ছন্দের ঐকান্তিক গভীরতা অর্জন করলেই হবে না, তাকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির প্রগাঢ়তাও আয়ত্ত করতে হবে।"

ইংরেজী কাব্যে দুটি ধারা এসে মিশেছে—অ্যাংলো-স্যাক্সন ধারা ও কেল্টিক ধারা। অ্যাংলো-স্যাক্সন ধারা এনেছে ইংরেজী কবিতায় মননশীলতার বৈশিষ্ট্য, কেল্টিক ধারা এনেছে কল্পনা ও আবেগ-

শীলতা। ইংরেজী কবিতায় শিল্পের গুণ—তার বর্ণের দীপ্তি, আলোকের ঔজ্জ্বল্য, কল্পনার জাদু—এগুলি মূলতঃ কেল্টিক মানস-বৈশিষ্ট্যের খাত বেয়ে এসেছে। ইংরেজী কবিতায় মরমীবাদের উৎসও হল তার এই কেল্টিক বৈশিষ্ট্য। কেল্টিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি হল আয়ার্লণ্ড। দেখা যায় ইংরেজী ভাষার আইরিশ কবিদের মধ্যেই সংবেদনশীলতা ও কল্পনা-কুশলতার প্রবণতা বেশী, মরমী গুণের আধিক্য বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইয়েটস, জর্জ রাসেল ('এ. ঈ.') প্রমুখ কবির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। উইলিয়াম ব্লেক জাতিতে আইরিশ না হলেও তাঁর মধ্যে কেল্টিক বৈশিষ্ট্যসুলভ কল্পনা প্রবণতা ও মরমীবাদের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মননের বলিষ্ঠতা, চিন্তার প্রাখর্য, জীবনদর্শনের বক্রভঙ্গি এগুলি কেল্টিকধারা প্রসূত নয়, এগুলির উৎস সন্ধান করতে হবে মূলত অ্যাংলো-স্যাক্সন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে।

চসারে ইংরেজী কাব্যের সূচনা, তারপর স্পেন্সার, তারপর এলিজাবেথীয় যুগ। এলিজাবেথীয় যুগে সৃষ্টির বিস্ফার; সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইংরেজী কাব্যের প্রাণস্ফূর্তির সঙ্কোচন, পক্ষান্তরে ধ্রুপদী ভঙ্গী ও গদ্যময়তার আধিপত্য; উনিশ শতকে রোমান্টিকদের আবির্ভাবে পুনরায় এলিজাবেথীয় যুগের মতোই সৃষ্টি প্রাচুর্যের সমারোহ; ভিক্টোরীয় যুগের কবিতায় আঙ্গিকের সৌন্দর্য ও মনন-শীলতার বৃদ্ধি পক্ষান্তরে সৃষ্টিধর্মিতার অবক্ষয়; প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের কবিতায় হতাশা, ক্লান্তি ও জীবন অস্বীকৃতির ছাপ, অন্যপক্ষে একই কালে আইরিশ কবিদের রচনায় কল্পনাধর্মিতার ও মরমীবাদের প্রাধান্য—ইংরেজী কবিতার কমবেশী ছয়শো বছরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই সূত্রাকার বর্ণনায় বিধৃত। অরবিন্দ ইংরেজী কাব্যের বিবর্তনের প্রতিটি স্তর সমমনোযোগে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর আলোচনাকে একেবারে আধুনিক কালের প্রান্তসীমায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। ডি. এইচ. লরেন্স, ইয়েটস প্রমুখের কবিতার আলোচনা তো তিনি

করেছেনই, এমনকি ইংরেজী কাব্যে গভরীতির প্রবর্তক হুইটম্যান আর এডোয়ার্ড কার্পেন্টারের কবিতার সবিস্তার আলোচনা করতেও তিনি ভোলেন নি। হুইটম্যানকে তিনি এযুগের একজন শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর কবিরূপে অভিহিত করেছেন।

শেক্সপীয়ারের কাব্য প্রতিভার আলোচনা করতে গিয়ে অরবিন্দ বলেছেন, শেক্সপীয়ার হলেন নাট্যপ্রতিভাযুক্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর ছিল জীবনকে ব্যাখ্যা করবার অসাধারণ ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর স্বকীয় আলোকে জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন বলা যায়। তবে তাঁর মুখ্যত প্রাণের স্তরেই সীমিত, ঐহিকতার বন্ধনে আবদ্ধ; দ্রষ্টা কবি তিনি নন। শেক্সপীয়ারকে যাঁরা কবিশ্রেষ্ঠ বলতে চান, অরবিন্দ তাঁদের মত স্বীকার করেন না। কেন করেন না, তাঁর কাব্যচিন্তা একটু বিশ্লেষণ করলেই সে কথা বুঝতে পারা যাবে বলে মনে করি।

শেক্সপীয়ারের পরের বিশিষ্ট কবি হলেন মিল্টন, প্রায় তিন প্রজন্ম পেরিয়ে। সতেরো শতকের প্রারম্ভভাগে মিল্টনের জন্ম, শেক্সপীয়ার তার এক দশক কাল বাদে প্রয়াত। সতেরো শতকের কবিতায় আর পূর্ববর্তী যুগের কাব্যের গীতিময়তার অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় না, তার জায়গা দখল করল শব্দের জলদনিঃস্বন গাম্ভীর্য, ছন্দের মুরজমন্দ্র, ধ্রুপদী কাব্যবন্ধের উদারার ধ্বনিসমারোহ। ইংরেজী কাব্যজগৎ থেকে ধ্বনির লালিত্য আর মিষ্টত্ব সমায়িকভাবে বিদায় নিল। অবশ্য ক্ষতি পূরণ হল কবিতার ধ্রুপদাঙ্গ চালে কিন্তু সে কি আর সত্যিকার কোন ক্ষতিপূরণ? যাই হোক, অরবিন্দ মিল্টনের কবি প্রতিভাকে তার যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন এবং 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি এপিক কাব্যের এটি অন্যতম, এবং কোন কোন দিক দিয়ে বাকী চারটির তুলনায় উৎকৃষ্টতর, তবে অন্যান্য বিবেচনায় এই কাব্যের অপূর্ণতা অন্য চারটি শ্রেষ্ঠ এপিক কাব্যের তুলনায় সুপ্রকট। সবচেয়ে বড়ো অপূর্ণতা এর

আত্যন্তিক মননধর্মিতা, যেন সমস্ত কাব্যটাই আগাগোড়া লোহার চিন্তার আকারে রচিত। কবিতার সুরে প্রকাশ পেয়েছে উচ্চনাদী বক্তৃতার ভঙ্গী, কল্পনার লাস্যলীলার টুংটাং মোটে শুনতেই পাওয়া যায় না।

এর পর তিনি ইংরেজী সাহিত্যের গদ্যযুগের বিশিষ্ট দুই কবি ড্রাইডেন ও পোপের আলোচনা করেছেন। এই দুই কবির বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, বাক্যবন্ধের যুক্তিবাদী গঠন, বক্তব্যের স্পষ্টতা, দৃষ্টির তির্যক্-ভঙ্গী, ইত্যাদি দোষ বা গুণের জন্য এঁদের "ভার্সিফায়ার" অর্থাৎ কবি না বলে পদ্য রচয়িতা বলে উড়িয়ে দেবার একটা প্রবণতা কিছুকাল আগে পর্যন্তও ইংরেজ কাব্যসমালোচকদের মধ্যে বলবতী ছিল। কিন্তু অরবিন্দ এই সব কাব্যসমালোচকের মতের বিপক্ষতা করেছেন এই বলে যে, পোপ-ড্রাইডেনের কবিতায় মননের আধিক্য থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের রচনায় আছে 'ফর্ম'-এর ঔজ্জ্বল্য ও তীক্ষ্ণতা। অভীপ্সিত বক্তব্যের সুনিপুণ বুদ্ধিদীপ্ত ঋজু প্রকাশ। তাঁদের কবিতায় কল্পনার দৈন্য আছে কিন্তু সেই ক্ষতির বহুলাংশে পূরণ হয়েছে তাঁদের কাব্যছন্দের ছিমছাম আঁটোসাটো ক্লাসিকাল বাঁধুনি ও শব্দবৈভবের জন্য। (আমাদের বাংলা কাব্যের ভারতচন্দ্রকে এই দুই কবির স্বগোত্র মনে করা যেতে পারে—লেখক।) কাজেই এই দুই এযাবৎ অনাদৃত কবিকে ইংরেজী কাব্যক্ষেত্রে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনর্বাসিত করবার সবিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এর পর রোমান্টিক পর্বের কবিতা। বাইরনকে তিনি একজন স্বভাবজ শক্তিশালী কবি বলে বর্ণনা করেছেন, তবে ব্যক্তিবাদের আধিক্যে আর বিদ্রোহের উচ্ছ্বাসে তিনি তাঁর বিভিন্ন চিন্তাসূত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পারেন নি কখনও। মেজাজের খেয়াল অনুযায়ী কখনও সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি ঘৃণার প্রকাশ, কখনও [illegible] মধ্যে [illegible] প্রচার, আবার এ —

বিপরীতে স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি বলিষ্ঠ চিত্তের দৃপ্ত আনুগত্যের ঘোষণা—সব মিলিয়ে তাঁর কাব্যের মধ্যে সুরসঙ্গতির বাধা সৃষ্টি করেছিল। তবু তাঁর মধ্যে এমন একটা প্রাকৃত (এলিমেণ্টাল) শক্তি আছে, যার প্রভাব অনস্বীকার্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কবিতার প্রকৃতিবন্দনার মধ্যে সৌন্দর্যচেতনা অপেক্ষা মননের প্রাধান্য বেশী। কীটস হলেন যথার্থ সৌন্দর্যপিপাসু কবি কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ মূলতঃ নীতিবাদী প্রচারক। আর্নল্ডের সংজ্ঞা অনুযায়ী ওয়ার্ডসওয়ার্থকে একজন সার্থকনামা 'জীবন-সমালোচক' বলা যেতে পারে, তবে তাঁর সত্তার সবটাই কবিসত্তা কিনা সেটা একটা বিচার্য বিষয়। কীটস একজন অনন্যসাধারণ রূপতান্ত্রিক কবি, তবে শোচনীয় অকালমৃত্যুর দরুন তাঁর কাব্যপ্রতিভার মননশীলতার দিকটির আশানুরূপ বিকাশ হতে পারে নি। শেলীর কবিতার বিমূর্ত ও ঊর্ধ্বগামী আকাশচারী কল্পনার প্রভূত গুণগান করেছেন অরবিন্দ, তবে তাঁর বিপ্লবী ও বিদ্রোহী সত্তার দিকটির যথাযথ মূল্যায়ন বোধহয় তিনি করেন নি। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা কিছু অতৃপ্ত থেকে যায়।

ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের মধ্যে ব্রাউনিঙকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন। তাঁর গীতিকবিতাগুলির প্রধান সম্পদ তাদের নাট্যগুণ। তাছাড়া তিনি একজন মৌলিক চিন্তাবিদ্, মনস্তাত্ত্বিক, সমালোচক। সংঘাতের আবর্তে নিমজ্জিত জীবনের ফেনায়িত রূপ চিত্রিত করতে তিনি ভালোবেসেছেন। তবে তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁর নাট্যপ্রতিভার আনুপাতিক নয়।

অন্যপক্ষে টেনিসনকে তিনি একজন পরিমার্জিত পরিশীলিত, বুদ্ধি কল্পনার সমপরিমাণ কর্ষণাযুক্ত কবি বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অনুভূতির দিক দিয়ে তিনি তাদৃশ ঐশ্বর্যবান নন। সমসাময়িক কালে কবি হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু এই খ্যাতি তাঁর টিকবে কিনা সন্দেহ। তিনি জীবনে একাধিক কাহিনী-

কবিতা (যথা, ইডিলস অব দি কিং, ইউলিসিস, লোটাস-ইটার্স, মর্টে ডা আর্থার ইত্যাদি) রচনা করলেও প্রকৃত প্রতিভাবান্ কাহিনীকার কবি ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, তিনি মননশীল কবি হলেও ব্রাউনিঙের মত চিন্তাশীল কবি কোনকালেই ছিলেন না। আধেয় অপেক্ষা আধারের সৌকর্য সম্পাদনে অধিকতর মনোযোগ ক্ষেপণ করতে গিয়ে টেনিসন স্বীয় কাব্যশক্তির অপচয়ই করেছেন। সব জড়িয়ে বলতে গেলে বলা যায়, তিনি একটি বিষয়সমৃদ্ধ যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি, কিন্তু মহান্ যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি নন।

ভিক্টোরীয় যুগের আর দুইজন বিশিষ্ট কবি উইলিয়াম মরিস এবং সুইনবার্ন সম্পর্কেও অরবিন্দ বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর 'ফিউচার পোয়েট্রি' গ্রন্থে।

॥ ৩ ॥

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন ভারতীয় কাব্য, ইয়োরোপীয় ধ্রুপদী মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কাব্য, বিশেষতঃ ইংরেজী কাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন? এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের উল্লেখ তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। তবে অন্য কবিদের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ কোথাও কোথাও করেছেন—'ফিউচার পোয়েট্রি'তেও করেছেন। তার থেকে বলা যায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে একজন উচ্চস্তরের দৈবী প্রতিভাসম্পন্ন কবি বলে বরাবর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তবে তাঁকে বৈদিক যুগের আর্য কবিদের সমসারে বসাতে প্রস্তুত ছিলেন কিনা সেটা একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়েই রইল। এ বিষয়ে খানিকটা আভাস আমি আমার আলোচনার গোড়ার দিকে দিয়েছি, এখানে প্রসঙ্গটিকে আর একটু বিস্তার করা যেতে পারে।

বেদান্তে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—প্রাণের স্তর, মনের স্তর, বিজ্ঞানের স্তর এবং এই তিন স্তরের ঊর্ধ্বের 'চতুর্থ' স্তর, অর্থাৎ তুরীয় স্তর। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রাণ-মন-বিজ্ঞান এই তিন স্তরের সচেতনতার অনবদ্য শিল্পরূপ প্রকটিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যকবিতায়, কিন্তু তুরীয় লোকের দ্বারপ্রান্তে এসে তিনি থেমে গেছেন। তিনি তুরীয় লোককে দেখেছেন প্রাণ-মন-বিজ্ঞানের অনুভবের জানলা দিয়ে, কিন্তু স্বয়ং ওই লোকে প্রবেশ করেন নি। মনের বিবিধ বৈচিত্র্যের লীলা রবীন্দ্রকাব্যের অধিগম্য হয়েছিল কিন্তু অতি-মনের লীলা সম্ভবতঃ তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই, যাঁরা এ সম্বন্ধে সমধিক জানতে উৎসুক তাঁদের শ্রীঅরবিন্দের সুযোগ্য ভাবশিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের 'সাহিত্যিকা' গ্রন্থখানি নাড়াচাড়া করে দেখতে অনুরোধ করি। লোকান্তরিত অধ্যাপক কবি-সমালোচক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন'-এও এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই বিশালায়তন গ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যের উপর নূতন আলোকপাত করেছে নিঃসন্দেহে।

ভ্রমণ সাহিত্যে জলধর সেন

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে, অর্থাৎ বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে, জলধর সেন 'হিমালয়' ও 'প্রবাস-চিত্র' নামে দুখানি ভ্রমণের বই লেখেন। এর ভিতর প্রথম বইখানি হিমালয়স্থিত প্রসিদ্ধ বদরিকাশ্রম ভ্রমণের কাহিনী, আর দ্বিতীয় বইখানি গাড়োয়াল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্থানে টুকরা-টুকরা ভ্রমণ কাহিনীর সংকলন। এ দুটি বইয়ের দ্বারা জলধর সেন পাঠকমহলে সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং একজন সুলেখক রূপে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। বই দুটিতে গ্রথিত রচনাগুলি যখন 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তখন থেকেই ভ্রমণ সাহিত্যের একজন নিপুণ রচয়িতা হিসাবে জলধর সেনের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পত্রিকার পাঠকদের আগ্রহের দরুনই শেষ পর্যন্ত রচনাগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের পর জলধর সেন আরও দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং আরও অনেক বই লেখেন। তার ভিতর ভ্রমণের বই এবং গল্প-উপন্যাস দুই জাতের রচনাই আছে। তিনি পরে 'ভারতবর্ষ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন এবং দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে সম্পাদক রূপেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তবে নানাদিকে তাঁর সাহিত্য-শক্তির বিকাশ ঘটলেও, প্রধানতঃ ভ্রমণ সাহিত্যের একজন কুশলী লেখক হিসাবেই যে তিনি বাংলার সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত হন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ 'হিমালয়' বইখানাই তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয়তার কারণ।

আজ বাংলাভাষায় হিমালয় নিয়ে বহু বই রচিত হয়েছে। এক কেদার বদরী ভ্রমণের উপরই প্রায় পনেরো বিশখানা বই আছে।

তার কোন কোনটি আবার বেশ নাম করা বই। দুই একটি বই জনপ্রিয়তার দরুন সিনেমায়ও পরিগৃহীত হয়েছে। হিমালয় সম্পর্কিত রচনার এই আধিক্যের কারণে "হিমালয়-সাহিত্য" নামে একটি স্বতন্ত্র শাখার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানা থাকবার কথা নয়, এই স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত করে যান জলধর সেন। তাঁর 'হিমালয়' বইখানা এইক্ষেত্রে অগ্রপথিকের মর্যাদা দাবী করতে পারে। বিশ শতকের গোড়ায় সেই যে তিনি হিমালয়-কাহিনীর ঐতিহ্যের প্রবর্তন করে যান তার পর থেকে সেই ঐতিহ্যের রেখাচিহ্নের উপর একটানা দাগা বুলনো চলছে। অদ্যাবধি সেই প্রক্রিয়ার বিরাম হয়নি।

জলধর সেনের ভ্রমণ কাহিনী থেকেই জানা যায়, যৌবনে তিনি নানা শোকতাপ পেয়ে সংসারে বীতরাগ হয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যান। উত্তর ভারতের নানাস্থান ইতস্ততঃ পর্যটন করে শেষ অবধি তিনি দেরাদুনে গিয়ে সাময়িক স্থিতি লাভ করেন। ১২৯৭ থেকে ১২৯৯ সাল এই তিন বৎসর তিনি দেরাদুনে ছিলেন এবং সেখানে শিক্ষকতা বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। দেরাদুনে থাকতে তাঁর মনে হিমালয় ভ্রমণের বাসনা বলবতী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এক সন্ন্যাসী স্বামীজীকে সঙ্গী রূপে গ্রহণ করে সেই বাসনাকে কার্যকর করে তোলেন। সেই সময়ে হিমালয় ভ্রমণ আজকের মত এত সহজ ছিল না। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গায় যথেষ্ট কষ্ট করতে হত। কিন্তু এই নিদারুণ পথশ্রমে লেখক বিমুখ হননি। খুব যে একটা তীর্থদর্শন জনিত পুণ্যার্জনের আশায় তিনি এই পথ-পরিক্রমা করেছিলেন তা নয়, আসলে শোকের ঘায়ে তাঁর মনে সংসার সম্বন্ধে যে নিরাসক্তি দেখা দিয়েছিল, সেই নির্লিপ্ততাই তাঁকে উদাসী বিবাগী পথের পথিকে রূপান্তরিত করেছিল এবং সমস্ত পথের কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'পথিক' বইয়ের সূচনায় তিনি লিখেছেন—"আমি পথিক, ভিখারী পথিক,

সমস্ত সংসারটাই যে পথিক, যে চলে সেই পথিক। কোথাও ত কেহ বসিয়া নাই…

"…আমার পথের কথা শীঘ্র শেষ হইবার নহে। হিমালয় পর্বতের পথের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল : আমি পথ দেখিয়া ভয় পাইতাম না ; এতটা পথ চলিতে হইবে ভাবিয়া আমি কোনদিন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ি নাই। পথ যত দূরবিস্তৃত যত বন্ধুর, যত চড়াই উৎরাই পূর্ণ আমার স্ফূর্তি তত বেশী হইত। জীবনের অন্যান্য সংগ্রামে আমি পরাজিত, কিন্তু পথের সহিত সংগ্রামে ? সে সংগ্রামে আমি একসময়ে অপরাজিত ছিলাম।"

কিন্তু পথের অশেষ দুঃখবাধা সাময়িকভাবে লেখকের জীবনে যত ক্ষয় ক্ষতির মেঘই ঘনিয়ে তুলুক না কেন, বাংলা সাহিত্যে সেই মেঘ অমৃতবর্ষী হয়েছিল। ভ্রমণের এই ক্লেশকর অথচ মূল্যবান অভিজ্ঞতার ফলে আমরা একে একে লেখকের লেখনী মুখে পেলাম 'প্রবাস চিত্র' 'হিমালয়', 'পথিক', 'হিমাদ্রি', 'হিমাচল বক্ষে' প্রভৃতি হিমালয় সম্পর্কিত অনবদ্য ভ্রমণ রচনার গুচ্ছ। এই বইগুলির ভিতর বিষয় বস্তুর একটা যোগসূত্র আছে বলা যেতে পারে। ঠিক ধারাবাহিকতা নয়, তবে সমধর্মিতা। লেখক নিজের জবানীতেই বলেছেন—"সহৃদয় পাঠকগণ 'পথিক'কে 'প্রবাস চিত্র' ও 'হিমালয়ের' পরিশিষ্ট স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন।" 'পথিক' বইতে প্রধানতঃ তিহরী থেকে মুসুরী ভ্রমণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই পথে লেখক গঙ্গোত্রীতে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 'হিমাদ্রি' বইটি 'হিমালয়'-এরই একটি কিশোর পাঠ্য সংস্করণ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন—"'হিমাদ্রি' নূতন পুস্তক নহে ; ইহা আমার প্রণীত 'হিমালয়ের' সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আমার 'হিমালয়' যে ভাষায় লিখিত এবং তাহার মধ্যে হিমালয়ের যে সমস্ত কথা আছে তাহা বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী নহে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই বিশেষ অনুরোধে

'হিমালয়ের' ভাষার পরিবর্তন ও অনেক স্থান পরিবর্জন করিয়া 'হিমাদ্রি' লিখিয়াছি।"

জলধর সেনের ভ্রমণ-সাহিত্য যে শুধু হিমালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, পরে তিনি ভারতের আরও নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এবং সেই সব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যথা, 'দশদিন', 'দক্ষিণাপথ', 'মধ্যভারত' ও 'মুসাফির মঞ্জিল'। জলধর সেন একটি ভ্রমণের বই অনুবাদও করেন। বইটি হল, বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের 'Impressions' নামক ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত। আমার ইউরোপ ভ্রমণ নামে অনুবাদটি প্রথমে 'ভারতবর্ষ' মাসিকে ধারাবাহিক ভাবে এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

জলধর সেন লেখকরূপে পাঠকচিত্তে সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তার কারণ, তিনি জাত লিখিয়ে ছিলেন। তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা ও সরলতা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখকের রচনাভঙ্গী অতিশয় প্রসাদগুণ সম্পন্ন, তার উপর জায়গায় জায়গায় কৌতুকরস সঞ্চিত হওয়ার ফলে তা আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের মানবপ্রীতি ও সহানুভূতিও রচনার দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রচনার এই সমস্ত সদ্‌গুণ লেখকের 'হিমালয়' বইতেই সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট। আমি এখন এ বইটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সবিস্তারে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

'হিমালয়' বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শনোদ্দেশ্যে হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী। লেখক দেরাদুন থেকে যাত্রা করে হৃষীকেশের পথে বদরি অভিমুখে অগ্রসর হন। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামীজিকে তিনি তাঁর সহযাত্রীরূপে পান। স্বামীজি সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু হৃদয়টি তাঁর স্নেহ মমতায় ভরা। লেখকের প্রতি স্বামীজির অপরিমেয় স্নেহ ও শুভেচ্ছার বিচিত্র গল্প বইটিতে ছড়িয়ে আছে। পথে এক বৈদান্তিক সাধু তাঁদের সঙ্গে সহযাত্রীরূপে মিলিত হন। এ সাধুর প্রকৃতি কিছু

ভিন্ন। এ সংসারকে তিনি মায়া প্রপঞ্চময় বলে মনে করেন, সুতরাং মায়া মমতার বিশেষ ধার ধারেন না। লেখক অতি সরস কৌতুকের সঙ্গে দুই সাধুর চরিত্রগত পার্থক্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাঁর পক্ষপাত যে হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন প্রথমোক্ত সন্ন্যাসীর দিকেই সে কথাটাও তিনি পাকে প্রকারে বুঝিয়ে দিতে বাকী রাখেন নি। হিমালয় ভ্রমণ কাহিনীর ছত্রে ছত্রে লেখকের হৃদয়ের কোমলতা, মানব-প্রেম, বাঙ্গালী-প্রীতি, সংসার-আসক্তি, প্রকৃতি-প্রেম ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণের পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে। সাময়িক শোকতাপের আতিশয্যবশতঃ লেখক বৈরাগীর বেশ ধারণ করলেও মনটি তাঁর সুখ-দুঃখময় সংসারের প্রান্তসীমায় সংলগ্ন হয়ে আছে, সেটি রচনার ধারা অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায় এবং এটিও সেই সঙ্গে বোঝা যায়, সে পরিচয় গোপন করবার জন্যে লেখকের তরফে তেমন আগ্রহ বা চেষ্টাও নেই। লেখকের শিল্পী-মন আলোচনার ধারায় বারে বারেই অভিব্যক্ত হয়েছে। বদরিকাশ্রম যাত্রায় পুণ্যার্জন অপেক্ষা শিল্পী ও ভাবুক মনের খোরাক জোটানোটাই যে লেখকের অধিক কাম্য ছিল, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দু একটি উদ্ধৃতি দিলেই একথা স্পষ্ট হবে।

"বরফের এই অভিনব রাজ্যে এসে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি; সঙ্গে সঙ্গে, আমার অতীত জীবনের দুই একটি কথা মনে পড়ছিল। শৈশবের সেই কোমল হৃদয়, সরল হৃদয়, অকপট বন্ধুত্ব এবং সকলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা; সে কেমন সুন্দর, কেমন মোহময় ছিল! তখন আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি আমাদের পৃথিবী ছিল, তার প্রত্যেক বৃক্ষপত্র উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ভারাবনত শস্যশীর্ষ এবং দূর প্রবাহিত বায়ু তরঙ্গের অবিশ্রান্ত গতি যেন কতই স্নেহ ঢেলে দিত। ক্রমে বড় হয়ে বিদেশে কলকাতায় পড়তে গেলুম, পবিত্রচেতা মধুর-হৃদয় কত সঙ্গী লাভ হলো; এবং একখানি প্রেমপূর্ণ, নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ হৃদয় আমার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের সুখ-দুঃখ মিশিয়ে নিলে। নয়ন সমক্ষে পৃথিবীর নূতন শোভা দেখতে

পেলুম, এবং তার অভিনব মাধুর্য্য হৃদয় পূর্ণ করে দিলে। তখন হৃদয়ে কত বল, মনে কত সাহস, প্রাণে কত বিশ্বাস!...আজ এ অভিনব প্রদেশে, স্বর্গের শূন্য সোপানতলে পদার্পণ করে আমার সুখময় শৈশব ও যৌবনের মধুর স্মৃতি দুদণ্ডের জন্য মনে পড়ে গেল। আমার চির নির্বাসিত অশান্ত হৃদয় সেই কুসুমকুঞ্জ বেষ্টিত শান্তিময় আলয়ের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলো: অন্যের অলক্ষিতে দু'বিন্দু অশ্রু মুছে গাছপালা বর্জিত দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তুষারাবৃত অলকানন্দার ধারে ধারে চলতে লাগলাম।"

("বদরিকাশ্রমে", 'হিমালয়')

আবার হাস্যরসেরও অসদ্ভাব নেই। ওই বদরিকাশ্রমে অধ্যায়েরই আর একটি অংশ এইরূপ:—

"কিন্তু পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন পদ্য মেলা দুরূহ। তুমি সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরে তোমার গৃহপ্রান্তস্থ ফুলবনে ব'সে বনাকাশের দিকে চেয়ে যে চন্দ্রের স্নিগ্ধ শ্বেত হাসি দেখছ, আর তোমার হৃদয়ে শত মধুর কল্পনার পুলক উঠছে, এমন সময় হয়ত তোমার উদরের নীচে ক্ষুধাবৃত্তি তোমাকে খেতে ডেকে বল্লে, 'সেই ন'টার সময় চাট্টি নাকে-মুখে গুঁজে অফিসে যাওয়া হয়েছিল, এখন আর একবার উদর-দেবতাকে সন্তুষ্ট কল্লে হয় না?' এবং হয়ত তোমার গৃহিণী হাস্যমুখে এসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'চাঁদের আলোতে আর পেট ভরে না, এখন রাত্রে কি খাবে তাই বল, ভাত না রুটি?'—অমনি সোনার চাঁদ, বসন্তের বাতাস, ফুলের গন্ধ দূর হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই রমণীয় স্থানে যখন প্রতি মুহূর্ত্তে করুণারূপিণী সরল-হৃদয়া দেববালাগণের আগমন প্রত্যাশা করছি! সেই সময় দেখলুম, মোটা ভুঁড়ি-বের-করা টিকিওয়ালা পাণ্ডার দল দ্রুতপদে এসে আমাদের আক্রমণ কল্লে।"

হিমালয়ের তীর্থ-ভ্রমণের ধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, প্রতিদিন কিছু কিছু করে পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে হয় এবং

মাঝে মাঝে পথে যে চটী বা ধর্মশালা আছে তাতে আশ্রয় নিয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে হয়। এইভাবে পথ চলে সমতল থেকে বদরিকাশ্রম বা কেদারনাথ পৌঁছুতে দিন পঁচিশেক লাগে। অন্ততঃ আগে তাই লাগত, এখন পথের সুসহতার জন্যে আরও কম সময়েই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। হিমালয় বইতে কতকটা ডায়েরীর ধরনে এই পথভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। পথচলার অভিজ্ঞতা ও চটিগুলির ভৌগোলিক সংস্থান ও আশপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ বেশ সবিস্তারেই এই বইয়ের পাতায় উপস্থাপিত হয়েছে। কিছু ডায়েরি ধর্মী হলেও আগাগোড়া বইটি এত সরস ভঙ্গীতে লেখা যে পড়তে কোথাও উৎসাহ এতটুকু মন্দীভূত হয় না। লেখকের গল্প বলবার সহজাত ক্ষমতা ও ভাষার চারুতা বইটির এই আকর্ষণের মূলে রয়েছে। মোট কথা, জলধর সেনের হিমালয় একখানি লিপিকৌশল-যুক্ত ও সুখপাঠ্য উপাদেয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের বই। অনেকদিন আগের লেখা হলেও আজও এই বই পড়ে যথেষ্ট তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক তথ্যের সংমিশ্রণে ভ্রমণ কাহিনীকে আকর্ষণযোগ্য করে তোলার ক্ষমতাও লেখকের যথেষ্ট আছে। যাঁরা 'পথিক' বইয়ের অন্তর্গত 'কলুঙ্গার যুদ্ধ' রচনাটি পড়বেন তাঁরাই আমার এ কথায় সায় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে তাঁর প্রতি জন্মশতবার্ষিকীতে প্রদেয় শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অবশ্যই আমরা তাঁকে স্মরণ করব, কিন্তু বিশেষ ভাবে স্মরণ করব তাঁর প্রতি আমাদের অপরিশোধ্য ঋণগুলির খতিয়ান করবার জন্যে। তাঁর কাছ থেকে আমরা নানা দিক দিয়ে যা পেয়েছি তার হিসাব মিলোতে বসলেই এই মানুষটির কাছে জাতি হিসাবে আমরা যে কি গভীর ঋণে ঋণী তার বোধ জাগ্রত হবে আর ওই চেতনার জাগরণই তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা-তর্পণ। সুতরাং এক এক করে ওই ঋণগুলির পরিমাপ করা যাক।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নামটি বাংলা দেশে একটা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। আমি যখনই তাঁর বিষয়ে চিন্তা করি তখনই তাঁর ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা তথা অনন্যপরতন্ত্রতার কথা স্মরণ করে আমার মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ত নিশ্চয়ই বিস্ময়েও সবিশেষ অবনত হয়ে পড়ে। তিনি প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, হিন্দী বিশাল ভারত পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন, এই কথা বললে তাঁর সম্বন্ধে সামান্যই বলা হয়। ঐ পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি চিন্তার ও রুচির যে বিশেষ স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তাঁর অসামান্য পরিচয়। মাসিকপত্র সম্পাদনা প্রায়শঃ একটি মামুলি কর্তব্য বিশেষ। তার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের এবং প্রসঙ্গক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা কথার সমাবেশ থাকলেও ওর ভিতর দিয়ে মাসিকপত্র সম্পাদককে খুব কম ক্ষেত্রেই ধরতে-ছুঁতে পারা যায়। তিনি যেন পাঠকের প্রীত্যর্থে নানা রকমারি উপকরণ এক আধারে সংগ্রহ ও উপস্থিত করেই

খালাস ; তাঁর ব্যক্তিত্বের আদলটি পাঠকের অনুভবের সীমার মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মাসিকপত্র সম্পাদকই হলেন আসলে সংগ্রাহক এবং যা আরও সমালোচনাযোগ্য বিষয়, পরিকল্পনাবিহীন সংগ্রাহক। পরিবেশিত বিষয়সমূহকে পরিব্যাপ্ত করে ও তাদের ছাড়িয়ে সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে এরকম দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

ঐ বিরল সংখ্যক সম্পাদকদের মধ্যে বিরলতম উদাহরণ হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাময়িকপত্র সম্পাদনা তাঁর নিকট নিছক সৌখীন কর্তব্যপালন ছিল না, ছিল না নিছক ব্যবসায়িক উদ্যোগ ; পরন্তু মাসিকপত্র সম্পাদনাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জাতিগঠনের এক শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে। জাতিগঠন শুধু জাতির মানুষগুলিকে রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিকত্বের বিষয়ে সচেতন করা অর্থে নয়, তাদের রুচিকে পরিশীলিত, সৌন্দর্যানুভূতিকে তীক্ষ্ণতর ও আনন্দ গ্রহণ ক্ষমতাকে সংবর্ধিত করা অর্থেও। বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়কে তিনি যেমন একদিকে চিন্তার নব নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি তাদের কল্পনা বৃত্তিকেও উচ্চকিত করেছেন গভীর ভাবে। আমার নিকট আলোচ্য মহাপুরুষের এই শেষোক্ত কৃতিত্বটাই সর্বাধিক বলে মনে হয়। এই দিক দিয়ে বাঙালী জাতি যে তাঁর কাছে কি অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ তার পরিমাপ করা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধের যথাস্থানে আরও বলবার অবকাশ হবে, আপাতত এই শুধু বলি যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মামুলি অর্থে মাসিকপত্র সম্পাদক ছিলেন না, মাসিকপত্র সম্পাদনার ছলে তিনি ছিলেন বাঙালী জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঞ্চালক, জননেতা, অভিভাবক। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ তিনি বাঙালী জাতির রুচি নির্মাণ করে গেছেন, জীবনের চলার পথে তাকে অভ্রান্ত পথনির্দেশ করে গেছেন। বাঙালীর মননশীলতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা দুইই তাঁর হাতে

তীক্ষ্ণতর হয়েছে। তাঁর কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় এই মানুষটির অন্তর ছিল কি বিশাল, উদার ও অমেয় জাতিপ্রেমে ভরা। মামুলি প্রশস্তি উচ্চারণের উদ্দেশ্য নিয়ে এ সব কথা বলছি না, বলছি শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বকে তার স্ব-স্বরূপে অনুধাবন করবার জন্যে, যাতে তাঁকে বোঝা ও বোঝানো সহজ হয়, তাঁর নিকট আমাদের ঋণের পারমাণটি সুনিরূপিত হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ছিলেন শিক্ষাবিদ্। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপাল। ইংরেজীতে সসম্মানে এম. এ. পাশ করে তিনি শিক্ষা-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-জীবনের পরিবেশ তাঁর প্রতিভাকে স্বীয় চতুঃসীমায় বেশী-দিন আবদ্ধ রাখতে পারে নি, তিনি শীঘ্রই শিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে সাময়িকপত্র সম্পাদনার অভিমুখে ঝুঁকলেন। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ সম্পাদনা করবার আগে তিনি পর পর এই কয়টি সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন—ধর্মবন্ধু, কায়স্থ সমাচার, দাসী ও প্রদীপ। অবশ্য এর মধ্যে কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, কিন্তু এগুলি যে তাঁর পরবর্তী জীবনের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল তা তাঁর উত্তরকালীন কৃতির আলোকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। এবং এর থেকে আরও যে কথাটি আমাদের মনে জাগে তা হচ্ছে এই যে, তিনি নেহাৎ ঝোঁকের বশে শিক্ষাবৃত্তি পরিহার করে সাময়িকপত্র সম্পাদনার গণ্ডির মধ্যে পা বাড়ান নি; তাঁর এই নূতন পদক্ষেপের পশ্চাতে পরিকল্পনা ছিল, চিন্তন-মনন ছিল, ছিল সংকল্পের দৃঢ়তা। তিনি একটি বিশেষ লক্ষ্য চোখের সামনে রেখেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে এই কাজে নেমেছিলেন—হুট করে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন নি।

আমার নিকট আচার্য রামানন্দের এই পদক্ষেপের গুরুত্বের চমক আজও নিঃশেষিত হয় নি। আমি নিবন্ধের গোড়ার দিকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে মৌলিক ও অনন্যপরতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছি—কেন করেছি নীচেকার পর্যালোচনায় তার ব্যাখ্যা মিলতে পারে। যে কালে

রামানন্দ অধ্যাপনার জীবিকা পরিত্যাগ করে মাসিকপত্র পরিচালনার জগতে প্রবেশ করেন সেই সময়ে মাসিকপত্র পরিচালনা কোন দিক দিয়েই আকর্ষণীয় ছিল না—না অর্থকরী দিক থেকে, না সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা তখন লোকের নিকট একটা সৌখীন ব্যাপার বলে গণ্য হত এবং যাঁরা এ জাতীয় কাজে নামতেন তাঁরা প্রায়শঃ সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত বলে লোকসমাজে গণ্য হতেন। এসব ব্যাপার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোরই সামিল ছিল, অর্থমর্যাদা দিয়ে যাঁরা কাজের মর্যাদা অমর্যাদার বিচার করেন—সে রকম লোকের সংখ্যাই সমাজে বেশী—তাঁরা সাময়িকপত্র সম্পাদনা জাতীয় কাজকে বিশেষ কোন গুরুত্বই দিতেন না বলতে গেলে। তা ছাড়া জীবিকা হিসাবে এ কাজ নিতান্তই অনিশ্চিত ছিল, যাঁরা এ কাজে নামতেন তাঁরা জেনেশুনেই আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে প্রবৃত্ত হতেন। পক্ষান্তরে, রামানন্দ যে-কর্মত্যাগ করে এসেছিলেন তা তখনকার মানদণ্ডে সবিশেষ লোভনীয় একটি জীবিকা। তিনি কোন কলেজের অধ্যাপকমাত্র ছিলেন না, ছিলেন সেই কলেজের অধ্যক্ষতার সর্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন। একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির উপযুক্ত প্রার্থিত কর্ম। সেই বহুবাঞ্ছিত পদ ছেড়ে কি না তিনি নেমে এলেন সাময়িকপত্রের দপ্তরের সম্পাদকপদের নড়বড়ে আসনে সমাসীন হবার জন্যে! ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের নির্বাচন আর কাকে বলে! নিশ্চিন্ত জীবিকার নিরাপত্তা বর্জন করে উদ্বেগশঙ্কাকুল অনিশ্চিত ভাগ্যবরণ! কিন্তু এ কাজ বৈষয়িক বিচারে যতই পরিণামবুদ্ধিহীন বলে প্রতিভাত হোক, ঐ কাজের মধ্য দিয়েই মানুষটি কোন্ ধাতুতে গড়া ছিলেন তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় এবং এক বিশিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মুখে উদ্যত রেখেই যে তিনি অনিশ্চিতের অভিমুখে লম্ফ প্রদান করেছিলেন সেটাও বোঝা যায়। শিক্ষার প্রচলিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমের সাহায্যে যেমন জাতির উঠতি সন্তানদের মানুষ করা যায়, তেমনি এ তত্ত্ব তিনি

সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন, অন্য মাধ্যমের সাহায্যেও তা করা যায়, বরং আরও ব্যাপক ভাবেই করা যায়, কেননা উঠতি সন্তানদের ছাড়াও বহু মানুষকে ঐ কর্মান্তরের বেড়ের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। সাময়িক পত্র-পত্রিকার পরিবেশিত বস্তু শুধু শিক্ষার্থীদেরই প্রয়োজন পূরণ করে না, তা আরও বহু, বহু মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণের কাজে লাগে। বস্তুতঃ একটা গোটা জাতির মানুষের মনঃপ্রকর্ষ বিধানের ও তাদের কাল্পনিকতার জাগরণের কাজে ঐ মাধ্যম প্রযুক্ত হতে পারে, যদি পত্রিকার কর্ণধার হন উপযুক্ত ব্যক্তি ও পত্রিকার প্রচার হয় আশানুরূপ। একটি সুপ্রচারিত পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকসাধারণের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ পত্রিকা যে সারা দেশে একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে একটা সুসঙ্গত পরিবেশ, তা আশা করি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুসম্পাদিত ও সুপরিচিত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে সেই বাঞ্ছিত কাজটিই করেছিলেন দীর্ঘকাল যাবৎ। শিক্ষার ধারাকে তিনি ক্লাশরুমের ভিতর থেকে টেনে এনে সাময়িকপত্রের পাতায় চালিয়ে দিয়েছিলেন। আর এ শিক্ষা ত শুধু মনন আর বিদ্যার্জনের শিক্ষাই নয়, তা রুচিরও পরিশীলনের শিক্ষা, সৌন্দর্যস্পৃহার জাগরণের শিক্ষা। প্রবাসী পত্রিকা পড়ে আমরা ছাত্রবয়সে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি, বিচিত্র সাহিত্য পাঠের আনন্দ আমাদের মনে সঞ্জাত হয়েছে; প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, বিশেষ করে প্রবাসী ছিল আমাদের নিকট বহির্বিশ্বের দিকে দু-চোখ ভরে তাকাবার উন্মুক্ত জানালা স্বরূপ। এ সব ঋণ ত আছেই, কিন্তু সে সব ঋণকেও ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে আর দু'টি ঋণ একান্ত এবং অপরিশোধ্য: এক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে সাময়িকপত্রের মাধ্যমে পরিচয়; দুই, ভারত-চিত্রশিল্পের ধারার শিল্পীদের ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার সুযোগ লাভ; এক

কথায়, সৌন্দর্য-বোধকে চরিতার্থ করবার সৌভাগ্য প্রাপ্তি।

এই দু'টি ঋণের কথাই একটু সবিস্তারে বলার জন্যে পাঠকদের অনুমতি ভিক্ষা করছি।

২

এককালে সাধনা, ভারতী ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর পৃষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত রচনাসম্ভারে পরিশোভিত হয়ে প্রকাশিত হত বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক মাত্রই সে খবর জানেন। সে হচ্ছে নব নব সৃষ্টিসম্ভাবনার বেগ ও প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশের যুগ, তাঁর শক্তিসূর্য তখনও মধ্য গগন অতিক্রম করে নি। আমরা সে যুগকে পাই নি, আমরা যে কালে স্কুলের উপরের পৈঠার ছাত্র অথবা স্কুলের দেউড়ি পেরিয়ে কলেজের চৌহদ্দিতে পা বাড়াবার মুখে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত সুপরিণত বিশ্ববন্দিত জগৎ-সভার কবি। তাঁকে আর তখন অন্য দশজন কবির সঙ্গে মিলিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পাচ্ছি না; পাচ্ছি ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যমণি হিসাবে, জাতীয় গৌরববোধের সঙ্গে মিলিয়ে, তাঁর ব্যক্তিত্বের চারপাশে প্রতিভার পুণ্যপ্রভাময় জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে। বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থূল রূপে তাঁকে পেয়ে ও তাঁকে পূজা করে আমরা তখন ধন্য। সেই মহাদ্যুতিমান রবীন্দ্রনাথের অমূল্য রচনাসম্ভার প্রতি মাসে মাসে ধরে দিচ্ছেন রামানন্দ তাঁর সুপরিচিত প্রবাসীর পৃষ্ঠায়—এ এক অপূর্ব সংঘটন। তার স্বাদের উন্মাদনার আভাসই বুঝি শুধু দেওয়া যায়, তার সঠিক বর্ণনা করা চলে না। কোন মহাকবিকে গ্রন্থবদ্ধ ভাবে পাওয়া এক, আর তাঁকে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় খণ্ড খণ্ড ভাবে পাওয়া আর। তার একটা আলাদা বৈচিত্র্য আছে। এ বৈচিত্র্যের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ আমরা দীর্ঘকাল অনুভব করতে সমর্থ হয়েছিলাম প্রবাসীর কল্যাণে। মনে আছে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চিত্রশোভিত হয়ে প্রবাসীর পাতায় যখন 'শেষের কবিতা' ধারাবাহিক

ভাবে প্রকাশিত হতে থাকল তখন অনেক মাস যাবৎ একটা অপূর্ব ঘোরের মধ্যে কেটেছে। আর কবিতার ত সে এক সারিবদ্ধ সমারোহ। প্রবন্ধ-নিবন্ধ জাতীয় অন্যবিধ রচনারও কোন অপ্রতুল নেই। এ সবই সম্ভব হয়েছিল আচার্য রামানন্দের অসাধারণ ব্যবস্থাপনাগুণে। তিনি স্বয়ং মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাই মহৎকে বৃহৎকে আকর্ষণ করবার তাঁর একটা সহজাত নৈপুণ্য ছিল। প্রবাসীর গণতান্ত্রিক আসরে তিনি বিশ্বকবির প্রায়-নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা করেছিলেন, এ তাঁর এক মহতী কীর্তি নিঃসন্দেহে।

আর ভারতীয় চিত্রকলার সমৃদ্ধ ফসলের সে কি নয়নবিমোহন ডালি সাজিয়েছিলেন তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর বর্ণিল পৃষ্ঠায়। শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেশ্বর সেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সারদা উকিল, বরদা উকিল, সুনয়নী দেবী, মণীন্দ্র গুপ্ত, সুধীর খাস্তগীর প্রমুখ ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অর্ধ-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কত বিভিন্ন প্রতিভাবান গুণীর ছবিরই না প্রিন্ট মুদ্রিত হয়েছে এই দুটি পত্রিকার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সময়ে। হ্যাভেল-অনুপ্রাণিত ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন অনেক বিশিষ্ট চিত্রীর ছবিও যুগপৎ পরিবেশিত হয়েছে একই কালে। এই শেষোক্ত গুণীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজা রবিবর্মা ও মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর। এ ছাড়া নূতন-পুরাতন খ্যাতনামা বিদেশী চিত্রকরদের অঙ্কিত কত ছবি যে ছাপা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

একটি পত্রিকা-গোষ্ঠির মাধ্যমে এত এত বিশিষ্ট চিত্রসম্ভার নিয়মিত পরিবেশিত হওয়ার একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। সে তাৎপর্য চোখের

শিক্ষার, স্রষ্টার অন্তরে সৌন্দর্যপ্রাণতার ক্রমিক উন্মোচনের। ফলতঃ প্রবাসীর চিত্র-পরিবেশনার মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষাই হয়েছিল কম বা বেশী পরিমাণে পাত্রভেদে। আজ অবশ্য সকল ছবির নাম স্মরণ করতে পারব না, তাদের অনেকগুলিরই রূপরেখা স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সব জড়িয়ে সেই সব ছবি মনের ভিতর যে গভীর সম্মোহনের সৃষ্টি করেছিল তার স্মৃতি ত ভুলতে পারি না। অবনীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও সুজাতা, সাজাহানের স্বপ্ন, তিষ্যরক্ষিতা, তেপান্তরের মাঠের রাজপুত্র (সঠিক নাম স্মরণ নেই); গগনেন্দ্রনাথের বিচিত্র বিষয়ক আলো-আঁধারি চিত্রাবলী ও কিউবিজমের পদ্ধতিতে আঁকা অনবদ্য শিল্পরূপায়ণ, ক্ষিতীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব চিত্রাবলী, নন্দলালের ও সুরেন গাঙ্গুলীর পৌরাণিক চিত্রসম্ভার, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অশোক ও কুণাল, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর কাদম্বরী সিরিজ—বর্ণ ও রেখার সে এক অনবদ্য ও বিচিত্র দৃশ্যসজ্জা। আমি চিত্রবিশেষজ্ঞ নই, চিত্রশিল্পের নিয়মকানুন সামান্যই জানি, তবু চিত্রপ্রেমী বলে দাবি করি। আর এই চিত্রপ্রেম প্রবাসীর দৌলতেই মনের ভিতর প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল, রামানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর উপলক্ষ্যে সে কথা ঋণভারগ্রস্ত চিত্তে সকৃতজ্ঞে স্মরণ করি।

প্রবাসীতে যে সময়ে পরের পর এই সকল ছবি প্রকাশিত হচ্ছিল তখন ব্লক নির্মাণ বা চিত্রমুদ্রণের আদৌ সুব্যবস্থা ছিল না। চিত্র মুদ্রায়ণের সেটি ছিল শৈশব-কাল, যখন কাঠের ব্লকই ছিল ছবির ছাপ নেবার মুখ্য নির্ভর। উপযুক্ত প্রক্রিয়ার অভাবে বর্ণিল ছবির প্রার্থিত মুদ্রণ করা যেত না, যা পরে হাফটোন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। ইউ. রায় এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রথম এ দেশে হাফটোন পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রমুদ্রণ-ধারার প্রবর্তন করেন। রামানন্দ এ ব্যাপারে তাঁকে প্রভূত উৎসাহ দান করেন। বছর দুয়েক আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবাসীর পরবর্তী সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সংস্কৃতি পরিষদ নামক এক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে উপেন্দ্রকিশোরের বিবিধ কর্মকৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ব্লক নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোরের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবিশেষ উল্লেখ করেন। ওই আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ তথ্য পরিজ্ঞাত হই যে, এ কাজে সাফল্যলাভের মূলে রামানন্দের পরোক্ষ অবদানও বড় কম ছিল না। কাগজের উপর বর্ণিল ছবি পরিস্ফুটনের সেই প্রাথমিক যুগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যে কত দুস্তর বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুতে ঐ ছবিগুলি পরিবেশন করতে হত আজকের অবলীলায়িত সহজ মুদ্রণের যুগে তা হয়ত অবিশ্বাস্য কাহিনী বলে মনে হবে। কিন্তু তিনি কোন বাধাতেই দমেন নি, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাঁর পত্রিকায় ছবি ছাপিয়ে গেছেন। এ কাজের পিছনে তাঁর একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল—বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের চোখের সামনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব নূতন রূপের জগৎ উন্মোচিত করা আর ঐ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সৌন্দর্যচেতনাকে আরও শাণিত করা। হ্যাভেল, কুমারস্বামী ও অবনীন্দ্রনাথের পন্থানুসরণে ভারতীয় তথা প্রাচ্য কলারীতির ঐতিহ্যের সুসমৃদ্ধি প্রমাণ করা। ঐ প্রমাণের সূত্রে জাতির আত্মমর্যাদাবোধ পুনর্জাগরিত করা অবশ্যই তাঁর অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নেই, তবে আমার মনে হয় এর চেয়েও মহত্তর উদ্দেশ্য তাঁকে তাঁর ঐ শিল্পপরিবেশনায় প্রবুদ্ধ করেছে এবং তাঁর সংকল্পের মধ্যে বেগ, দৃঢ়তা ও প্রণালীবদ্ধতার সঞ্চার করেছে। সেই মহত্তর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—জাতিগতভাবে বাঙালীর সৌন্দর্যের সংস্কারের অধিকতর পরিশীলন ও পরিমার্জন। সৌন্দর্যের দীক্ষায় কোন জাতির উপনায়ন সম্পূর্ণ হলে সে জাতির আর মার নেই, এটা রামানন্দ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই তিনি শিল্পপরিবেশনায় এতদূর ঝুঁকি নেবার দায় স্বীকার করতে

পেরেছিলেন।

এ কথা যে সত্য তা আরও একটি ব্যাপার থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি শিল্পালোচনার ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুর পৃষ্ঠায়। প্রসিদ্ধ শিল্প-বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শিল্পসম্পর্কিত রচনা লিখিয়ে সেগুলি মোটামুটি নিয়মিত ভাবে ঐ দুটি পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রচার তাঁর সম্পাদকীয় কৃত্যের অন্যতর বৈশিষ্ট্য ছিল। সিসটার নিবেদিতা, কুমারস্বামী, এইচ. এস. কাজিনস্, পার্সি ব্রাউন, স্টেলা ক্রামরিশ, ও. সি. গাঙ্গুলি প্রমুখের একাধিক শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে ঐ পত্রিকাদ্বয়ের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করেছে এবং তদ্দ্বারা পাঠকের শিল্পবোধকে তীক্ষ্ণতর করেছে। এ ঐতিহ্য শুধু মডার্ণ রিভিয়্যু আর প্রবাসীরই নয়, তারও আগে থেকে এ বিষয়ে সচেতন প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন রামানন্দ। তাঁর পূর্বতন সম্পাদিত প্রদীপ পত্রিকায় বিশিষ্ট রবীন্দ্রকাব্যরসিক প্রিয়নাথ সেনের প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিল্পসমালোচক রাস্কিনের উপর লিখিত প্রবন্ধাবলীর কথা মনে পড়ছে। অসাধারণ সেই প্রবন্ধ-নিচয়—আজকালকার পত্র-পত্রিকায় এ জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না, এ আমাদের এক দুর্ভাগ্য।

॥ ৩ ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত আচার্য রামানন্দের সম্পাদনার দিকটির কথাই বেশী বলা হয়েছে। এবারে তাঁর লেখক-ভূমিকার কথা বলব, যে ভূমিকায় তিনি একাধারে চিন্তাশীল মনীষী, সাংবাদিক, জাতীয় নেতা ও জাতির পিতৃকল্প অভিভাবক। তিনি ছিলেন মূলতঃ যুক্তিবাদী এবং স্বীয় মতামত প্রকাশে নির্ভীক। অনুগ্রহ-নিগ্রহের অপেক্ষাবিহীন তাঁর অভিমত সর্বদাই একটি মাত্র মানদণ্ডকে মান্য করত, তা হল সত্য। সত্য বলে তিনি যা বুঝতেন তার প্রকাশে তাঁর লেখনী অকুণ্ঠ ও অকম্পিত ছিল। আর তাঁর এই মতস্বাতন্ত্র্য আর বলিষ্ঠতার জন্যই বিচিত্র বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যের আকর 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

পাঠকসমাজ কর্তৃক এতদূর ব্যাপক ভাবে অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হতে পেরেছিল। খতিয়ে দেখতে গেলে, বোধ করি তাঁর জীবদ্দশায় প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ছিল সাময়িক পত্রের সবচেয়ে বহুলপঠিত বিভাগ। এর কারণ তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য, সত্যভাষণের স্পষ্টতা, তথ্যভিত্তিকতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা। এ সব কয়টি বৈশিষ্ট্যেরই পিছনে ছিল গভীর, নানামুখী, সুবিস্তৃত অধ্যয়নের পটভূমি। সমসাময়িক কালের রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য, হিন্দু সমাজের গড়ন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি অকুণ্ঠ ভাবে তাঁর মতামত প্রচার করেছেন এবং সকল বিষয়ে সত্যসন্ধতাই ছিল তাঁর বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। সম্পাদক এবং লেখক হিসাবে ত বটেই প্রকাশক হিসাবেও তিনি ছিলেন নির্ভীক। এই ক্ষেত্রে তাঁর নিঃশঙ্কতার প্রমাণ সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'India in Bondage' বইয়ের প্রকাশ ও মেজর বামনদাস বসুর ইংরেজ শাসনের সমালোচনাপূর্ণ গ্রন্থাদির প্রচারণা।

জাতিপ্রেম ছিল তাঁর গভীর, কিন্তু তা পক্ষপাতী মনোভাবের দ্বারা মলিন ছিল না। এ কথার প্রমাণ পাই এই নজিরে যে, কংগ্রেসের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রচণ্ড সমর্থক হয়েও তিনি কংগ্রেসের দোষত্রুটি উদ্ঘাটনে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, অপিচ যোগ্যক্ষেত্রে ইংরেজের গুণকীর্তনে অকৃপণ ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রশ্ন নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে চিন্তা করতেন এবং ঐ সূত্রে হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা, শক্তিদৈন্য, সামাজিক অসাম্যজনিত দুর্বলতা প্রভৃতি তাঁর বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল। এই উপলক্ষ্যে তিনি মুসলমান সমাজের বিপথগামী অংশকে কঠোর ভাষায় ভৎ'সনা করতে দ্বিধা করেন নি, কিন্তু তা বলে ঐস্লামিক সমাজবিধানের গুণপনার দিক সম্পর্কে অনবহিত থাকবার কারণ খুঁজে পান নি। মুসলমানদের সমাজ কাঠামোর গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের তিনি বারেবারেই প্রশংসা করেছেন। বাঙালী হিন্দুর শারীরিক বলের অভাব তাঁর গভীর মর্মপীড়ার স্থল ছিল এবং এ সম্বন্ধে সুযোগ পেলেই তিনি হিন্দু

সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস করেছেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি আচার্য যত্নাথ সরকারের সঙ্গে একযোগে হিন্দু সমাজকে সামরিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ঐ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ প্রচার চালিয়ে গেছেন। হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের সমস্যা নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে চিন্তা করতেন নানা লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে তাঁর গভীর স্বজাতি-প্রেমই শুধু সূচিত হয়। প্রত্যক্ষ রাজনীতিও তাঁর মনোযোগ-সীমার বহির্ভূত ছিল না। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি কিছুকাল হিন্দু মহাসভার রাজনীতির অভিমুখে ঝুঁকেছিলেন এবং একবার তার সর্বভারতীয় সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করে ছিলেন। কিন্তু পেশাদার রাজনীতিকের পদ্ধতি তাঁর ছিল না। হিন্দু মহাসভার অন্যান্য রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল এই দিক দিয়ে যে, মুশলিম লীগ-শাসিত রাজনীতির তাঁরা সমান আপোষহীন সমালোচক হলেও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে তাঁদের পরস্পরের মনোভঙ্গি বিপরীতমুখী ছিল। হিন্দু মহাসভার পরিচিত নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুনরুজ্জীবনমুখী আর রামমোহনের ভাবশিষ্য রামানন্দের দৃষ্টি ছিল সংস্কারমুখী, ক্ষেত্র বিশেষে বৈপ্লবিক। তথাকথিত সনাতন ভারতীয় আদর্শের উদ্গাতার দল আর রামমোহনের ভাবধারার প্রবক্তার মধ্যে, বলাই বাহুল্য, কোন গভীর সাযুজ্য থাকতে পারে না ; এ ক্ষেত্রে আপাত-সাযুজ্যকে অন্তরঙ্গ-সাযুজ্য মনে করবার কোনই কারণ নেই। রামমোহনের প্রতি রামানন্দের শ্রদ্ধা কি প্রগাঢ় ও গভীরতলাতিশায়ী ছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর "রামমোহন" নামীয় নিবন্ধটিতে তার পরিচয় মেলে। বস্তুতঃ গভীর শ্রদ্ধাবোধের অভিব্যক্তিই শুধু এ প্রবন্ধের একমাত্র গুণ নয়, রামমোহনের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের যথাযথ পরিজ্ঞাপক হিসাবেও এ রচনার মূল্য অসাধারণ। এখানে ঐ প্রবন্ধ থেকে কতক অংশ উদ্ধার করছি লেখকের বিশ্লেষণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বোঝাবার জন্য :

"তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের) মহত্ত্ব কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নহে; উহা সমুদয় পৃথিবী-সংসৃষ্ট। কেমনা, তিনি সমুদয় মানুষের রাষ্ট্রীয় ও আত্মিক স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন; বিশ্বমানবের কল্যাণের, ঐহিক, পারত্রিক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ তাঁহার প্রাণে আধুনিক কালে সর্বপ্রথমে উদিত হয় (পুরাকালেও আর কাহারও প্রাণে ঐরূপ সর্বাঙ্গীণ আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছিল কি না জানি না), এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা দ্বারা মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে, মহাদেশে মহাদেশে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান, অধমর্ণ-উত্তমর্ণ বা ভিক্ষুক-দাতার মধ্যে আদান-প্রদানের মত না হইয়া, সমান-সমানের মধ্যে হইতে পারে; তিনি অতীতের আত্যন্তিক পারত্রিকতা (otherworldliness) ও বর্তমানের ঐকান্তিক ঐহিকতার (secularism-এর) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সেতু রচনা করিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বদেশবাসীর ও স্বজাতির (হয়ত বা সকল মানবের) আত্মা (soul) এবং ধর্মবুদ্ধিকে (conscience) সর্বপ্রকার কৃত্রিম ও সংস্কারগত বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

ধর্ম সম্বন্ধে রামানন্দের মতামত অতিশয় উদার ছিল। অথচ তাঁর মন কঠিনের সাধনায় পরাঙ্মুখ ছিল না। যে সব ব্যক্তি বলেন যে, ধর্মের পথ অতিশয় দুরূহ হলে লোকের পক্ষে তা পালন করার অসুবিধা হয় সুতরাং সকলের জন্য সহজ ধর্মবিধি উদ্ভাসিত হওয়া আবশ্যক, তাঁদের মত খণ্ডন ক'রে সুবিজ্ঞ লেখক লেখেন—

"যে আদর্শের অনুসরণ করা অতি কঠিন বা কতকটা কঠিন, সেরূপ আদর্শ মানুষের সম্মুখে ধরিলে অল্প লোকেই তাহার অনুসরণ

করিতে পারিবে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, ধর্মের মহত্ত্বই এইখানে যে তাহা মানুষকে দুষ্কর কাজ করিতে বলে, মহৎ আদর্শের অনুসরণে দুঃখ ও বিপদকে অগ্রাহ্য করিতে বলে। যাহা সহজ, ধর্ম যদি আমাদিগকে কেবল তাহাই করিতে বলিত, তাহা হইলে মানুষের উন্নতি হইত না।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭)

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় রামানন্দের মনটি ছিল উচ্চ আদর্শ-বাদীর। আর এই উচ্চ আদর্শবাদের প্রেরণা থেকেই যে তিনি যৌবনকালে সুনিশ্চিতের মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চিত ও কঠিনের অভিমুখে ঝুঁকেছিলেন তার আন্দাজ পাওয়া যায়।

কথা ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, কথা কিছু নয়, কাজই হল আসল। এই প্রচলিত ধারণার খণ্ডন করে সুবিজ্ঞ লেখক লিখেছেন—

"এখন আর কথা কহিবার সময় নয়, কাজের সময় আসিয়াছে"; "বাঙ্গালী কেবল বকে, কাজ করে না"; "বক্তৃতা-টক্তৃতা রাখিয়া দাও, কাজ কর"; এইরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাগুলি ভাল কিন্তু ওগুলির মধ্যে সত্য আংশিক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। একটুও কথা না বলিয়া কোনও বড় কাজ করা যায় কি? কথা না বলিয়া কাজে প্রেরণা জন্মাইবে কেমন করিয়া? উদ্দীপনা কোথা হইতে আসিবে? কাজ যে কেন করা দরকার, তাহাও ত বুঝাইয়া দেওয়া চাই। কেমন করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহা বাক্যের দ্বারা জানান আবশ্যক। কাজ করিবার আদেশ বাক্যের দ্বারা দিতে হয়। যুদ্ধ যে একটা এতবড় কাজ, তাহাও বিনা বাক্যব্যয়ে হয় না। যাহারা খুব কর্মিষ্ঠ জাতি, তাহারা বাঙ্গালীর চেয়ে সোরগোল বেশী বই কম করে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে, কেবল বকা ভাল নয়, ফাঁকা আওয়াজ ভাল নয়, কাজের চেয়ে বক্তৃতা বেশী হওয়া উচিত নয়। কথাও চাই, কাজও চাই। কোনটির পরিমাণ বা অনুপাত কিরূপ হইবে, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না।" (প্রবাসী,

বৈশাখ ১৩২১)

জড়শক্তি ও আত্মিক শক্তির কোন্‌টি কি পরিমাণ থাকা উচিত মানুষের ব্যক্তিত্বে সে সম্বন্ধে মনস্বী রামানন্দের অভিমত—"দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতেই কাজ হয়, বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতে কিছু হয় না ; কিংবা বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতেই সব হয়, দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতে কিছু হয় না ; ইহার মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না। জগতের ধর্মপ্রবর্তকগণ দৈহিক শক্তিতে ভীম ছিলেন না, কিন্তু যদি তাঁহারা ক্ষীণজীবী, চিররুগ্ন হইতেন তাহা হইলে সত্য প্রচার তাঁহাদের দ্বারা হইত না। বড় বড় গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।" (প্রবাসী বৈশাখ ১৩২১)

ভক্তি ও সৎকর্মের সম্বন্ধটি বড় চমৎকার বুঝিয়েছেন আচার্য নিম্নের রচনাংশে—

"যেমন কথা ও কাজের একটা অনাবশ্যক বিরোধ ঘটান হয় তেমনি ভক্তি ও সৎকর্মের মধ্যেও যেন কোন ঝগড়া আছে এইরূপ কথা মাঝে মাঝে শুনা যায়। যাহারা খুব ভাববিলাসী তাহারা কাজের লোক না হইতে পারে। কিন্তু ভাববিলাসিতা যে ভক্তি তাহা কে বলিল ? কথায় কথায় চোখে জল আসে এমন লোকেরও প্রকৃত ভক্তি না থাকিতে পারে। আবার যাহার চোখে সহজে জল আসে না এমন প্রকৃত ভক্তও অনেক আছেন। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সৎকাজ করিবার শক্তি প্রকৃত ভক্তি হইতে পাওয়া যায়। কোন কাজ যে কাজের মত কাজ, ভগবানের সহিত যুক্ত না হইয়া তাহা স্থির করা কঠিন। যশের জন্য বা অন্য কোন প্রকার লাভের জন্যও অনেক সময় সৎকাজ করা হয়। তাহা সাত্বিক কর্ম নহে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি সাত্বিক ভাবে কাজ করিতে পারেন। পূজা অর্চনা ধ্যানধারণায় বেশী সময় দিলে সৎকর্মের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিচার্য বটে।" (প্রবাসী,

বৈশাখ ১৩২১)

এই উদ্ধৃতির মধ্যে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ (মহর্ষি) অনুমোদিত ব্রাহ্মধর্মোচিত আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভক্তির আদর্শটিই যে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে তা সহজেই বোঝা যায়। বৈষ্ণবদের ও শাক্তদের কথায় কথায় পুলক-রোমাঞ্চ, ভাবসমাধি, স্বেদকম্প, দরবিগলিত অশ্রুসিক্ত ও ধুলিধূসরিত ভক্তির আদর্শ অপেক্ষা উপনিষদীয় আত্ম-সমাহিতির আদর্শটিকেই যে তিনি সমধিক মান্য করতেন তা পরিষ্কার প্রতীত হয়।

আমরা আচার্যদেবকে মূলতঃ যুক্তিবাদী তথা মননশীলতার খাতবাহী লেখক বলে জানি, কিন্তু ভাবুকতাও যে তাঁর ভিতর বিলক্ষণ ছিল নীচের উদ্ধৃতি তার প্রমাণ—

"কে সুন্দর কে কুৎসিত সে বিষয়ে মানুষে মানুষে খুব মতভেদ দেখিয়াছি।—রূপটা যদি শুধু শরীরের ও বাহিরের জিনিস হইত, তাহা হইলে একই মানুষের যৌবনের রূপ প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের রূপের অপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু যৌবনাপগমে রূপ বাড়িয়াছে, এমন প্রসিদ্ধ কোন কোন মানুষের নাম করা খুব সহজ। স্থূলদর্শীর কাছে রূপগুণের বিরোধ আছে, সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে বিরোধ নাই। রূপ দেখিতে হইলে দ্রষ্টার সাত্ত্বিকতা চাই।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১)

উদ্ধৃতি আর নয়। যে কয়টি উদ্ধৃতি দেওয়া হল তা থেকেই রামানন্দের মানসিক গড়ন, চিন্তাপ্রণালী ও ভাষাশৈলী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা মনের মধ্যে গড়ে নেওয়া সম্ভব। ভাষাশৈলী সম্বন্ধে একটি কথা কবুল করতে আপত্তি নেই, ছাত্রাবস্থায় রামানন্দের স্টাইল আমার নিকট প্রাঞ্জল মনে হলেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাঠখোট্টা বলে মনে হত এবং কখনও বিস্মিত চিত্তে ভাবতাম রবীন্দ্রনাথের এত নিকট-সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও তিনি কেন তাঁর ভাষায় আরও লালিত্যের অনুশীলন করা থেকে বিরত থেকেছেন? রবীন্দ্র-স্টাইলের প্রভাব ত কই রামানন্দের স্টাইলে চোখে পড়ে না?

বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে পরে বুঝেছিলাম আমার ঐ ছাত্রজীবনের চিন্তায় ভুল ছিল। প্রথমতঃ, একজন মূলতঃ কবি আর একজন মূলতঃ যুক্তিপন্থী গদ্য-লেখকের ভাষার ভঙ্গি এক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আপাতদৃষ্টিতে রামানন্দীয় ভাষারীতিতে যেটা লালিত্যের অভাব বলে মনে হয় আসলে তা হল ভাষার যাথাযথ্যের (Precision) ফলশ্রুতি। সঠিক চিন্তা সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে গেলে উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করতেই হয় এবং কেবলমাত্র ভাব-প্রকাশক শব্দ সমূহই নির্বাচন করতে হয়—শব্দের বাহুল্য বা শব্দের ঝঙ্কৃত প্রয়োগ সুষ্ঠু গদ্যরীতির বিরোধী। ভাষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতা। তাতে যদি কমনীয়তার খানিকটা হানিও হয় তাও স্বীকার তবু অস্বচ্ছ জটিল ভাষা গ্রাহ্য নয়। গদ্য গদ্যের চালে চলা উচিত, তাতে ধ্বনিবাহুল্য বর্জনীয়। রচনা যত সঠিক মনোভাবের প্রকাশক হবে তত তার মূল্য। বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রবাসী-সম্পাদক এই সহজ স্বচ্ছ সুন্দর গদ্য ভঙ্গিরই পক্ষপাতী ছিলেন তাঁর চিন্তা-প্রকাশের ক্ষেত্রে। আমাদের নিকট এই ভাষাদর্শই আজ মান্য।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৭২

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তা

বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন সুগঠিত প্রণালীবদ্ধ সাহিত্যদর্শন ছিল কিনা জোর করে বলা মুশকিল ; তবে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের ইতস্তত:-ছড়ানো মন্তব্য, অন্তরঙ্গজনদের কাছে লেখা চিঠিপত্র এবং সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ নিবন্ধের অভিমত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁর যে মনের প্রকাশ ঘটেছে তার থেকে বোধকরি একটা ধরাছোঁয়া যায় এমন সাহিত্য-চিন্তার আদল খাড়া করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথমে যেটা লক্ষ্য করবার, তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। সাহিত্য কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য এবং সে সৌন্দর্যসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দান—এই নন্দনবাদী তত্ত্বে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল বলে মনে হয় না। যদিও হৃদয়ধর্ম তাঁর খুবই প্রবল ছিল তবু সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে, সমসাময়িক কালের ভাবনা-ধারণার আধারে, সাহিত্য পরিবেশনের যে মননশীল আদর্শ ক্রমেই সাহিত্যসংসারে উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তিনি সেই আদর্শেরই অনুগামী ছিলেন এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। অন্তত: তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, চিত্র-চরিত্রের গড়ন এবং বক্তব্যের ধাঁচ থেকে সে কথাই বারে বারে মনে হয়। তাঁর কথা ছিল : "সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনার কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য।"

অর্থাৎ সাহিত্য শিল্পের কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মনের উপর কোন সময়েই তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি, যেমনটা পেরেছে সমাজসচেতন সাহিত্যের ভাবাদর্শ। এই দিক দিয়ে শরৎচন্দ্র ছিলেন আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন সার্থক উত্তরাধিকারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল ছিল সামান্যই, কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রের তাঁদের দুজনার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল যে, দুজনার কেউই সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সংরচনের কথা চিন্তাও করতে পারেননি—সমাজ বারংবার তাঁদের লেখায় ফিরে এসেছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র সাহিত্যের এই সমাজসম্পৃক্ত মননশীল আদর্শের অনুগামী হলেও, যাকে আজকের দিনের পরিভাষায় বলে মননশীল লেখক, তা তিনি বোধহয় ছিলেন না। গোড়াতেই বলেছি, তাঁর ভিতর হৃদয়ধর্মের অতিশয় প্রাবল্য ছিল; ভাবাবেগের প্রাচুর্য ও সাধারণ স্তরের বাঙালী জীবনের প্রতি অন্তহীন দরদ প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর মননশীলতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের ঘরকন্নার ছবি যখনই তিনি ফোটাতে গেছেন তখনই তাঁর সমাজসচেতন বুদ্ধিবাদী স্বরূপকে আড়াল করে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পরদুঃখকাতর অসামান্যসংবেদনশীল মানবিক সত্তা। শরৎচন্দ্রের শিল্পী জীবনের এ এক আশ্চর্য দ্বৈধতা যে, তিনি হতে চেয়েছেন মননশীল লেখক কিন্তু হৃদয়বৃত্তির আধিক্যের জন্য বারে বারে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পরাহত হয়েছে। এতবড় হৃদয়সম্পদে ধনী লেখক আমাদের ভাষায় কমই আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর এই হৃদয়ৈশ্বর্য একই কালে তাঁর দোষ ও গুণের হেতু হয়েছে। দোষের, এই কারণে যে, ঠিক এইজন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাগাল ধরতে পারেননি; গুণের, যেহেতু ঠিক এই অন্তহীন সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতার কারণেই তিনি শিক্ষার স্তরভেদ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালী পাঠকের চিত্তজয়ী হয়েছেন। এমনভাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রসাহিত্য বাঙালীর মন কাড়তে পারেনি।

শরৎচন্দ্র একজন অসাধারণ মানবিকগুণসমৃদ্ধ কথাসাহিত্যিক। বিদেশের মানবতন্ত্রী কথাকারদের মত (যেমন টলস্টয়, গর্কি প্রমুখ) মানুষই ছিল তাঁর রচনার মুখ্য উপজীব্য। প্রকৃতি বর্ণনায় কিংবা

রূপ বর্ণনায় তিনি তেমন উৎসাহ পাননি। মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি তাঁর আকৈশোর ভ্রাম্যমাণ বাউণ্ডুলে জীবনে বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, জীবনের মন্দ দিকটাও পরখ করে বড় কম দেখেননি। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই বিষামৃতময় জীবনের নানাবিধ উল্টপাল্টা অভিজ্ঞতা লাভের পরও মানুষে বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়নি, তিনি 'সীনিক' বনে যাননি ; বরং যতদিন বেঁচে ছিলেন,মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসার সঞ্চয়ই তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের পাত্র থেকে অঝোরে। এ এক অত্যদ্ভুত সংঘটন যে, জীবনের 'অন্ধকার' দিকটার সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখির সম্বন্ধ স্থাপন করার পরও মানবপ্রীতি এমন অক্ষুণ্ণ অবিকৃত রাখতে পারা যায়। অনেকেই তা পারেন না। পাপ যাদের জীবনে আসক্তির স্তর পেরিয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাদের তো কাথাই নেই, যারা সাময়িক বিভ্রমের বশে স্খলনপতনের পথে পা বাড়ানো সত্ত্বেও কিছুকাল পরেই আবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সুস্থ ও স্বাস্থ জীবনের ঘাটে ফিরে আসতে সমর্থ হয়, এমনকি তারাও দুর্ভাগ্যক্রমে এই নিষ্কলুষ মানবপ্রীতির স্বর্গ থেকে নির্বাসনদণ্ড বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আশ্চর্য, শরৎচন্দ্রের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। হাঁসের পাখায় যেমন জল লাগে না, তেমনি তিনি কী এক দুজ্ঞেয় জাদুক্রিয়ার দ্বারা নিজের গা থেকে পরিব্রাজক জীবনের সমস্ত রকম বিরূপ অভিজ্ঞতার মলিন ভস্মরাশি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় সংসারাঙ্গনে ফিরে এসেছেন সকলের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসার আবেগ নিয়ে। এই ভাবটাকেই প্রকাশ করেছেন তাঁর এক ভাষণে এই ভাবে :

"নানা অবস্থা বিপর্যয়ে এক দিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাঁরা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি,

বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ। এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার করেও দেখিনি, শুধু সেদিন যাকে সত্যি বলে অনুভব করে-ছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি।" (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর)।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে শরৎচন্দ্র স্বীয় সাহিত্য জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে : "তোমাদের মত কবিকল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত সহজে ছোটবড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, দ্বাদশ সম্ভার, পৃ. ৩৫৩)।

এই দুটি উক্তি থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক স্বরূপের যে-ছবিটি ভেসে ওঠে তা হলো, তিনি বহুদর্শী বহুশ্রুত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর এই নানাপথগামী অভিজ্ঞতা-ভূয়িষ্ঠতার পরেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানবপ্রেমকে অব্যাহত ও অমলিন রাখতে পেরেছিলেন। মানুষী

ছিলেন মজ্জাগতভাবে অত্যন্ত সহৃদয় ও করুণাপ্রবণ, নয়তো জীবনের এত এত তিক্ত-মধুর, কটু-কষায় অভিজ্ঞতা লাভের পরেও গ্রামের সাধারণ পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ কোটরে বদ্ধ আটপৌরে নরনারীর দুঃখ-বেদনায় এমন করে তিনি চোখের জলে আপ্লুত হতে পারতেন না। নিজে কেঁদেছেন, তাঁর পাঠকসাধারণকেও কাঁদিয়ে ভাসিয়েছেন। তিনি পতিপ্রাণা বিরাজ-বৌ-এর অবস্থাগতিকে পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগের দুঃখে কেঁদেছেন; বিনাদোষে সরযূর স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার দুঃখে কেঁদেছেন; দরিদ্র ঘরের কন্যা জ্ঞানদার যথেষ্ঠ বয়স্থা হয়েও অনূঢ়া থাকার দুঃখে কেঁদেছেন; বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিবহনকারিণী বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি একান্ত স্বাভাবিক ভালবাসা পল্লীসমাজ-শাসনে অবদমিত ও পরাস্ত হওয়ার দুঃখে কেঁদেছেন; গেঁজেল গুলিখোর জুয়াড়ি স্বামীর সতীসাধ্বী স্ত্রী শুভদার অপরিসীম ক্ষমাপ্রবণতার মাহাত্ম্যের কাছে মাথা নত করেছেন; অভিমানিনী বিন্দুর অপরিমিত সন্তানবাৎসল্যের ক্ষুধার চিত্র এঁকে বন্ধ্যানারীর বেদনার তীব্রতা বুঝিয়েছেন; মায়ের কল্পিত কলঙ্কের দরুন বিনা অপরাধে স্বামীর ঘর করতে না পারার আহত অভিমানে পর্যুদস্তা কুসুমের একদিকে দৃপ্তমর্যাদাবোধ অন্যদিকে সপত্নীপুত্রের প্রতি দুর্নিবার স্নেহের টানের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি এঁকে সংবেদনশীলা গ্রাম্য নারীর দুঃখের অতলতার বোধ জাগিয়েছেন তাঁর পাঠকের মনে; স্বামী নামক আদর্শের পায়ে সমর্পিতচিত্তা সনাতন ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক এক সাধারণ পল্লীবধুর অদ্ভুত সেবাপরায়ণতার আলেখ্য তুলে ধরেছেন গৃহদাহ উপন্যাসের মৃণাল চরিত্রের মধ্যে; ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুলের মধ্যে; এক অসহায় পরনির্ভর সরল-অন্তঃকরণ গৃহশিক্ষকের প্রতি এক বিধবা ধনী কন্যার জননীতুল্য নিষ্কলঙ্ক স্নেহের আকর্ষণের ছবি ফুটিয়েছেন বড়দিদির মাধবী চরিত্রের ভিতর; এমনি আরও কত চিত্র ও চরিত্র! এরকমটা কখনও সম্ভব হতে পারতো না; যদি

এদের প্রতি লেখক মনেপ্রাণে আন্তরিকতা গুণসম্পন্ন না হতেন, বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে পরিণত বয়সেও একাত্মতা অটুট না রাখতে পারতেন।

এরকম সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের ভুললে চলবে না শরৎচন্দ্র গ্রামের সন্তান হলেও তাঁর জীবনের একটা বড় ভাগ কেটেছে শহরে: বাল্যে ও কৈশোরে ভাগলপুরে, যুবাবস্থার কিছুকাল কলকাতায়, তারপর এক দমকে অনেক কাল রেঙ্গুনে, পরে আবার কলকাতায়। ভালমন্দ বহুবিধ নাগরিক অভিজ্ঞতার তিনি শরিক হয়েছেন জীবনে, তার আভাস পূর্বেই দিয়েছি। রেঙ্গুনে থাকতে বিচিত্র বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন, তাঁর অধীত বিষয়গুলির মধ্যে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি ছিল প্রধান। তাঁর ভাষার ডৌলটিও ছিল তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরাপুরি নাগরিক, দরবারী, কিনা sophisticated। তাঁর মাজাঘষা ঝকঝকে স্টাইলের গড়ন থেকেই বোঝা যায় তিনি সচেতন ভাষাশিল্পী ছিলেন, শব্দপ্রয়োগে ছিলেন অতিশয় সতর্ক। অথচ কী আশ্চর্য, নাগরিক মেজাজের এই শিল্পীর মনটি ছিল গ্রামের সুরে বাঁধা। বাংলার পল্লীর প্রতি ভালবাসা তিনি সারা জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারেননি, বাইরের নানাবিধ পালিশ আর পরিমার্জনা সত্ত্বেও অন্তরটি গ্রামেতেই সংলগ্ন ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সহজাত মানবপ্রেম, ভাবাবেগের প্রাচুর্য, নিজে যে-শ্রেণী থেকে উঠেছিলেন সেই শ্রেণীর জীবনের স্তরের লোকগুলির প্রতি মমত্ব তাঁকে পল্লীজীবনের রূপকার হিসাবেই বিশেষভাবে বাংলা-সাহিত্যে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর পল্লীভিত্তিক গল্প-উপন্যাসগুলিই যে বেশী উৎরেছে সেটা এইজন্যই অকারণ নয়। পল্লীসমাজ, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, পণ্ডিতমশাই, দেনা-পাওনা প্রভৃতি উপন্যাস এবং মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী, বামুনের মেয়ে, বিন্দুর ছেলে, রামের

সুমতি প্রভৃতি বড় ও ছোট গল্পগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের মধ্যে পড়ে। তাঁর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাস যেমন গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন, পথের দাবী প্রভৃতিতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট, মননজীবিতার পরিচয় স্পষ্ট ; কিন্তু রস আর আন্তরিক সংবেদনাই যদি শিল্পসৃষ্টির প্রাণ হয় তাহলে বলতেই হবে যে, প্রথমোক্ত রচনাগুলিই বাঙালী পাঠকের চিত্তে বেশী দাগ কেটেছে। অথচ এই সব রচনার উপকরণ কত সামান্য, চরিত্রগুলি কত সাদামাঠা। মননজীবিতার মধ্যে জটিলতা থাকে, থাকে খরবুদ্ধি শাণিত চিন্তার স্বাদ—নাগরিক পদ্ধতি-প্রকরণে অভ্যস্ত বিদগ্ধ পাঠকের এই ধরনের জটিল চিত্র-চরিত্রই বেশী ভাল লাগে। তিনি কিরণময়ী কিংবা অচলা কিংবা কমলের চরিত্র অনুধাবন করে যতটা উল্লসিত হন, বিরাজ বৌ কিংবা কুসুম কিংবা রমার চরিত্র অনুধাবন করে স্বভাবতই ততটা উল্লসিত হতে পারেন না। অথচ শরৎচন্দ্রের বেলায় দেখা যায়, তাঁর প্রথমোক্ত চরিত্র-গুলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে শেষোক্ত চরিত্রগুলি সমধিক দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। সারল্যের জয় হয়েছে জটিলতার উপরে, হৃদয়ধর্মের মনন-শীলতার উপরে, পল্লীপ্রাণতার নাগরিকতার উপরে। শরৎসাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে এমনকি মননশীল রচনাদর্শের অনুরাগী পাঠকও মনে মনে এই তথ্য স্বীকার না করে পারেন না।

এই অবিশ্বাস্য সংঘটনের একমাত্র কারণ শরৎচন্দ্রের আন্তরিকতা গুণ। তাঁর অপরিমেয় হৃদয়ৈশ্বর্য এই আন্তরিকতার উৎস থেকেই উচ্ছ্রিত হয়ে এসেছে। পুনরপি বলি, এমন জন্মবৈরাগী বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মানুষ কেমন করে মনের গোপনে সাধারণ মানুষের জন্য এত গভীর আন্তরিক প্রেম বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সেইটে একটা পরম রহস্যের মত মনে হয়।

মননশীলতার সঙ্গে হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের শিল্পী জীবনে লেগে ছিলই এবং এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ বারবার জয়লাভ করেছে। যে-কারণে তাঁর বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসগুলির কিছু কিছু

চরিত্রের বলিষ্ঠতা (যেমন, অভয়া, কিরণময়ী, কমল, সব্যসাচী প্রভৃতি) ও বহু চমকপ্রদ কথায় মনকে নাড়া দেওয়ার আলোড়ন-ক্ষমতা সত্বেও বাঙালী পাঠক কিন্তু সেই সমস্ত রচনাকে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ প্রাণের প্রীতি জানায়নি, সর্বাঙ্গীন প্রীতি জানাতে জানিয়েছে বিরাজ বৌ, নিষ্কৃতি, বড়দিদি, মেজদিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ প্রভৃতি রচনাকেই। অথচ এই রচনাগুলির গঠন অজটিল, কাঠামো একমেটে, চরিত্র পরিকল্পনা একটা বিশেষ পরিচিত ছাঁচ অনুযায়ী। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিতে হৃদয়াবেগ খুব প্রবল। যেমন দেবদাস উপন্যাস। এই উপন্যাসটি যতই কাঁচা লেখা আর মেলো-ড্রামার লক্ষণ চিহ্নিত হোক না কেন, ভাগ্যহত অধঃপতিত দেবদাসের দুঃখে চোখের জল না ফেলেছে এমন পাঠক খুব কমই পাওয়া যাবে। কিংবা চন্দ্রনাথ উপন্যাসের কৈলাস খুড়ো চরিত্র। ঐই আত্মভোলা স্নেহপরায়ণ চরিত্রটিকে ভাল না বেসেছে এমন পাঠকেরও সাক্ষাৎ মেলা দুষ্কর। শরৎচন্দ্র শুধু যে নিজেই মানুষকে প্রাণভরে ভাল বেসেছেন তা-ই নয়, অপরকেও তিনি ভালবাসিয়ে ছেড়েছেন।

২

'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের কিছু সাহিত্য সম্পর্কিত রচনা (যার বেশীর ভাগই অভিভাষণ আকারে লিখিত) সংকলিত আছে। এই রচনাগুলি এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জনকে লেখা চিঠিপত্রের বয়ান দৃষ্টে মনে হয় সাহিত্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্কের প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের কিছু সুস্পষ্ট মত ছিল। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের ভাল সাহিত্য দুর্নীতির প্রচার কোনমতেই করতে পারে না। নীতিশিক্ষা দেওয়াও তার কাজ নয়। এ বিষয়ে তিনি একবার লিখেছিলেন, "ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ, সেও বলে, মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিক কোন দিন সাহিত্যের আসরে

অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতি সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।" (শিবপুর ইনস্টিট্যুটে সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০)। অন্য-পক্ষে ১৩৩১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন,…"অতএব যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art, নয়, ধর্ম নয় Art for art's sake কথাটাও যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না, এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয়, শত সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়।"

আমি প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি শরৎচন্দ্র কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাস করতেন না। কেন করতেন না তার মূল উপরের কথাগুলির মধ্যে নিহিত আছে। এই ভাষণেরই অপরাংশে তিনি বলেছেন—"Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙরা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র সৃষ্টি কি এতই সহজ?" "দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য সাহিত্য হয় না।" চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের আয়োজিত সাহিত্য-সভার আলাপচারীতেও তিনি একই কথা বলেছেন—সাহিত্যে দেহবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন মত প্রচার করেছেন।

এই কথাগুলি আমাদের বর্তমান সাহিত্যের কিছু কিছু

অতিপ্রাকৃতবাদী কথাসাহিত্যিক ধীরচিত্তে অনুধাবন করে দেখলে ভাল হয়। বাস্তবের হুবহু অণুকারিতার নামে তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রায় আবর্জনার জঞ্জালে পরিণত করে তুলেছেন। তাঁদের লেখায় সাহিত্য ও পোর্নোগ্রাফীর সীমারেখা ঘুচবার উপক্রম হয়েছে। তাঁরা শরৎ-চন্দ্রের হিতোপদেশে কর্ণপাত করলে আত্মসংশোধনের একটা মস্ত সুযোগ লাভ করে উপকৃত হবেন। জীবনের মলিন দিক শরৎচন্দ্র নিজেও কম দেখেননি, কখনও কখনও তাতে অণুলিপ্ত হয়েছেন কিন্তু সেই বিসদৃশ প্রভাবের ছাপ তাঁর সাহিত্যে তিনি আদৌ ফেলতে দেননি—এইখানেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসকে অনেকে তার নামের থেকে সংকেত গ্রহণ করে দুর্নীতিপূর্ণ বলতে চান। এক সময়ে immoral বিবেচনায় এই উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্যালয় থেকে ফেরত এসেছিল। শেষে সেটি যমুনায় প্রকাশিত হয়। চরিত্রহীন উপন্যাসের এই তথাকথিত নীতিহীনতা আজকের পরিশীলিত নীতিবোধের মানদণ্ডের বিচারে মোটেই ধোপে টেঁকে না। শরৎচন্দ্র নিজেও এই নিন্দাত্মক কিংবদন্তীর বারবার সজোরে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—যিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—কে লেখা একাধিক পত্রে শরৎচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অশ্লীলতার অভিযোগের খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তিনি খেদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুকে লিখেছেন তাঁদের যদি টলস্টয়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস রিসারেকশন পড়া থাকত তো চরিত্রহীনকে তাঁরা দোষাবহ মনে করতে পারতেন না। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তিনি এথিকস-পড়া লোক, নীতিধর্মের মূল কথাগুলি তিনি অন্য কারও চেয়ে কিছু কম জানেন না। তিনি তাঁর সেই প্রতীতির ভিত্তিতে বলতে পারেন, চরিত্রহীন উপন্যাসের কোন অংশই তিনি দুর্নীতিপূর্ণ করে আঁকেননি। তবু যদি কারও সেরকম মনে হয়ে থাকে তো সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য।

শরৎচন্দ্রের এই সকল উক্তির মধ্যে তাঁর মৌলিক সাহিত্যচিন্তার

রূপরেখার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, শ্লীলতা-অশ্লীলতা নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর মত প্রচলিত মতের অনুবর্তী ছিল না। তাঁর বিবেচনায় সেই সাহিত্যই দুর্নীতিপূর্ণ, অশ্লীল, যে-সাহিত্য অকারণে মানুষের রিরংসাবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করতে চায় এবং এই অনুচিত পথে পাঠকের মনোযোগ কৃত্রিমভাবে আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। বাস্তব ঘটনার অবিকল অনুকরণ এরূপ একটি পথ। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় এই পথ বরাবর সযত্নে বর্জন করেছেন।

চরিত্রহীন উপন্যাসের কিরণময়ী আর সাবিত্রী চরিত্র নিয়ে সবচেয়ে বেশী আপত্তি উঠেছিল। কিরণময়ী প্রচলিত নীতিধর্মে অবিশ্বাসিনী, প্রাচীন শাস্ত্রবচনগুলিকে সে কানাকড়িরও মূল্য দেয় না, সতীধর্মের প্রতিও তার তাদৃশ আস্থা আছে বলে বোধ হয় না, অন্ততঃ তার আচরণ সে কথার প্রমাণ দেয় না ; কিন্তু মনে মনে সে পাতিব্রত্যের আদর্শের একান্ত গুণমুগ্ধা ও নিজ জীবনে তার ব্যত্যয় ঘটেছে বলে নিজের উপর বীতশ্রদ্ধা। অন্যদিকে সাবিত্রী একটি মেসের ঝি, তার লম্পট ভগ্নীপতি তাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে গৃহের বার করে নিয়ে এসেছিল তারপর তাকে ত্যাগ করে। অপরের লুব্ধদৃষ্টি তার উপর পড়েছিল বলে সে নিজেকে অশুচি মনে করে, হয়তো যে-পরিবেশে সে বাস করত সে-পরিবেশে তার পক্ষে পুরা-পুরি শুচি জীবনযাপন করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তার ব্যবহার ছিল অতিশয় ভদ্র সংযত মাধুর্যমণ্ডিত। তার মার্জিত কথাবার্তায় ও অপূর্ব সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ মেসের অন্যতম বাসিন্দা সতীশ তাকে ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক বলে কখনও ভাবতে পারেনি, সাবিত্রীরও মেসের বাবুদের মধ্যে বিশেষ পক্ষপাত পড়েছিল সতীশের উপর কিন্তু এমনি তার শুচিতা ও পবিত্রতার দিকে নজর যে সে কখনও তার দেহকে অবলম্বন করে সতীশকে নষ্ট হতে দেয়নি বরং সর্বাবস্থায় তাকে সর্বনাশের কবল থেকে আগলে রাখবার চেষ্টা করেছে। সাবিত্রীর

চরিত্রমাধুর্যের প্রভাবে পড়ে বেপরোয়াস্বভাব নেশাসক্ত সতীশের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

এই তো হলো এই দুই চরিত্রের স্বভাবের মূল কাঠামো। এর মধ্যে তখনকার কালের সনাতনী সমালোচকের দল নীতিহীনতার কোন্ বিশেষ উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন ভাবতে তাজ্জব লাগে। দুটি নারীরই মূল প্রবণতা প্রেমতন্ময়তার দিকে, পরিবেশের ক্লেদ থেকে উদ্ধার লাভ করে নির্মল হওয়ার দিকে। এমন চরিত্রে কেমন করে নীতিহীনতার কলুষ আরোপ করা যায় ভাল বুঝতে পারা যায় না। কিরণময়ী চরিত্রের পরিকল্পনায়, তার সংস্কার-মুক্ত কথাবার্তার ধরনে ও আচরণের ছাঁচে যা-ও বা আপত্তির কারণ থাকতে পারে, সাবিত্রীর বেলায় তেমন আপত্তি আদৌ টেকে না। কিরণময়ী চরিত্রের আপাত-বলিষ্ঠতা, পিলে-চমকানো কথাবার্তা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লেখক তার অন্তরের শূন্যতাকেই শুধু প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিরণময়ী যে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল সে আর কোন কারণে নয়, সে তার বাইরের বিদ্রোহ আর অশ্রদ্ধাপরায়ণতার সঙ্গে ভিতরের পবিত্রতার অভিলাষের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলো না বলে। এ ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর গুলীবদ্ধ হয়ে মরার মত স্থূল বা ক্রূর ঘটনা নয়, এ হলো সেই জাতের ঘটনার দৃষ্টান্ত যাতে বর্ণিত চরিত্র নিজের আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের ভারে নিজেই ভেঙে পড়ে। কিরণময়ী তার অসামঞ্জস্য-জনিত tension সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়, তার জন্য নীতি-শিক্ষক বঙ্কিমের পন্থানুসরণে সামাজিক দাওয়াই প্রয়োগ করে তাকে শাস্তি দেবার তাগিদ শরৎচন্দ্র অনুভব করেননি। এ রকম নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় তাঁর আস্থা ছিল না। বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন তোমরা চরিত্রহীন নিয়ে এত সোরগোল করছ, কিন্তু তোমরা দেখো এর সমাপ্তিটি আমি strictly moral করে আঁকব। এখানে strictly moral কথাটার

ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের অভিলষিত moralityর ধারণায় মানব-স্বভাবকে ছাপিয়ে সামাজিক অনুশাসনের প্রবলতার স্থান ছিল না, স্থান ছিল মানব-স্বভাবের নিজস্ব নীতিনিয়মকে স্বীকার করে নেবার বলিষ্ঠতা। কিরণময়ীর স্বভাবকে অনুসরণ করে তার পরিণাম যেরূপ হওয়া উচিত তা দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত শাসনদণ্ড উদ্যত করে তাকে শাস্তি দেবার জন্য তাকে পাগল বানাননি। Strictly moral বলতে এখানে তিনি শিল্পের নীতির কথাই বুঝিয়েছেন, সাহিত্যের স্বাধর্ম্যের ইঙ্গিত করেছেন; সামাজিক নীতিশাসনের কৃত্রিমতাকে বোঝাননি। তাকে মূল্য দেওয়া তো আরও পরের কথা।

তাছাড়া এ ব্যাপারে আরও কথা আছে। শরৎ-সাহিত্যের রচনারীতি মনোযোগের সঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যে-কারণে সাহিত্য অশ্লীলতা বা নীতিহীনতার দোষদুষ্ট হয়—বাস্তবের অবিকল অনুকারিতা ও বল্গাহীন বর্ণনা—তার চর্চা থেকে তিনি বরাবর দূরে ছিলেন। নরনারীর দেহমিলন দেখিয়েছেন কিন্তু একজন খাঁটি আর্টিস্টের মত সংযত সংকেতের দ্বারাই তিনি সে-প্রয়োজন সাধন করেছেন, আজকের তথাকথিত উগ্র বাস্তববাদী লেখকের মত লেবু-চটকানোর ধরনে মিলন দৃশ্যের বর্ণনার হদ্দ করে ছাড়েননি। অসাধারণ সংযমী লেখক শরৎচন্দ্র। এই ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী এবং তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রমুখ কতিপয় পরবর্তীকালীন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের প্রেরণার স্থল। চরিত্রহীন উপন্যাসের কথা হচ্ছিল। এই বইয়ের কোথাও কি এতটুকু ইঙ্গিত আছে যার দ্বারা মনে করতে পারা যায় আসঙ্গ-লিপ্সার সবিস্তার বর্ণনায় তাঁর সামান্য উৎসাহও পরিলক্ষিত হয়েছে? তবে এ বই চরিত্রহীনতার দোষে কলুষিত হলো কী প্রকারে? এক দেহলোলুপতার ছবি ফোটাবার অবকাশ ছিল রেঙ্গুন অভিমুখী জাহাজের ডেকে কিরণময়ীর প্রতি দিবাকরের সন্ত-জাগ্রত রূপমোহ ও

জৈবক্ষুধার বর্ণনাংশে। কিন্তু সেখানেও শব্দের কি অসাধারণ ব্যয়কুণ্ঠা! সবিস্তার বর্ণনের কত অনীহা!

এ বিষয়ে আরও ভাল দৃষ্টান্ত আছে। আমি গৃহদাহ উপন্যাসের অচলা-সুরেশ সম্পর্কের কথা বলছি। ডিহরীতে বাস করা-কালীন এক রাত্রি অচলা-সুরেশের মধ্যে জৈব মিলন সাধিত হয়েছিল। দুয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় নয়, ঘটনার দৈব চক্রান্তে। অন্ততঃ অচলার সজ্ঞান ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো বটেই। এই দৃশ্যের কী অপরূপ ব্যঞ্জনা-শ্রিত গূঢ় ইঙ্গিতধর্মী বিবরণ শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তা গৃহদাহের সংশ্লিষ্ট রচনাংশ তুলে ধরলেই বুঝতে পারা যাবে। গৃহকর্তা রামবাবু অচলাকে সুরেশের শয়নকক্ষের দিকে ঠেলে দিলেন। বৃদ্ধের বারংবার উপরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে অচলা ধীর পায়ে সুরেশের শয়নকক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর কী ঘটলো? শরৎচন্দ্রের বর্ণনা উদ্ধৃত করছি :

"বাহিরে মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।"

পরদিন অতিশয় ভোরে রামবাবু শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে দেখতে পেলেন, "বারান্দার এক প্রান্তে টেবিলে মাথা রাখিয়া সুরমা (অচলা) চেয়ারে বসিয়া আছে। 'তুমি যে, এত ভোরে উঠেছ কেন?' সুরমা একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মত শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।"

"বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে এই অর্ধমৃত নারী-দেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।"

কয়েকটি মাত্র কথার আঁচড়, কিন্তু কোন কথাই কি ব্যক্ত হতে বাকী আছে? "বাহিরে মত্ত প্রকৃতি" ভিতরের মত্ততার প্রতিরূপক, অচলার মড়ার মত শাদা মুখ, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা ও কালো পাথরের গা থেকে ঝরণাধারার নেমে আসার মত দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন, তার "অর্ধমৃত নারী-দেহ", কোন সংবাদই অকথিত রাখেনি। পরপুরুষের সঙ্গে এই অবাঞ্ছিত অবৈধ মিলনে ভারতীয় নারীর সনাতন সংস্কার ও মজ্জাগত পাতিব্রত্যের আদর্শ কি সাংঘাতিকভাবে বিমর্দিত হয়েছে, সূক্ষ্ম সাংকেতিকতাময় শব্দগুলির মধ্য দিয়ে তারই কিছুটা আভাসে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র যে কত বড় শিল্পী ও তাঁর সাহিত্যভাবনা কত সুস্থ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই অংশটির চিত্রণে তার অসংশয় পরিচয় তিনি রেখেছেন। আমাদের একালীন কথাকারদের মধ্যে যাঁরা দেহমিলনের বর্ণনার ন্যূনতম সুযোগ পেলেও সেই সুযোগ ছাড়েন না এবং খুঁটিনাটি সমেত তার ঘোলকাহন বর্ণনাদানে মেতে ওঠেন, তাঁদের শরৎচন্দ্রের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং সেইভাবে নিজেদের রচনাকে পরিশোধিত করা উচিত।

বাংলা সাহিত্য জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানেন সাহিত্যের রীতি ও নীতি নিয়ে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ নিয়ে কিছু প্রবীণ ও নবীন লেখক বিতর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। ঘটনাটি এই: ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের বিচিত্রা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের ধর্ম' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের (কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি গোষ্ঠীর লেখকদের) লেখনীর অসংযমকে কটাক্ষ করে কিছু অকরুণ মন্তব্য করেন। পরের মাসের বিচিত্রায় এই প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ ও সংশ্লিষ্ট তরুণ লেখকদের পক্ষ সমর্থন করে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি জোরালো প্রবন্ধ প্রচার করেন। একে একে এই বিতর্কে যোগ দেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শরৎচন্দ্র

এবং আরও কেউ কেউ। শরচন্দ্রের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ওই বছরের আশ্বিন মাসের বঙ্গবাণী পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। তাতে তিনি তরুণ লেখকদের পক্ষ অবলম্বন করে কবি-গুরুর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু চোখা-চোখা বাণ নিক্ষেপ করেন। তরুণ লেখকদের প্রতি, তারুণ্যের প্রতি, তারুণ্যের সৃষ্টিক্ষমতার প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি স্থির থাকতে পারেননি। তরুণদের প্রতি মমতার বশে কবির সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের সাহিত্য ছিল সংযমের পরাকাষ্ঠা কিন্তু যাঁদের হয়ে তিনি সওয়াল করতে নেমেছিলেন তাঁদের অনেকের রচনা সম্পর্কে কিন্তু সে কথা বলা যায় না। তরুণ লেখকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই যে সে সময় জেনেশুনে "বেআব্রুতার" ব্যসনে মেতেছিলেন সে কথা আজ ইতিহাসের সত্যে পরিণত। কবির অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র অভিযোগটিকে উড়িয়ে দেবার আগ্রহে কবির বিরুদ্ধে কিছু অতিরিক্ত ঝাঁঝ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। তীব্র তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো লেখার নমুনা হিসাবে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের ওই লেখাটি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র পরে স্বীকার করেছিলেন যে, কবির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় তাঁর নিজের বক্তব্যের অনুকূলে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি—স্বল্প-পরিমাণ নজিরের ভিত্তিতে তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ওই সময়ের পরে এক বৎসরকাল যাবৎ তিনি তরুণদের লেখা বই-পত্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়েন। পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কবিগুরুর সমালোচনায় যথেষ্ট সারবত্তা ছিল। এই অকপট স্বীকারোক্তির পরিচয় আছে তাঁর ১৩৩৬ সালে আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত একটি অভিভাষণের বয়ানের মধ্যে। শরৎচন্দ্র যে কতখানি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এই স্বতঃপ্রবৃত্ত কবুলনামার মধ্যে। তরুণ লেখকদের উদ্দেশ্য করে তিনি

এই ভাষণে বলেছেন: "তোমরা যারা এখানে আছ, রাগ করে আমার কথা নিও না। এ সব আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি। বহুদিন সাহিত্য চর্চা করে যা ভাল বুঝেছি তার থেকেই বলছি, সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু আধটুর জায়গায় কোথাও কিছু হতো না। এ ক্ষেত্রে তা একেবারে নয়।"

কিন্তু মাত্র এই স্বীকারোক্তির জন্যই প্রবন্ধটি মূল্যবান নয়, এতে আরও এমন কিছু কথা আছে যা নবীন-প্রবীণ সকলেরই আমাদের বিশেষ প্রণিধান করা উচিত। ভারতীয় সমাজের শাস্ত্রশাসিত বিশেষ গড়নের জন্য, অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য, এদেশে যৌন অবদমনের সমস্যা একটি বাস্তব সমস্যা। এই কারণেই এদেশীয় তরুণ লেখকদের দৃষ্টি এই বিষয়টার দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হয়। তাঁরা যেন আর কোন বিষয়বস্তু চোখেই দেখতে পান না। শরৎচন্দ্র এই একাঙ্গিতার সমালোচনা করে লিখেছেন: "কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ।···বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানবজীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে, এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল একদিকে যৌনচিত্রণের দিকে হলে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি সেটা সাহসের অভাব। এদিকে ত শাস্তির ভয় নাই, কেউ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যেদিকে শাস্তির ভয় আছে, সেদিকে সত্যসত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি; কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশের

কত রকম অভাব আছে—নানা দিকে আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলছ।”

শরৎচন্দ্র একেবারে মোক্ষম জায়গায় হস্তস্পর্শ করেছেন। আজও নবীন লেখকদের একটা মোটা ভাগ যৌনতার সমস্যা নিয়েই বুঁদ হয়ে আছেন, রাষ্ট্র সমাজ ও দেশের যে আরও বহুতর সমস্যা আছে তা তাঁদের কল্পনাকে মোটেই উচ্চকিত করে না। তাঁদের জিজ্ঞাসার বিস্তৃতির অভাব ও কেবলমাত্র একটি বিষয়ের উপরেই অন্তহীন দাগা বুলনোর অভ্যাস যে বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীকে নিতান্ত সংকীর্ণ সীমায় সীমিত করে রেখেছে তা তাঁরা দেখেও দেখছেন না। Sex জীবনের অনেকগুলি বিষয়ের একটি বিষয় মাত্র; সেইটাই জীবন নয়। তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। শরৎ সাহিত্য থেকে যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে তো এই শিক্ষাই আমরা পাই।

চতুষ্কোণ বিশেষ শরৎ সংখ্যা ১৮৮৩

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প

আচার্য প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ছোটগল্প হবে এমন রচনা যা ছোটও হবে আবার গল্পও হওয়া চাই। ছোটগল্পের এই দাবি তিনি নিজের গল্পে সার্থক ভাবে পূরণ করে গেছেন। কেন না প্রমথ চৌধুরীর গল্পের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তা একাধারে গল্প ও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট। একমাত্র 'চার-ইয়ারি কথা' বাদ দিলে তাঁর কোন গল্পেরই কলেবর এক ফর্মার দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে যায়নি, বেশীরভাগ গল্পই শেষ হয়েছে আট থেকে দশ পৃষ্ঠার মধ্যে। কতকগুলির আয়তন তার চেয়েও হ্রস্ব। চার-ইয়ারি কথা অবশ্য ছাপার ('গল্পসংগ্রহ', বিশ্বভারতী) যাটষট্টি পৃষ্ঠা নিয়েছে, কিন্তু আসলে তো এটি চারটি গল্পের সমষ্টি। সুতরাং আয়তনের হ্রস্বতার দাবি বরাবরই তিনি মান্য করেছেন 'brevity is the soul of wit' এই মহাবাক্য গল্পের ক্ষেত্রেও স্মরণ করে। আর গল্পের গল্প হয়ে ওঠাটা যদি বিচার্য হয় তা হলেও দেখা যাবে তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পই গল্পরসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁর গল্পের গল্পত্ব অতি স্পষ্ট এবং তাদের সব কয়টিই সুখপাঠ্য। অতএব অসংশয়ে বলা চলে ছোট গল্পের যে সংজ্ঞা তিনি নিজে বেঁধে দিয়েছেন সেই আদর্শ থেকে শিল্প-কর্ম হিসাবে তাঁর ছোটগল্পের স্খলন ঘটেছে খুব কম ক্ষেত্রেই। তাঁর ঘোষণা ও চেষ্টার ফলের ভিতর মিল আছে।

অনেকে বলেন প্রমথ চৌধুরীর গল্প বুদ্ধিপ্রধান, ইনটেলেক-চুয়াল। আমার তা মনে হয় না তাঁর অধিকাংশ গল্পে এমন একটা বৈঠকী খোসমেজাজ, আড্ডার আসরের আবহাওয়া আছে, যা বুদ্ধি-বাদের পরিপন্থী। বুদ্ধি জিনিসটা প্রায়ই বিশুদ্ধ ব্যবচ্ছেদী, তর্কসংকুল হয়। তাতে আইডিয়ার কচকচি থাকে, থাকে এক আইডিয়ার সঙ্গে

অন্য আইডিয়ার সংঘাত সংঘর্ষের শব্দযুদ্ধ। কিন্তু প্রামথিক ওরফে বীরবলী গল্পের মেজাজ মোটেই সে জাতের নয়। তাঁর গল্পের বিষয় সরস, উপস্থাপনা শিল্পগুণান্বিত, সংলাপ পরিহাস ও বিদ্রূপের ঝিলিক-ময়, আপাতবিরোধযুক্ত অর্থের ব্যঞ্জনা প্রকাশক শব্দশৈলীর নজীরে পূর্ণ, অর্থাৎ 'এপিগ্রাম' আর 'প্যারাডক্সে' তাঁর সংলাপ বোঝাই। 'পান' বা শব্দসাদৃশ্য অলংকার তাঁর আর একটি প্রিয় ব্যসন।

যদি বলেন এপিগ্রাম, প্যারাডক্স, উইট, পান ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ প্রমথ চৌধুরীর মূলতঃ বুদ্ধিপ্রধান মেজাজটিকেই চিহ্নিত করে তাহলে বলব, লেখকের মানসিক গঠনের সকল হিসাব এর মধ্যে লওয়া হয়নি। এ কথা খুবই সত্য যে, প্রমথ চৌধুরী সুপণ্ডিত, ইংরেজী, ফরাসী আর সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অধিকার স্বীকৃত, বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যে কয়জন সত্যিকারের বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান্ মানুষের আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে তিনি একজন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মানতে হয় যে, তিনি যে শ্রেণী থেকে 'উদ্ভূত' হয়েছিলেন তা প্রাচীন পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন পুরাতন অবস্থা-ব্যবস্থার পোষক। বীরবল শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন সম্পূর্ণ আধুনিক, কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রায় ছিল সামন্ততান্ত্রিক খানদানি মুসলমানী সহবৎ এবং ইঙ্গ-বঙ্গীয় ধারার একাকালীন সমন্বয়, ফলে যে অর্থে আজকের দিনে 'বুদ্ধি-বাদ' কথাটার প্রয়োগ হয়—একটা শুষ্ক নিরুত্তাপ, নীরক্ত পণ্ডিতিয়ানার মনোভঙ্গী,—সে অর্থে বুদ্ধিবাদী লেখক তিনি কোন সময়েই ছিলেন না। তাঁর জীবনে অবসর ছিল, বিরাম ছিল, অবসর আর বিরামকে সুখদায়ক করে তোলবার মতো বিত্তের সচ্ছলতা ছিল (একেবারে শেষের দিকে ছাড়া), এদিকে ব্যাপ্ত অধ্যয়ন দ্বারা তিনি তাঁর অবসরকে নিছক আলস্য-বিলাসিতায় পরিণত হতে কখনও দেননি ; যাকে বলে good things of life তার প্রতি ছিল তাঁর চিত্তের সহজ আকর্ষণ —অভিজাত সমাজের ধ্যানধারণা সংস্কার জীবনযাত্রাপদ্ধতি এসবের আবহে তিনি আবাল্য বর্ধিত হয়েছেন। এই কারণে, গল্পেই হোক

আর প্রবন্ধেই হোক বীরবলী ঢংয়ের ভিতর প্রচুর বুদ্ধির ঝলক আর বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের প্রমাণ থাকলেও, তাঁকে আধুনিক কালোচিত 'ইনটেলেকচুয়াল' লেখক কোনমতেই বলা চলে না। তাঁর গল্প-গুলিতে, বিশেষ করে যে পৃথিবী আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তার হাস্যপরিহাস, রসিকতা, সৌন্দর্যবোধ, জীবনপ্রীতি, বৈঠকী গাল-গল্পের মেজাজ ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা" গল্পে মোগলাই আবহাওয়ার দ্যোতকরূপে যে "সুদীর্ঘ অবসর সুলম্ব পরিচ্ছদ সুপ্রচুর শিষ্টাচার"-এর কথা বলা হয়েছে তা বীরবলের ভাবগত জীবনাচরণের বেলায়ও স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা চলে।

প্রমথ চৌধুরী আধুনিক চিন্তন মননের প্রতিনিধি নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিলীয়মান, অধুনা-প্রায়লুপ্ত সমাজ ব্যবস্থারও প্রতীক। তাঁর এই দ্বৈত সত্তার তাৎপর্য না বুঝলে তাঁকে সম্যক্ বোঝা যাবে না।

এই কথাটি আমাদের ভালো করে অনুধাবন করা দরকার। বিশেষতঃ বীরবলী ছোটগল্পের প্রসঙ্গে তো বিশেষ ভাবেই অনুধাবন করতে হবে। দু-চারটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি পরিষ্কার করা যাক।

বীরবলী গল্পের পাঠকমাত্রেই জানেন যে বীরবল তাঁর গল্প রচনার বিভিন্ন পর্বে, নীল-লোহিত, ঘোষাল আর সারদাদাদা এই তিন কথকের বাচনিক অনেকগুলি গল্পের সৃষ্টি করেছেন। "নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা", "নীল লোহিতের স্বয়ম্বর" প্রভৃতি, নামেই মালুম, নীল-লোহিতের সহিত সম্পৃক্ত; "ফরমায়েশি গল্প" "ঘোষালের হেঁয়ালি", "বীণাবাঈ", "পুতুলের বিভ্রাট" প্রভৃতি গল্প ঘোষালের কীর্তি-কলাপের সঙ্গে যুক্ত; এবং "ফার্স্টক্লাস ভূত", "সারদাদাদার সন্ন্যাস", "সারদাদাদার সত্য গল্প" প্রভৃতি রচনা সারদাদাদা মানুষটিকে আমাদের কাছে পরিচিত করেছে।

এই তিন পর্যায়ের গল্পেরই বৈঠকী মেজাজ অতি স্পষ্ট। নীল-

লোহিত, ঘোষাল আর সারদাদাদা গল্প বলছেন, শ্রোতারা শুনছেন। আর সে সব গল্প কী জাতীয় গল্প? আধুনিক ধাঁচের গল্প মোটেই নয়, প্রায়ই উদ্ভট আর অদ্ভুত রসের গল্প, ভূতের গল্প, অসম্ভাব্য আর অবিশ্বাস্য ঘটনার গল্প, কৌতুকের ছিটা আর বিদ্রূপের ঝাল-মসলা-মিশ্রিত প্রেমের গল্প, ইত্যাদি। এগুলির বিষয়বস্তু, পরিবেশ, মানুষ, চরিত্রবৈশিষ্ট্য সব কিছুরই সঙ্গে একালীন পৃথিবীর অনুষঙ্গের মিল সামান্য। গল্পগুলির পশ্চাতে আছে সুবিস্তৃত অবসরের পটভূমি, যে-অবসর ইদানীং কালে ক্রমশঃ বিরল হয়ে এসেছে। অবসর আড্ডার জন্ম দেয়, আড্ডার ভাব গল্পগুলির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে। কয়েকজন মানুষ অবসরবিনোদন আর বিশ্রম্ভালাভের উদ্দেশ্যে ধনী গৃহের বৈঠকে কিংবা কোনো আসরে এসে মিলিত হয়েছেন, তারপর কথার সূত্র ধরে নীল-লোহিত কিংবা ঘোষাল কিংবা সারদাদাদা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে গল্পগুলির ছক্। এ ছক্ আদপেই ইনটেলেক্চুয়াল গল্পের ছক্ নয়, এর আষ্টেপৃষ্ঠে অনুলিপ্ত হয়ে আছে পুরাতন পৃথিবীর সৌরভ। এ সৌরভ এখন আর আমাদের মনোহরণ না করতে পারে কিন্তু একদা এ সৌরভ বাংলাদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রকে মাতিয়ে রেখেছিল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। অধুনা অডিকোলন, এসেন্স অব রোজ, আরও কত কী প্রাণভুলানো নির্যাস পুরাতন আতরের স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু তাই বলে সমঝদার মহলে আতরের কদর কি কিছুমাত্র কমেছে?

এও অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয়বস্তু, আবহ, চরিত্র, ঘটনাক্রম, সংলাপের ধারা প্রভৃতি, পরিষ্কার বোঝা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত জমিদারী তন্ত্র থেকে উদ্ভূত। অনর্জিত সম্পদ আর পরশ্রমে পুষ্ট অবসরের জীবন, এই গল্পগুলির পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে তার ভিত্তি। পরভৃত বা পরগাছা সমাজের ছবি গল্পগুলির রেখায় রেখায় স্পষ্ট।

এই পরগাছা সমাজের ভালো-মন্দ যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলা আমার অভিপ্রায় নয় ; এখানে শুধু বলবার কথা এই যে, প্রমথ চৌধুরী তাঁর গল্পগুলিতে যে ধরনের চিত্র-চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা পুরাতন পৃথিবীর স্মারক। আধুনিক জগতের ধরন-ধারণ করণ-কারণ সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই।

গল্পগুলির যেখানে দুর্বলতা সেখানেই তাদের শক্তি। দুর্বলতা এইখানে যে, প্রায় গল্পেই ভোগী সমাজের চিত্র উপস্থিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বনেদিয়ানার শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, ব্রাহ্মণত্বের অহংকার, সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রেণীর মানুষজনের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যে একেবারেই বেমানান কতকগুলি অনুচিত সংস্কার। বর্তমান যুগের আকাশে-বাতাসে সঞ্চরমাণ সমাজতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা কর্ষিত মানুষের কাছে তথাকথিত বনেদিয়ানার মোহ, ব্রাহ্মণত্বের অহংকার, নীচশ্রেণীর প্রতি তাচ্ছিল্য বা করুণাভাব—এগুলি যে বিসদৃশ ঠেকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও না বলে পারা যায় না যে, ওই প্রাচীন আবহাওয়ার রূপায়ণের মধ্যেই গল্পগুলির শক্তির বীজ নিহিত। বীরবলী গল্পের এত যে আকর্ষণ ; তার পরিহাসপ্রিয়তা, শ্লেষ ও বিদ্রূপের উপভোগ্যতা, বৈদগ্ধ্যের ঝলকানি, জীবনরসের প্রাচুর্য, প্রেমের বৈচিত্র্য রূপায়ণ—এর সব কিছুর মূলে আছে পিছনে-ফেলে-আসা অভিজাত জীবনের দ্যোতনা, সুপরিসর অবসর আর তাদানুপাতিক মানসিকতাযুক্ত বনেদী জীবন, যে বনেদী জীবন আধুনিক কালের ঘষায়-ঘষায় ইদানীং বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এক সময়ে একেবারেই হারিয়ে যাবে। নারীর রূপ, প্রেমের বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যের নানা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ; যে সব বস্তুর দ্বারা বেঁচে থাকার ক্লান্তি ও একঘেয়েমি সহনীয়, নমনীয়, এমনকি স্পৃহনীয় হয়—যেমন, জাঁকালোভাবে বাস করা, ঐশ্বর্য আর

আড়ম্বর চারপাশে স্তূপীকৃত করে তোলা, নারীসঙ্গ আর প্রেমচর্চা, বিবিধ প্রকারের নেশার বশ্যতা, রঙ্গরসিকতা, শ্লেষ ও ব্যঙ্গপ্রবণতা, আপাতবিরোধী শব্দশিল্প—এ সব বীরবলী গল্পের নিত্যবর্তমান উপকরণ বলা চলে। বলাই বাহুল্য, অতিরিক্ত মস্তিষ্কজীবিত রসকসহীন গোমড়ামুখো আধুনিক কালের এগুলি বৈশিষ্ট্য নয়। এর সবই বিগত জীবনের সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। এ কাল আত্যন্তিক পাণ্ডিত্যের কচ্‌কচির কাল, রসের ছিটেফোঁটাও নেই এইকালে। ইংরেজী সাহিত্যের প্যারাডক্সের দুই দিক্‌পাল শিল্পী ছিলেন—অস্কার ওয়াইল্ড আর বার্নার্ড শ'। ঠিক সমান দরের শিল্পী না হলেও আমাদের সাহিত্যে তাঁদেরই স্বগোত্র হলেন—প্রমথ চৌধুরী। আজকের দিনে এই তিনের অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাঁদের সাহিত্য চেখে চেখে উপভোগ করতে পারি, কিন্তু হায়, তাঁদের কালে আর ফিরে যেতে পারি না।

"নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা" একটি চমৎকার গল্প। কিন্তু এই চমৎকারিত্ব কিসে নিহিত? মনে হয় তার উদ্ভটত্বে নিহিত, তার অসম্ভবতায় নিহিত। সুরাট কংগ্রেসের সময় (১৯০৭) নীললোহিত বেনামী কংগ্রেসী ডেলিগেট হয়ে সুরাটে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে নানা আপদ-বিপদের মধ্যে পতিত হয়। তার পর অবিশ্বাস্য অবস্থায় পড়ে গুজরাটী এক বাইজীর আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে তার কৃপায় কী করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে তারই কৌতুককরকাহিনী। আগাগোড়া বানানো গল্প। বানানো বলেই তার মধ্যে উদ্ভটত্বের সঙ্গে সত্যিকার সৃষ্টিশীলতার আমেজ লেগেছে। "নীললোহিতের স্বয়ম্বর" এই ধরনের আর একটি উদ্ভট রসের গল্প। পুরাতন স্বয়ম্বরের নব রূপান্তর এই গল্পটির মধ্য দিয়ে উদ্ভটত্বে আর কৌতুকে মিশে অদ্ভুত রসে রসায়িত হয়ে উঠেছে। দারোয়ান-সর্দারের ছদ্মবেশী নীললোহিতের গলায় গল্পের নায়িকা মালশ্রীর অতর্কিতে মালা পরিয়ে দেওয়ায় স্বয়ম্বর

সভায় যে হুলুস্থুল পড়ে গেল তার সঙ্গে কনৌজ রাজকন্যা সংযুক্তার চৌহানরাজ পৃথ্বিরাজের আকৃতিবিশিষ্ট দ্বারপালের গলায় মালা পরিয়ে দেবার পরবর্তী ঘটনার তুলনা করা যেতে পারে। গল্পের কথক নীললোহিত স্বয়ং স্বয়ম্বরের নায়ক হওয়ায় গল্পের হাস্যরসটি আরও স্ফুটতর হয়েছে।

"ফরমায়েশি গল্প" আর "ঘোষালের হেঁয়ালি" গল্প দুটিতে ফুটেছে ঘোষাল নামক মানুষটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। ঘোষাল একাধারে মোসাহেব, ভাঁড়, স্পষ্টবক্তা পণ্ডিত ও সুকণ্ঠ গায়ক। এক এক পরিবেশে তার এক এক ভূমিকা। কিন্তু সব ছাড়িয়ে তার যে রূপটি এই গল্পদ্বয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা হল তার আশ্চর্য উত্তর-প্রত্যুত্তরদানের কুশলতা। কথার পৃষ্ঠে লাগসই কথা বলায় সে ওস্তাদ। রসিয়ে কথা বলতে যেমন সে পারঙ্গম তেমনি প্রয়োজন দেখা দিলে বিদ্রূপের হুল ফুটানো কথা বলতেও সে সমান সুদক্ষ। বস্তুতঃ গল্প দুটিকে কথোপকথন শিল্পের উৎকর্ষের দুটি প্রকৃষ্ট নমুনারূপে গণ্য করা যেতে পারে। "ফরমায়েশি গল্প"-এর একটি অংশ—যে কোনো অংশ, খুঁজে পেতে চিহ্নিত করা বাছাই করা কোনো অংশ নয় —উৎকলন করে দিচ্ছি এ মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য—

রায়মশায়—কি বললি, ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি!—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে!

ঘোষাল—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে তো সমস্ত ক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

পণ্ডিতমশায়—তা তো ঠিকই। আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং যখন যা খুশি তখনই সেই উৎসব করতে পারেন।

ঘোষাল—শুধু করতে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে তো আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাকত তা হলে কে আর সেখানে যেতে চাইত? আমি তো নয়ই—

রায়মশায়—উনি তো ননই! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন!

ঘোষাল—হুজুর, আমি কোথাও যেতে চাই নে, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।

রায়মশায়—যেখানে আছেন সেইখানেই থাকতে চান! যেন উনি থাকতে চাইলেই থাকতে পেলেন! তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি।

ঘোষাল—হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।

এর ভেতর গোপালভাঁড়ীয় প্রত্যুত্তরদান ক্ষমতার খানিকটা আমেজ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষমতাটুকু অনেক বেশী মার্জিত, বিদগ্ধ, বলাই বাহুল্য।

"ঘোষাল" পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে "ঘোষালের হেঁয়ালি" আর "বীণাবাঈ" গল্প দুটি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য হয়েছিল, 'বীণাবাঈ' গল্পটির কোনো তুলনা হয় না। এর পরিবেশবর্ণনার ভিতর যদিও প্রাচীন পৃথিবীর প্রভাব অতি স্পষ্ট এবং কাহিনীবিন্যাসে অবাস্তবতার ছাপ এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়নি, তা হলেও সব জড়িয়ে গল্পটির আবেদন অনবদ্য। সংগীতসাধিকা বাঙালীকন্যা আংশিক ছদ্মনাম-ধারিণী বীণাবাঈয়ের জীবনের ট্র্যাজিডি ঘোষালের প্রগলভতা সত্ত্বেও মনে গভীর রেখাপাত করে। গল্পটির সঙ্গে ওস্তাদি গানের আবহ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে একমাত্র পাকা সংগীতজ্ঞের পক্ষেই এই জাতীয় বর্ণনা করা সম্ভব, এবং প্রমথ চৌধুরীর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের একজন রসজ্ঞ সমঝদার ছিলেন। আজকের পুরাতন গণতন্ত্রসেবিত বৈশ্যপ্রভাবিত সাহিত্যে পুরাতন দরবারী আবহাওয়ার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে দরবারী সংগীতের অনুষঙ্গও অন্তর্হিত হয়েছে সাহিত্যজগৎ থেকে। তাতে যে ক্ষতি হয়নি এমন কথা বলতে পারিনে।

চার-ইয়ারি কথা দৃশ্যতঃ একটি বৃহদাকার গল্প হলেও আসলে গল্প-

চতুষ্টয়। চার ব্যারিষ্টার বন্ধুর বিলাত প্রবাসকালীন প্রেমজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে এই একদা-বহুল-আলোচিত গল্পটিতে। 'ইটারন্যাল ফেমিনিন' বা চিরন্তনী নারীর স্বরূপ বর্ণন গল্প কটির উদ্দেশ্য। এর মধ্যে সোমনাথের বলা গল্পটি সব চাইতে চিত্তাকর্ষক, অপিচ নারী চরিত্রের রহস্যের উপর সবচেয়ে বেশী আলোক সম্পাতকারী। লেখকের নিজ মুখের বলা গল্পটিতেও প্রকাশ পেয়েছে নারীহৃদয়ের একটি অনুদঘাটিত দিক। ইংলণ্ডের তথাকথিত নিম্ন জাতীয়া পরিচারিকা বা দাসীবর্গের স্ত্রীলোকের অন্তরেও যে কত সুকোমল, সূক্ষ্ম প্রেমের অনুভূতি থাকতে পারে তারই একটি বিষাদ-করুণ আলেখ্য এই কাহিনীটি। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন—"তোমার শেষ গল্পটা সবচেয়ে humane।" বাস্তবিকই তা-ই! গল্পটির মানবিক আবেদন অপ্রতিরোধ্য।

রবীন্দ্রনাথ 'অনুকথা সপ্তক' গ্রন্থের (গল্পগুলি "মন্ত্রশক্তি" "যথ" "ঝোট্টন ও লোট্টন" "মেরি ক্রিসমাস" "ফাস্টক্লাশ ভূত" "স্বল্প-গল্প" ও "প্রগতি-রহস্য") পড়ে প্রমথ চৌধুরীকে চেকভের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গল্পের আয়তনে, গল্পের লঘু চালে এবং গল্পের সমাপ্তিতে আকস্মিক চমক সৃষ্টির কৌশলে নিঃসন্দেহে চেকভের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর রচনা রীতির মিল আছে। তবে মনে হয় সাদৃশ্যটাকে এর বেশী টেনে বাড়ানোটা ঠিক হবে না। চেকভের গল্প আর প্রমথ চৌধুরীর গল্পের অন্তঃপ্রকৃতিতে মিল নেই। দুইয়ের বিচরণের ক্ষেত্র আলাদা। চেকভ পতিত ও শোষিত শ্রেণীর দরদী বন্ধু, জারশাসিত রাশিয়ার বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সমালোচক, পরশ্রমপুষ্ট অভিজাত জীবন যাত্রার আদর্শের বিরোধী ; আর প্রমথ চৌধুরী তাঁর অশেষ বৈদগ্ধ্য পাণ্ডিত্য আর মুক্ত মনের বৈভব সত্ত্বেও, আসলে ক্ষয়িষ্ণু বিগত অভিজাত তন্ত্রের প্রতিনিধি, বনেদিয়ানার ধারক ও বাহক, মনোভাবের দিক দিয়ে প্রাচীন সমাজের অনুরাগী। বাংলা দেশের পুরাতন

জমিদারদের কারও কারও মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতি, মোগলাই সহবৎ আর ইঙ্গবঙ্গীয় ধারার যে ত্রিবেণী সংগম দেখা যায় তার ধারায় নিস্নাত একজন উচ্চস্তরের সাংস্কৃতিক মানুষ প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু তাই বলে তাঁর শ্রেণী-পক্ষপাত কোন দিকে ছিল সে বিষয়ে ভুল করার যো নেই। নির্যাতিত শোষিতের ভাগ্যোন্নয়নের প্রশ্নে তাঁর সহানুভূতি যে একান্ত ভাবেই শোষিত শ্রেণীর প্রতি ছিল তার কোনো প্রমাণ বহন করে না তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য, যদিও রায়তের কথা নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি রায়তদের অনুকূলে একদা লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর গল্পের কোথাও কোথাও তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞার প্রকাশও আছে। যেমন "বীরপুরুষের লাঞ্ছনা" গল্পে, "মন্ত্রশক্তি" গল্পে। পাঠ্য-কেতাবের কল্যাণে মন্ত্রশক্তি গল্পটি বহুলপঠিত হলেও, আসলে ঐ গল্পটিতে মন্ত্রশক্তির দৈব মহিমা ছাড়াও আরও কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সেটা কি? সেটা আর কিছু নয়, লেঠেল শ্রেণীর মানুষদের প্রতি 'সদাশয়' জমিদারদের বাৎসল্য অনুকম্পা আর করুণার মিশ্র মনোবৃত্তি। অনর্জিত সম্পদের উপর জমিদারী ভোগ-দখলের অধিকার টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে লেঠেল ঈশ্বর সর্দারদের যে আত্মঘাতী ও প্রাণঘাতী ভূমিকা, তারই একটি অলিখিত কিন্তু নাতি- গুপ্ত প্রশস্তি এই গল্পটির মূল। জমিদারের স্বত্বস্বামিত্ব বজায় রাখার জন্য যে শ্রেণীর মানুষ নিজেরা চিরদারিদ্র্য সয়েও মনিবের জন্য কথায় কথায় জান্ দিতে পারে, তাদের প্রতি কি জমিদারের মমতা না থেকে পারে? শোষক শ্রেণীর অভিধানেও, যতই অস্পষ্ট অক্ষরে হোক, কৃতজ্ঞতাবোধ বলে একটা কথা আছে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প সাহিত্যের উৎকর্ষ খাটো করে দেখানো এ রচনার অভিপ্রায় নয়, আসলে ওই গল্পগুলির আঙ্গিকগত উৎকর্ষ, রসরসিকতা, বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি গুণ বরাবরই আমার মনোহরণ করেছে।

তবে এইখানে যা করা হল তা শুধুই গল্পের আলোচনা নয়, সেই সূত্রে আছে বীরবলী মানসিকতারও কিছু বিশ্লেষণ। বীরবলী রচনা-শৈলী আর বীরবলী মানসিকতা দুটি পরস্পর বিযুক্ত বিষয় নয়, কেননা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন শিল্প আর শিল্পীর মানসগঠন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শিল্পীর মনকে বাদ দিয়ে শিল্পকর্মের আলোচনা যেহেতু অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য, সেই কারণেই এই দুটি আলোচনাকে একত্র গ্রথিত করে প্রকাশ করা হল।

তারাশঙ্করের 'রাইকমল' ও 'কবি'

পরলোকগত লেখক প্রখ্যাত কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে প্রায় ৭০।৮০ খানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার অধিকাংশই উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহ, অবশিষ্ট বইগুলির মধ্যে আছে কিছু নাটক, কিছু আত্মকথামূলক স্মৃতিচারণ, দু-একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ, একটি ভ্রমণকাহিনী, ইত্যাদি। যৌবনে সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত করেছিলেন একখানি কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, পরে আর কবিতার বই ছাপাননি, যদিও মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন মূল গদ্য রচনার কাজ থেকে বিশ্রামের উপায় হিসেবে। এবং শখ হিসেবে। তবে কবিতার সেই শাখা, যা লোক-সাহিত্যের অঙ্গ—লোকগীতি—তার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বরাবর। এবং এইক্ষেত্রে তিনি কিছু উৎকৃষ্ট রচনার পরিমাণ রেখে গেছেন কাব্যামোদীদের বিনোদনের জন্য। তাঁর 'কবি' উপন্যাসের গানগুলি এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পরেও একাধিক উপন্যাসে প্রয়োজনীয় উপলক্ষ্যে তিনি এ-জাতীয় গান আরও লিখেছেন এবং সেগুলিতে আশ্চর্য সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তার যেটা লৌকিক দিক, গণজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দিক, তাঁর কবিত্বের অনুভবের দিক, তা এই গানগুলির মধ্য দিয়ে যেমন চমৎকারভাবে ফুটেছে, এমন বোধ হয় আর কোনো-কিছুতে ফোটেনি।

আমি আমার বর্তমান আলোচনায় তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিককার দুখানি উপন্যাসকে বিশেষ মনোযোগের বিষয়ীভূত করেছি। সেটা অকারণে করিনি, এরূপ করার পিছনে একটা পরিকল্পনা আছে। এই প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করব তারাশঙ্কর সেই সব রচনাতেই সবচেয়ে বেশী সার্থক যেখানে তাঁর লেখনী বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত। যে দুটি উপন্যাসের নাম করছি—'রাইকমল' ও 'কবি'—এ কথার অসংশয় প্রমাণ এবং

এই দুটি বইই বোধহয় এই দিক দিয়ে তাঁর প্রথম পর্বের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। পরে ধীরে ধীরে তারাশঙ্কর বিশুদ্ধ লোক-সংস্কৃতির প্রভাব-পরিধি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন এবং এমন সব বিষয় নিয়ে গল্পোপন্যাস রচনা করেছেন যা গ্রামীণ জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হলেও ঠিক বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতির উৎসসঞ্জাত নয়। তার মধ্যে নাগরিকতার প্রভাব আছে, আছে sophistication বা বুদ্ধির পরিমার্জনা, সর্বোপরি আছে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের বিস্তার। এই সব প্রভাবের ছাপ তাঁর যেসব বইয়ের উপর পড়েছে—যেমন—'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা,' 'আরোগ্য নিকেতন', 'বিচারক.' 'সপ্তপদী', প্রভৃতি—সেগুলি গ্রন্থ হিসাবে যে কিছু কম উপভোগ্য তা বলছি না, বরং রাইকমল ও কবির তুলনায় তাদের কোনো-কোনোটির খ্যাতি সমধিক, নাগরিক পাঠকের কাছে তাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেদনটাও তুলনায় বেশী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সবিনয়ে বলব, বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টি হিসাবে 'রাইকমল' ও 'কবি'-র পাশে ওসব বই দাঁড়াতে পারে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই দুটি গ্রন্থে আমরা তাঁর অবিকৃত শিল্পী-সত্তায় পাই, পাই তাঁকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির একজন শক্তিধর আধুনিক প্রতিনিধি রূপে—শেষোক্ত বই-গুলির আলোচনায় তারাশঙ্করের এই রূপটিকে বোধহয় তেমনভাবে দাঁড় করানো চলে না। তাঁর পরিচয় সেখানে একাধিক বহিঃপ্রভাবের স্পর্শে ফিকে হয়ে গেছে, নাগরিকতায় আর গ্রামীণতায় জড়াজড়ি হয়ে সেখানে লোকজীবনের শুদ্ধ চেহারাটিকে আর পাওয়া যায় না।

অবশ্যই রাইকমল আর কবি যে তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতির প্রভাবের একক দৃষ্টান্ত তা নয়, এই প্রকৃতির আরও বই তাঁর আছে। যেমন, 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'কালিন্দী', 'তামসতপস্যা,' 'নাগিনী কন্যার কাহিনী,' 'চাঁপাডাঙার বউ' প্রভৃতি। আমরা এখানে শুধু তাঁর আদিপর্বের দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উপরে আমাদের মনো-যোগ নিবদ্ধ করেছি আলোচনার সুবিধার জন্য। আমার নিজের

ধারণা, তারাশঙ্কর তাঁর অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্যসাধনার ফসল হিসাবে যতগুলি উপন্যাস রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হল প্রথম পর্বের রাইকমল আর উত্তর পর্বের নাগিনী কন্যার কাহিনী। নাগিনী কন্যার কাহিনীও রাইকমলের মতো সাহিত্যশিল্পের মাধ্যমে বাংলার অবিকৃত লোকসংস্কৃতির একটি অনবদ্য অভিপ্রকাশ। এতে দুটি সাপুড়ে কন্যার (শবলা ও পিঙ্গলা) প্রণয়াকুলতা ও হৃদয়বেদনা ব্যঞ্জিত হয়েছে কবি তারাশঙ্করের সৃষ্টি-কুশল দরদী লেখনীমুখে। বিশেষ, পিঙ্গলার চরিত্র-পরিকল্পনার কোনো তুলনা হয় না। বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান বেবাজিয়া বা বেদে সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শাখা—সাপুড়ে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাপ্রণালী সংস্কার-বিশ্বাস আচার-আচরণ প্রভৃতি এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে অপূর্ব শিল্প-অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কিন্তু এই বইটির কোথাও তেমন নামোল্লেখ দেখতে পাই না। সমালোচকদের সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে রবীন্দ্র-পুরস্কারধন্য হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, অ্যাকাদেমি-পুরস্কারধন্য আরোগ্য-নিকেতন, আর জ্ঞানপীঠ-পুরস্কারধন্য গণদেবতা। পুরস্কারের এমনি মহিমা যে. অচিরে সকলের চকিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পুরস্কৃত বইয়ের উপর এবং যেহেতু পরের মুখে ঝাল খেতেই সবচেয়ে সুবিধা, সেই কারণে পুরস্কারের আলোকে বইয়ের গুণাগুণ নির্ণয়ের মতো নিরাপদ কাজ আর কিছুই নেই। গণদেবতা বইটির কথাই ধরা যাক। এই উপন্যাসটির মধ্যে জ্ঞানপীঠের বিচারকর্তারা কী পেয়েছেন তা তাঁরাই বলতে পারেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এটি তারাশঙ্করের নিকৃষ্ট বইগুলির অন্যতম। এতে না আছে বিশুদ্ধ শিল্পের প্রকাশ, না পাই সামাজিক প্রসঙ্গের অভিব্যঞ্জনা, যা পরে তারাশঙ্করের একটি প্রিয় অভ্যস্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বিষয়টি হল গ্রামের পড়ন্ত জমিদার আর উঠতি নবধনিকের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের দ্বন্দ্ব। এরও কোনো ছাপ নেই বইটিতে। শুধু আছে রোমান্টিক জাতীয়তার একটি মামুলী চিত্র। আর আছে সমাজসেবার ছিটেফোঁটা

পার্শ্ব-কাহিনী। এ দুটি প্রবণতাই দেবু ঘোষ নামক মূল চরিত্রে কায়া লাভ করেছে কিন্তু মোটেই শৈল্পিক প্রতীতিযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। অথচ দেখা যায় জ্ঞানপীঠ-পুরস্কার লাভের পর এ বইয়ের কী সমাদর আর তারাশঙ্করকে সম্মানিত করবার জন্যে তথাকথিত বিদ্বজ্জন সংস্থাগুলির কী আকুলতা! কে কার আগে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তারাশঙ্করকে সংবর্ধিত করবেন তার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে হুড়োহুড়ি বেধে গেল। আগে কেবা মান করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি! এই বাজার-চলতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রকমসকম দেখে আমার ধারণা হয়েছে এই সব প্রতিষ্ঠানে আর যারই চর্চা হোক রসবোধের কোনো চর্চা হয় না এবং জনমতের উপর নির্ভর করেই এঁরা সাধারণতঃ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভিনন্দিত করে থাকেন, নিজেদের বিচার বুদ্ধির দায়িত্বে নয়। তারাশঙ্করকে স্বীকৃতি দেওয়াই যদি তাঁদের অভিপ্রেত ছিল তো সে কাজ তাঁরা অনেক আগেই করতে পারতেন; রাইকমল, কবি, কালিন্দী, তামসতপস্যা, নাগিনী কন্যার কাহিনী এর যে কোনো একটি বই বা সব কটি বইকে একত্রে নিয়ে সেই সূত্রে তাঁর উপর সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীর অভিজ্ঞান-পত্র অর্পণ করতে পারতেন ; তার জন্যে জ্ঞানপীঠের পুরস্কার ঘোষণার কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রতিনিধি-স্থানীয় বিদ্বজ্জন সংস্থা নয়, জাতীয় সরকার নয়, এক বেসরকারী শিল্পপতি গঠিত প্রাইভেট ট্রাস্টচালিত পুরস্কার কমিটির রায় প্রকাশিত হবার পর তবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খেয়াল হল, এতাবৎ তারাশঙ্করকে সংবর্ধিত না করে বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, এবারে সেই ভুল অচিরে সংশোধন করা আবশ্যক, আর এই বিলম্বিত উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অপরকে সম্মান জানিয়ে নিজেকে সম্মানিত করবার অলিখিত প্রতিযোগিতা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পিছনে পড়ে গিয়েছিল, সম্প্রতি তারাশঙ্করের বিয়োগের পর শোকাপ্লুত হৃদয়ে পাছে

মাননীয় রাজ্যপালকে পুরঃসর করে পর্বত মহম্মদের কাছে আসার মতো আগু বাড়িয়ে তারাশঙ্কর-ভবনে গিয়ে সাড়ম্বর সম্মান-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

বইয়ের ভালো মন্দ কিছু নয়, পুরস্কারের ঘটনাও এহো বাহ্য (কেননা তার অনেক আগেই তারাশঙ্কর রবীন্দ্র-পুরস্কার আর অ্যাকাদেমি-পুরস্কার লাভ করে সামাজিক স্বীকৃতির কৌলীন্য লাভ করেছিলেন), আসলে পুরস্কারের পরিমাণ হিসাবে ওই-যে এক লক্ষ টাকার ঘোষণা, ওই ঘোষণাই ওষুধের কাজ করেছে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বিত্ত-কৌলীন্যের দ্বারা বর্তমান সমাজে সবকিছু মূল্যমানের পরিমাপ হয়--আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের এই ব্যাখ্যা যে কত যথার্থ তারই একটি নিদর্শন মিলেছে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির তারাশঙ্করঘটিত আচরণের মধ্য দিয়ে। একলক্ষ টাকা! সোজা কথা তো নয়! যিনি একটি মাত্র বইয়ের সুবাদে একলক্ষ টাকা পুরস্কার পেতে পারেন তিনি একজন কেউ-কেটা লেখক নিশ্চয় বটেন, সুতরাং আর কি তাঁকে অমনোযোগের অন্ধকারে ফেলে রাখা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ঝটিতি তাঁদের পূর্ব-অবহেলার নিরাকরণপূর্বক সযত্ন-সংবর্ধনায় তারাশঙ্করকে ধন্য করলেন, নিজেরা ধন্য হলেন, চারদিকে জয়ের রোল উঠল। প্রকৃত প্রস্তাবে এর মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের খেলা পরিস্ফুট। লেখকের সাহিত্যের মূল্যের স্বীকৃতি কিংবা রসরসিকতার মানদণ্ডে শিল্পকৃতির বিচার—এসব এখানে একেবারেই অবান্তর প্রসঙ্গ। এ আসলে বিত্তের পায়ে কুর্নিশ জানিয়ে স্বল্পবিত্তের অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি লাভের vicarious pleasure অর্জনের মলিন নিদর্শন মাত্র।

গণদেবতা উপন্যাসটি শিল্পকর্ম হিসেবে নিম্নমানের সৃষ্টি। সেই তুলনায় অন্য দুই পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস হাঁসুলি বাঁকের উপকথা কিংবা আরোগ্য-নিকেতন অনেক বেশী পাঠযোগ্য উপন্যাস, যদিও সর্ত যোগ করে বলব যে নিছক শিল্পোৎকর্ষের মাপকাঠিতে এই দুটি

উপন্যাসও রাইকমল, কবি, কালিন্দী, তামসতপস্যা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাসের পাশে দাঁড়াতে পারে না। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে গ্রামের প্রান্তের নূতন শিল্প-প্রকল্পের উদ্যোগ-আয়োজনের ছোঁয়ায় পুরাতন গ্রামজীবনের অভ্যস্ত ধারার কিরূপ বিপর্যয় ঘটে তার চিত্র। কাহারদের গ্রাম হাঁসুলি-বাঁক আধা-ঘুমন্ত আধা-জাগ্রত অবস্থায় তার চিরাচরিত জীবন যাত্রার পথে গতানুগতিক সংস্কার-বিশ্বাস-আচার নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলছিল, এমন গ্রামের উপান্তে দেখা দিল কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়া। দেখতে দেখতে গ্রামের গোটা চেহারাটাই বদলে গেলো। শিল্পায়নের চাপে গ্রামীণ অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর ঘটল দৃষ্টি-গ্রাহ্য রূপান্তর। এই সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গটিই হল হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসের মূল উপজীব্য। বনোয়ারী কাহার হল পুরনো অবস্থা-ব্যবস্থা-মানসিকতার প্রতীকী চরিত্র, আর করালী হল নতুন মানসিকতার প্রতীক। রক্ষণশীলতা আর অগ্রসর মনোভাবের প্রতিমূর্তির স্বরূপ দুই চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে উপন্যাসের ঘটনাবলী আবর্তিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসের বুদ্ধিগত আবেদন যতই প্রশংসনীয় হোক, এ কথা মানতেই হবে যে বইয়ের শিল্পগত আবেদন তেমন যেন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। এই উপন্যাসটি পঞ্চাশের দশকে লেখা। সেই সময় তারাশঙ্কর নাগরিকতার বৃত্তের মধ্যে ধরা দিয়ে ফেলেছেন এবং আস্তে আস্তে লোক-সংস্কৃতির প্রভাব-বলয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাঁর ভাষাও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়ে উঠেছে। আগে যেখানে মধুস্বাদী সাধু ভাষার সহজ ও স্বাভাবিক চালে লিখতেন, সেই স্থলে অন্য দশজন বিদগ্ধ নাগরিক লেখকের দেখাদেখি সাধুভাষা ছেড়ে অনভ্যস্ত চলতি ভাষায় লিখতে শুরু করেছেন। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা চলতি ভাষায় লেখা। কিন্তু সকলকে সব জিনিস মানায় না। আচার্য প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ঐতিহ্যে পুষ্ট 'ভারতী' আর 'কল্লোল' গোষ্ঠীর নাগরিক লেখকদের

কলমে যে ভাষা সহজে আসে, সে ভাষাই লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যলালিত দেশজ ধারার কোনো লেখকের কলমে অনভ্যাসের ফোঁটার মতো চড়চড় করতে থাকে। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-র বেলায়ও হয়েছে তা-ই। চলিত ভাষায় লিখিত হলেও এর ভাষা-ভঙ্গী কৃত্রিম, আড়ষ্ট। সম্যক্ ও দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলনের অভাবের ছাপ তাতে স্পষ্ট। বৈদগ্ধ্য আর মনঃপ্রকর্ষের আবহাওয়াতেই চলিত বা কথ্য ভাষার রূপটি খোলে ভালো, পক্ষান্তরে মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা-সংলগ্ন মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির যোগে যুক্ত দেশজ ধারার ঔপন্যাসিকের লেখনীমুখে সাধুভাষার আদলটাই মানায় ভালো। তারাশঙ্কর মধ্যপর্ব থেকে নিজ লেখায় দীর্ঘকাল আচরিত সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে গিয়ে আপনার প্রতি সুবিচার করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-র রস পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়নি, শেষ অবধি ফিকেই থেকে গেছে। অনভ্যস্ত মননশীলতার সরণীতে বিচরণের চেষ্টা এরকম হওয়ার অন্যতর কারণ, ভাষার কৃত্রিমতাও এজন্য কম দায়ী নয়।

আরোগ্য-নিকেতন উপন্যাসও চলিত লিখনরীতিতে লেখা। এটিরও ভাষার চালে কৃত্রিমতা তথা জড়তা স্পষ্ট। উপন্যাসটিতে কাহিনীর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি তত্ত্ব পরিস্ফুট করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে—সেই তত্ত্ব সমন্বয়ের, সামঞ্জস্যের, যুগধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতির উদারতার। জীবন মহাশয় পুরাতন ধারার প্রতিষ্ঠাপন্ন কবিরাজ। নাড়ী টিপে অব্যর্থ রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁর। এই অমোঘ নিদান হাঁকার দক্ষতার জন্যে দূর দূর অঞ্চল থেকে তাঁর ডাক আসে। এমনি এক ডাকের সূত্রে দেখা হয়ে গেলো তাঁর মঞ্জরীর সঙ্গে, যে মঞ্জরী কিনা এখন জমিদার-বাড়ীর বধূ ও গৃহিণী। মঞ্জরীকে ঘিরে প্রৌঢ় জীবন মহাশয়ের কৈশোরের স্মৃতি মথিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল মঞ্জরীর প্রতি তাঁর এককালীন ভালোবাসার আকর্ষণের কথা। কিন্তু যৌবনস্বপ্নের স্মৃতি

মধুর হলেও তা জীবন মহাশয়কে বেচাল করে না, তার কারণ জীবন মহাশয় তাঁর দীর্ঘদিনের কবিরাজী জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক ধরনের দার্শনিক প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন যা তাঁকে সর্বাবস্থায় স্থিতধী হতে শিখিয়েছে। আর শিখিয়েছে উদার হতে। উদারতার প্রমাণ মিলল গাঁয়ে সদ্য-প্র্যাকটিস করতে আসা তরুণ এলোপ্যাথ ডাক্তারের প্রতি মনোভাবে। কবিরাজী ও এলোপ্যাথী পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী চিকিৎসা-প্রণালী। একটিতে সনাতন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত, অন্যটি পাশ্চাত্যের খাত-বেয়ে-আসা আধুনিক বিজ্ঞানের দান। দুইয়ের ভিতর সংঘাত অনিবার্য বললেও চলে। কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসক জীবন মহাশয় তাঁর আশ্চর্য উদারতার বলে নূতনকে সাগ্রহেই বরণ করে নিলেন, তাঁর জীবনদর্শনের পরিকল্পনার ভিতর একই সঙ্গে পুরাতন ও নূতনের ঠাঁই হল। কৈশোর প্রেমের মধুময় স্মৃতি এই যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পৌঁছুতে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছে, কাহিনীর গঠনের ভিতর এমনতরো ইঙ্গিত আছে।

আরোগ্য-নিকেতন উপন্যাসটি তারাশঙ্করের নিজের খুব প্রিয় ছিল। কেউ কেউ জীবন মহাশয়ের সমন্বয়ী আদর্শকে তাঁরই জীবনাদর্শের প্রতিরূপক বলে মনে করেন। এ কথা সত্যি হতেও পারে, নাও হতে পারে। যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে হবে সেই কারণেই বিশেষ করে এই উপন্যাসটি তাঁর পছন্দ ছিল। কিন্তু গ্রন্থের সমন্বয়ী তত্ত্বের ভালো-মন্দ যা-ই হোক আর কাহিনীর বিন্যাসেও যতই মনোজ্ঞতা থাকুক, এ উপন্যাসে তারাশঙ্করকে আমরা তাঁর যথার্থ স্ব-স্বরূপে পাই না। স্ব-স্বরূপ বলতে বোঝাতে চাইছি তারাশঙ্করের চারণ-কবির রূপ, বাংলার দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগযুক্ত রূপ। 'চারণ-কবি' কথাটা তারাশঙ্কর সম্পর্কে প্রথম প্রয়োগ করেন সমালোচক-প্রবর ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এটি তারাশঙ্করের যথার্থ পরিচয়জ্ঞাপক একটি অভিধা। এতে তাঁর আঞ্চলিকতা, অন্তী প্রীতি, লোকসংস্কৃতির প্রতি আত্মিক অনুরাগ,

গ্রামজীবনের প্রতি ভালোবাসা—সব কটি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছে। যদি বলেন কথাটার মধ্যে একটা গ্রামীণতার ব্যঞ্জনা আছে, যা প্রতিষ্ঠাবান্ কোনো আধুনিক লেখকের পক্ষে খুব বেশী flattering নয়; তার উত্তরে বলব, কথাটাকে তার ভালোয়-মন্দে দুই অর্থে ই নিতে হবে। গ্রামীণতা দুর্বলতারও পরিসূচক হতে পারে আবার অভ্রান্ত শক্তিমত্তারও নিদর্শন হতে পারে। বিশেষ, তারাশঙ্কর যে-জাতীয় শিল্পের চর্চা করেছেন, সেই শিল্পের অনুষঙ্গে গ্রামীণতা অশেষ শক্তিলক্ষণভূষিত হওয়া সম্ভব। আর বাস্তবিক, তা হয়েও ছিল। রাইককল আর কবি উপন্যাস দুটির সাহায্যেই আমরা এ কথা প্রমাণ করতে পারি।

২

রাইকমল তারাশঙ্করের প্রথম দিককার একটি উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। রচিত হয় তারও অনেক আগে এবং 'কল্লোল' ও 'উপাসনা' পত্রিকায় দুই ভাগে ছাপা হয় যথাক্রমে "রাইকমল" ও "মালাচন্দন" নামে। কল্লোলে তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প "রসকলি"র (১৩৩৪) সঙ্গে রাইকমলেব বিষয়বস্তুর মিল আছে—রাঢ় দেশের রুক্ষ-ধূসর প্রকৃতির কোলে বর্ধিত মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মতো স্নিগ্ধ বৈষ্ণবীয় আবেষ্টনী দুটি কাহিনীরই পটভূমি। রাইকমলের পরিবেশের সঙ্গে আর একটি বইয়ের পরিবেশের মিল দেখা যায়—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের কমললতা সংক্রান্ত আখ্যায়িকার পরিবেশের। দুইটি বইয়ের কোন্‌টি আগে রচিত হয়েছে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। খুব সম্ভব দুটি কাহিনীর পরিবেশের মিলটা আকস্মিক। রাঢ় দেশের বৈষ্ণব আখড়াগুলির সাধারণ পরিবেশ একই রকম।

বইয়ের গোড়াতেই তারাশঙ্কর রাইকমল উপন্যাসের পরিবেশের সুরটি বেঁধে দিয়েছেন তিন-চারটি অনুচ্ছেদের চমৎকার বর্ণনার সাহায্যে। পরিবেশ রচনায় লেখক যে কী পরিমাণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার নিদর্শনরূপে বর্ণনাংশের কতক উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না:

"পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ।

"এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই।' অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ।··· এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম-শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষে জানিত 'সুখ দুখ দুটি ভাই', 'সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই'।

"লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত, আজও রাখে; মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত। এখন নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু স্নানের পর এখনও মেয়েরা দিনান্তে একবারও চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। রাত্রে বাঁশের বাঁশীর সুর শুনিলে এ অঞ্চলের এক সন্তানের জননী যাহারা, তাহারা আর জলগ্রহণ করে না। মনে পড়ে পুত্রবিরহবিধুরা যশোদার কথা।······

"অধিকাংশই চাষীর গ্রাম।··· চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়—পুত্রশোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-আখড়ায় পদাবলী গান হয়, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়, ঘরের খোড়ো বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিক পাখি 'রা-ধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রা-ধা গোপী ভজ' বলিয়া ডাকে। লোকে শখ করিয়া মালতী ফুলের চারা লাগায়। প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে। কদমগাছ নাকি লাগাইতে হয়।

বর্ষায় কদম্ব-গাছগুলি ফুলে ভরিয়া উঠে, সেই দিকে চাহিয়া প্রবীণেরা অকারণে কাঁদে।"

বেশ একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলুম। সেটা আর কোনো কারণে নয়, এটা দেখাবার জন্য যে, নিসর্গ ও পরিবেশ চিত্রণে তারাশঙ্করের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর ভাষায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কম, পরিমার্জনার পালিশ নেই বললেই চলে; কিন্তু আশ্চর্য জীবন্ত তাঁর বর্ণনার হাত। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের খরার বর্ণনায় তাঁর এই বর্ণন ক্ষমতার আর এক দফা পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেখানে প্রকৃতির রুদ্ররূপের বর্ণনা, এখানে প্রকৃতির সুস্নিগ্ধ মনোময় রূপের প্রতিভাস। দুই বর্ণনাতেই লেখকের সমান কুশলতা।

রাইকমল উপন্যাসের কাহিনীটি এইরূপ:

চাষীদের ছোট একখানি গ্রামে কামিনী বৈষ্ণবীর আখড়া। স্বামী মারা যাবার পর কামিনী তার একমাত্র মেয়ে কমল ওরফে কমলিকে নিয়ে আখড়ায় বাস করে। বৈষ্ণবের সংসার ভিক্ষার অন্নে চলে। দুজনারই গাইবার গলা অতি চমৎকার। সর্বদাই পদাবলী কীর্তনের কলি তাদের মুখে ফেরে। কমলি এখনও বয়সে নিতান্ত বালিকা, গাঁয়ের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলা করে তার দিন কাটে। খেলার সাথী রঞ্জনের সঙ্গে নিত্য বরবধূর খেলা খেলতে গিয়ে কখন যে রঞ্জনের প্রতি কমলির ভালোবাসা পড়ে যায় তা বোধহয় সে নিজেই টের পায় না।

প্রৌঢ় বাউল রসিকদাস বৈরাগী মাঝে মাঝে আখড়ায় আসে মা-মেয়ের খোঁজ খবর করতে। কৃষ্ণপ্রেমে সমর্পিতচিত্ত এক সরল সদানন্দময় সংসারবিরাগী মানুষ। রসিকদাস কমলিকে গান শেখায়, নানা গল্প করে তার মনোরঞ্জন করে। কমলি বয়সের বাধা মানে না, প্রায়ই রসিক-দাসকে 'বগবাবাজী' বলে ঠাট্টা করে। রসিকদাস অবশ্য সে ঠাট্টা গায়ে মাখে না, কিশোরীর সঙ্গে তার একপ্রকার নির্মল সখ্যের সম্বন্ধ।

বয়স হতে রঞ্জন আর কমলের মধ্যে ভালোবাসা আরও পাক ধরে। সদ্গোপের ছেলে রঞ্জন কমলকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে। সে এজন্যে জাত দিয়ে বোষ্টম হতেও প্রস্তুত। রঞ্জনের মা-বাবা প্রমাদ গণে।

তারা কামিনীর কাছে এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় কামিনী যেন তার মেয়েকে নিয়ে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তাদের একমাত্র ছেলেকে যেন কেড়ে না নেয়। কামিনী গাঁয়ের বাস উঠিয়ে মেয়ের হাত ধরে নবদ্বীপ চলে যায় এবং সেখানে নতুন করে ঘর বাঁধে। কামিনীর বয়েস হয়েছে, কখন মরে যায় তার ঠিক নেই। তার একান্ত সাধ মৃত্যুর আগে মেয়েকে কারও হাতে সমর্পণ করে যায়। কিন্তু মেয়ের কাউকে মনে ধরে না, তার মন পড়ে থাকে পেছনে-ফেলে-আসা এককালীন খেলার সাথীটির জন্যে। রঞ্জনের কথা ভেবে কমলের অন্তর এক-এক সময় হু হু করে কাঁদে।

কিন্তু কামিনীর সাধ অতৃপ্ত থাকে। কমলকে পাত্রস্থ দেখার আগেই সে দেহ রাখে। দীর্ঘদিনের সাহচর্য আর স্নেহ-সম্পর্কের ফলে রসিক বাউলের চোখে কেমনযেন একটা ঘোর লাগে, সে একদিন আমতা-আমতা করে কমলের সঙ্গে তার নিজের মালা-বদলের প্রস্তাব করে বসে। কমল একটু বিস্মিত হয়। কিন্তু শেষ প্রর্যন্ত মায়ের অন্তিম ইচ্ছার কথা স্মরণ করে সে এই প্রস্তাবে রাজী হয়। মালাবদল হয়ে যায়। কিন্তু হবার পরেই আধবুড়ো বাউল বুঝতে পারে তার ভাগ্যের সঙ্গে কমলের নবীন জীবনকে এভাবে বাঁধাটা তার উচিত হয়নি, কমল এখনও অন্তরে-অন্তরে রঞ্জনকে ভালোবাসে। ফুলশয্যার রাত্রিশেষে শয্যাতাগের পর রসিকের সে কী চেহারা! "মহান্তের মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। রক্ত-মাংসের মানুষটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চল মূক—নিষ্পলক শূন্যদৃষ্টি তাহার চোখের কোলে তুইটি গভীর কালো রেখা দেখা দিয়াছে। শুষ্ক নদীর ভাঙন-ধরা তটরেখার মত বিগত বন্যার বার্তা যেন তাহাতে সুপরিস্ফুট।"

এর পর থেকে রসিক কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। এই সদাহাস্যময় মানুষটি শুষ্কতার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়। এক জায়গায় স্থাণু জীবনযাত্রা আর ভালো লাগে না, তুজনে পথে বেরিয়ে পড়ে। পথের মুক্তিতে তুজনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পড়ে কমলদের পুরনো গাঁয়ে, কী মনে করে কামিনীর পরিত্যক্ত পুরনো আখড়াতেই আবার বাসা বাঁধে। তুজন তুটি আলাদা ঘরে আস্তানা

পাতে। দিনে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহের পূজা, গান গেয়ে ভিক্ষা, সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর—দিনগুলি বাঁধা লয়ে একপ্রকার কেটে যায়। কমল তার বাল্যসখী 'ননদিনী' কাতুর কাছে জানতে পেরেছে রঞ্জন এক বোষ্টমীর মেয়েকে (পরী) বিয়ে করে দেশান্তরী হয়েছে। লজ্জায় ক্ষোভে রঞ্জনের বাবা-মা কাশীবাসী হয়, সেখানেই মারা গেছে। কমলের মনটা উদাস হয়ে যায়। আখড়ার দিনযাত্রায় সে আর কোনো রসই খুঁজে পায় না। রসিক কমলের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে। সেও কেমন হয়ে যায়। কমল রসিকের জন্য দুঃখ অনুভব করে, ভাবে মানুষটার এই পরিণতির জন্য সে-ই দায়ী। যে ছিল দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, সে কিনা এখন তুচ্ছ একটি নারীর জন্য সাধন ভজনের পুণ্য সব খোয়াতে বসেছে। সভয়ে রসিককে প্রশ্ন করে, "এত বড় পাপ আমার মধ্যে আছে যে, আমার মুখ মনে করলে গোবিন্দের মুখ মনে পড়ে না মহান্ত ?" রসিক নতমুখে বসে থাকে। কমল বলে চলে, "তোমার আগুনে তুমি কতটা পুড়লে তা জানি না মহান্ত ; কিন্তু পুড়ে মলাম আমি।"

পরদিন আর রসিককে আখড়ায় দেখা গেল না। কমল বুঝতে পারে, রসিক আর ফিরে আসবে না , সে কমলকে মুক্তি দিয়ে গেছে। যাবার সময় কমলের দোরগোড়ায় রঙিন কাপড়ে বাঁধা ছোট একটি পুঁটলি রেখে গেছে, কমল খুলে দেখলে, লাল পদ্মের পাপড়ির শুকনো একগাছি মালা। মালাগাছি হাতে করে সে নীরবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনে মনে বললে, "সে পাক, তার শ্যামকে সে ফিরে পাক।"

এর পরের ঘটনা আরও কারুণ্যের দিকে মোড় নিয়েছে। কাহিনীর শেষটি অতীব বেদনাগাঢ়। বছর দুই পর জয়দেবের শ্যামচাঁদের দরবারে যাবার পথে এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে অপ্রত্যাশিত পরিবেশে রঞ্জনের সঙ্গে কমলের দেখা হয়ে যায় (এই আকস্মিক দেখা-হওয়াটা একটু অতি-নাটকীয়, মেলোড্রামার আমেজ লেগেছে এখানটায়)। রঞ্জন কমলকে নিজ আখড়ায় নিয়ে আসে। পরীর তখন শেষ অবস্থা। রোগে ভুগে

মৃত্যুশয্যা থেকেই কমলকে যা-তা করে গাল পাড়তে লাগল। (রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' উপন্যাসের মৃত্যুপথযাত্রিণী নীরজার কথা মনে করিয়ে দেয়। পরী যেন নীরজা, কমল যেন সরলা)। এর পরের ঘটনা প্রবাহের গতি বিস্তারিত অনুসরণ করবার আবশ্যকতা নেই, শুধু এই বলাই যথেষ্ট যে, কমলের ভাগ্যের পরিণতি বড়োই দুঃখাবহ। ভালোবাসার ব্যর্থতার ট্রাজেডিতে তার জীবন হাহাকারময় হয়ে উঠল। সে দেবতাকেও হারালো, দয়িতকেও হারালো।

একটু বিস্তৃতভাবেই উপরে কাহিনীর রূপ-রেখাটি তুলে ধরা হলো। আর কোনো কারণে নয়, এটা দেখাতে যে, বাংলার লোক-সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সাযুজ্যময় বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী পরিবেশনেই ছিল তারাশঙ্করের প্রতিভার সর্বাধিক সাধর্ম্য ও স্বাভাবিক স্ফূর্তি। যেখানেই এ করার বদলে উপন্যাসের প্লট-বিন্যাসে ও চরিত্র-পরিকল্পনায় তিনি নাগরিক লেখক-জনোচিত মননশীল উপকরণ অনুপ্রবিষ্ট করাতে চেয়েছেন, সেখানেই তাঁর রচনার শিল্পোৎকর্ষ ব্যাহত হয়েছে। হয়তো সে সব রচনায় বুদ্ধির স্বাদ পাওয়া গেছে কিন্তু কবিতা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কবিতাই ছিল তারাশঙ্করের স্বক্ষেত্র, আর তাঁর সেই সব উপন্যাসই শ্রেষ্ঠ শিল্পসৌন্দর্যের মর্যাদা পেয়েছে যাদের ভিতর কবিতা আছে।

উপরে কাহিনীর ও চরিত্রের যে ছকটি আঁকা হয়েছে তার থেকে নিশ্চয় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, কাব্যস্বাদে বইখানি ভরপুর। এর পরিবেশের মধ্যে কবিতা, চরিত্রের ছাঁচের মধ্যে কবিতা, ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে কবিতা। কবি উপন্যাসটি সম্পর্কেও একই কথা। তারাশঙ্করের রচনার এই কাব্যগুণের দিক্‌টার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন আচার্য মোহিতলাল মজুমদার, তার পরেই বোধহয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য সমালোচকেরা কম-বেশী সকলেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রচনার আলোচনা করেছেন। ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের উপর তাঁর গবেষণা-পুস্তকটিতে "রসকলি" গল্পটির সূত্রে রাইকমল ও কবি উপন্যাসদ্বয়কে "রোমান্টিক টেল" আখ্যায়

আখ্যাত করেছেন। তাঁর আলোচনার ধারা থেকে মনে হয় তিনি এই দুটি উপন্যাসের স্নিগ্ধ মাধুর্যকে তারাশঙ্করের অভ্যস্ত ধারার ব্যতিক্রমী নমুনা রূপে তুলে ধরতে চান। তিনি তারাশঙ্করের অভ্যস্ত ধারা বলতে বুঝিয়েছেন বীরভূমের কঙ্করাস্তীর্ণ গেরুয়া-মৃত্তিকা কর্ষিত রুক্ষ-কঠোর প্রকৃতির রুদ্র সৌন্দর্য আর তারই কোলে বর্ধিত সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের নরনারীদের প্রেমজীবনের দিক, সেই আদিম জান্তব ক্ষুধার বর্ণনায় তাঁর সহজাত কুশলতার অভ্যাস। অর্থাৎ কি নিসর্গচিত্রণে কি চরিত্ররূপায়ণে, কল্পনা ও অনুভবের পরুষ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলাতেই যেন তাঁর লেখনীর স্বভাবস্ফূর্তি। এ কথা ছোটগল্পের বেলায় বহুলাংশে সত্য হলেও উপন্যাসের বেলায় বোধহয় পুরাপুরি সত্য নয়। তা যদি হতো তো রাইকমল ও কবি-র মতো কাব্যের স্বাদুতায় ভরা প্রেমের উপন্যাস তিনি লিখতে পারতেন না। কবিতে বরং তবু বেশ কিছুটা পরিবেশগত মালিন্য আছে, কিন্তু রাইকমল আগাগোড়া স্নিগ্ধ মাধুর্যভরা বেদনার আলেখ্য। নিরবচ্ছিন্ন কবিস্বভাববিশিষ্ট লেখক ছাড়া কারও লেখনীমুখে এমন রচনা নিঃসৃত হতে পারত না।

৩

কবি উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। তার পর বই-খানির পর পর অনেকগুলি সংস্করণ হয়। চলচ্চিত্রেও এর একখানি মনোজ্ঞ সংস্করণ রূপায়িত হয় সদ্যলোকান্তরিত প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায়। বইখানি মঞ্চ-সাফল্যও লাভ করে। এই সব নানা লক্ষণ থেকে বোঝা যায় উপন্যাসটি প্রভূত জন-সংবর্ধনা লাভে ধন্য হয়েছিল।

এইরূপ ব্যাপক জনপ্রিয়তার হেতু কী। এই প্রশ্নের একটাই উত্তর : কবি একটি আশ্চর্য-মধুর প্রেমকাহিনী। বইটির দুটি আখ্যান-ভাগ। দুটি আখ্যান-ভাগকে এক সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে উপন্যাসের নায়ক কবিয়াল নিতাইচরণের উভয় ভাগেই বিচরণের দ্বারা। (এরূপ দুই

কাহিনীকে সমধর্মিতার কারণে একত্র গ্রথিত করার নজির তারাশঙ্করের লেখায় আরও আছে ঃ সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ—নাগিনী কন্যার কাহিনী)। প্রথম আখ্যায়িকার কেন্দ্রবিন্দু ঠাকুরঝি, যাকে ঘিরে কবিয়ালের নিষ্কলুষ নবীন প্রেম আলোড়িত হয়েছে ; দ্বিতীয় আখ্যায়িকার মধ্যমণি ঝুমুরওয়ালি বসন্ত বা বসন, যার উত্তপ্ত ভালোবাসার বন্ধনে ধরা দিয়ে কবিয়ালের পূর্ব-সংস্কার সব ভেসে গিয়েছে, জীবন হয়ে উঠেছে অস্তিত্বের সার্থকতার চেতনায় মঞ্জরিত। বসন পেশায় রূপোপজীবিনী, ঝুমুর গানের ফাঁকে ফাঁকে ঝুমুরওয়ালীদের দেহ ব্যবসাও চলে। বার-বণিতার প্রেমে গ্লানি আছে কিন্তু যেহেতু কবিয়ালের প্রেমে কোন খাদ ছিল না, উপরন্তু তা ছিল নিঃস্বার্থ সেবার মাধুর্যে মণ্ডিত, সেই কারণে দেহব্যবসায়িনী এক পণ্যা নারীকে ভালোবেসেও কবিয়ালের মনুষ্যত্বের অপহ্নব ঘটেনি, বরং তারাশঙ্করের লেখনীতে কবিয়ালের চরিত্র এক সুউচ্চ মহিমায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। অকপট অপাপবিদ্ধ আন্তরিক প্রেমই সেই পাবক, যা নিতাই ও বসনের যুগ্ম জীবনযাত্রার আবেষ্টনীর মালিন্যকে সর্বাংশে শোধিত করে দিয়েছে। পরিবেশের মধ্যে আবর্জনা-ময়লা থাকে, কিন্তু অন্তরে যদি লাগে খাঁটি প্রেমের রঙ, দুর্নিবার আকর্ষণের জাদু যদি চিত্তকে করে তোলে পরস্পরের প্রতি যথার্থ উন্মুখ, তা হলে ওই আবর্জনার কালিমা হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। বসন ও নিতাইয়ের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কবি তারাশঙ্কর এই তত্ত্বটিই সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন।

উপন্যাসটির গঠনগত কিছু ত্রুটি আছে। ত্রুটি ওই পূর্বকথিত দ্বিভাজনের জন্য। প্রথম ভাগে ঠাকুরঝি, দ্বিতীয় ভাগে বসন—কবিয়াল দুটি ভাগেই যতো প্রবলভাবেই উপস্থিত থাকুক-না কেন, মনে হয় যেন দুটি আখ্যানকে জোড়াতাড়া দিয়ে একত্র সংলগ্ন করা হয়েছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কার্যকারণগত কোন যোগ নেই। মানুষ জীবনের পথে চলতে গিয়ে পর পর নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, সেই নজিরে সব অভিজ্ঞতাকে একই বৃত্তের অন্তর্গত করা চলে না, অন্তত এক শিল্প-বৃত্তের মধ্যে তো করাই চলে

না, যদি-না ভাবের ধারাবাহিকতা থাকে। ঠাকুরঝির ভালোবাসা আর বসনের ভালোবাসা দুটি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেমের জগৎ—দুইয়ের মধ্যে দৃশ্যত কোন মিলই নেই। ঠাকুরঝির সঙ্গে যখন নিতাইয়ের পরিচয় হয় তখন নিতাই সবেমাত্র কবির দলে ভর্তি হয়েছে, কবিয়াল রূপে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করেছে। কবিয়ালকে রোজ দুধ যোগাবার সূত্রে ভিন্ন গাঁয়ের চাষী ঘরের বধূ ঠাকুরঝি তার জীবনবৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে। সম্পর্কে সে কবিয়ালের বন্ধু ছোট লাইনের রেলের পয়েন্টপম্যান রাজনের শ্যালিকা। এইটাই পরিচয়ের প্রাথমিক সূত্র। পরিচয় ক্রমে নিষ্পাপ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। কবিয়ালের প্রতিভায় ঠাকুরঝি মুগ্ধ। আসরের একহাট লোকের মধ্যিখানে মানুষ মুখে মুখে ছড়া বানিয়ে তখন-তখুনি সুর-তাল-লয় যোগে কেমন করে সেটা গাইতে পারে ভেবে ঠাকুরঝির বিস্ময় অবধি মানে না। অশিক্ষিতা গ্রামীণ বালিকার সরল বিশ্বাসে সে কবিয়ালকে মনে করে তার জানা-চেনা আত্মীয়-পরিজনদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জগতের মানুষ এবং অন্তরের সেই বিমুগ্ধ আবেগে কবিয়ালের প্রতি তার হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা উজাড় করে ঢেলে দেয়। অথচ কবিয়াল কিছু তাদের থেকে আলাদা শ্রেণীর জীব নয়, সে তাদেরই মতো গ্রাম-সমাজ থেকে উদ্ভূত, ডোমের ছেলে, লেখাপড়া সামান্যই শিখেছে, তার বাপ-ঠাকুরদার আমলে চুরি-ডাকাতিটাই ছিল তাদের কৌলিক পেশা, কবিয়ালই প্রথম বংশের ধারা উল্টিয়ে অন্তরের সহজ টানে নির্বিরোধ নিরীহ এই কবিয়ালের বৃত্তি গ্রহণ করেছে। মানুষটিও খুব ভালো—নেশা-ভাঙ করে না, চারিত্রিক দুর্বলতা নেই, ঠাকুরঝির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অন্যায় সুযোগ সে কখনও নেয় না বরং তার কারণে বিবাহিতা ঠাকুরঝির সুখের সংসারে যাতে ভাঙন না ধরে সেইজন্যে সর্বদাই সে ঠাকুরঝির কাছ থেকে সযত্ন দূরত্ব রক্ষা করে চলে, মনে মনে প্রার্থনা জানায়, স্বামী-সন্তান নিয়ে এই সুশীলা শান্তস্বভাবা সরলপ্রাণা বালা সুখে থাকুক, সে দূর থেকে ভালোবেসেই তৃপ্ত।

ঠাকুরঝির গায়ের রঙ ছিল কালো। রাজন এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা-

পরিহাস করত। বর্ণের কৃষ্ণত্ব নিয়ে সুঠামগঠন এই মেয়েটির মনে দুঃখের অন্ত ছিলো না। সেই দুঃখ ভোলাবার জন্যেই কবিয়ালের বিখ্যাত গান :

কালো যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।
কালো কেশে রাঙা কোসম (কুসুম)
হেরেছ কি নয়নে ?

অপূর্ব গান। এমনতরো একাধিক সুন্দর রচনা কবি উপন্যাসের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। বস্তুতঃ, এই গানগুলি এ বইয়ের এক আশ্চর্য সম্পদ। তারাশঙ্কর যে লোকগীতি রচনায় কতো সিদ্ধশিল্পী ছিলেন গানগুলি তার জ্বলজ্যান্ত নিদর্শন। আমাদের শুধু আক্ষেপ তারাশঙ্কর এ রকম মধুর গান আরও কেন লিখে গেলেন না ! ঠাকুরঝির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশায় পাছে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের দাগ লাগে সেই আশঙ্কার ভাবের দ্যোতক যে-গানটি কবিয়াল বেঁধেছিল তার কয়েকটি চরণ এইরূপ :

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল রে ! ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ তোমার লাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।
চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।

ঠাকুরঝির সঙ্গে পাপলেশহীন নীরব স্নিগ্ধ ভালোবাসাবাসির লীলা যখন প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে গাঁয়ে এলো এক ঝুমুরের দল আর তার সঙ্গে এলো ঝুমুরওয়ালি বসন। ঘটনার পটপরিবর্তন হলো। ঝুমুর গানের শেষে একরাত্রে শ্রান্তক্লান্ত অসুস্থ বসন নিতাইয়ের বিনা অনুমতিতেই নিতাইয়ের ঘরে ঢুকে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। নিতাই তখন ঘরে ছিল না, আসরে তখন গান করছিল। আসর থেকে ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড—ঝুমুর দলের সেই খরধার লজ্জাসংকোচহীনা

নৃত্যগীত পটিয়সী মেয়েটা তার বিছানা দখল করে শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নিতাই সেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঝুমুর-আসরের শ্রোতাদের মধ্যে ছিল ঠাকুরঝি। বাড়ী ফেরার পথে এ দৃশ্য দেখে আচম্বিতে তার অন্তর্জগতে এক বিপ্লব ঘটে গেল। ছি, ছি, তার সাধের কবিয়াল তবে এই চরিত্রের মানুষ! একটা স্বৈরিণীকে নিয়ে ঢলাঢলি করে! অথবা, তার অন্তরে সেই সময়ে ঘৃণার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় একটা ঈর্ষার দাহও মিশ্রিত ছিল: প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মানুষ অন্য নারীর কুহকে মজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায় প্রতি নারীর মনেই যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগে তারই দহনে বোধহয় ঠাকুরঝির হৃদয়টা তখন পুড়ে যাচ্ছিল। খতিয়ে দেখলে, ঘৃণার চেয়ে ঈর্ষাকাতরতাটাই সম্ভবত বেশী ছিল। ঠাকুরঝি সেই যে বাড়ী ফিরে ফিটের ব্যামোয় পড়ল, সেই অসুখ আর তার সারল না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা পাগল হয়ে গেল।

একটু হয়তো মেলোড্রামাটিক, কিন্তু গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে এমন ঘটনা কি ঘটে না? সাহিত্যের চিত্র অপেক্ষা সত্যিকার বাস্তব জীবনের ঘটনা কি সময়ে সময়ে আরও বেশী ক্রূর, আরও বেশী বিয়োগান্ত পরিণামের দিকে বাঁক নেয় না? পরিণামটা সাহিত্যিক প্রতীতিযোগ্যতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কিনা সেইটেই হলো প্রশ্ন। মনে হয় হয়েছে, তবে ঠাকুরঝির অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাবটি আরও পরিস্ফুট করে তোলার অবকাশ ছিল, এ কথা বলতেই হবে।

ঠাকুরঝির চোখে বসনের সঙ্গে কবিয়ালের ঘনিষ্ঠতা যতোই দূষ্য হোক, কবিয়ালের দিক থেকে কিন্তু সম্পর্কটির মানে অন্যরকম দাঁড়ায়। নিতাইয়ের পক্ষে ঠাকুরঝির প্রতি অন্তরে প্রেম পোষণ করাটাই বরং সামাজিক বিচারে অধিক দূষ্য। কারণ ঠাকুরঝি বিবাহিতা নারী, পরস্ত্রী। বসনের সম্পর্কে একরকম কোন সামাজিক বাধা নেই, যদিও বারনারীর সঙ্গে প্রেম গ্লানিকর, আদৌ সম্মানার্হ নয়। যাই হোক, ঝুমুরওয়ালি বসনের সঙ্গে কবিয়ালের কাব্যের গাঁটছাড়া বাঁধা হওয়ার পর থেকে কবির জীবনের স্রোত এক নতুন খাতে বইতে শুরু করল। এ জীবনে

আছে উত্তেজনা, নেশা, মত্ততা, মত্ততার অবসাদ। বসনের দুকূলপ্লাবী ভালোবাসা নিতাইকে তার পূর্বজীবনের অভ্যাস ও আচার থেকে উৎপাটিত করে বন্যাস্রোতে ভাসিয়ে নিতে চাইলে। বসন মুখরা ব্যঙ্গনিপুণা, তার কুটিল কটাক্ষে বিদ্যুৎ চমকায়, লজ্জা সংকোচ তার কম, প্রায়ই মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে। এই উদ্দাম জীবনধারার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে এমন যে ভালোমানুষ নিরীহ ভদ্র নিতাই, তার মধ্যেও যেন এক ধরনের বন্যতার আমেজ এলো। কিন্তু অত্যাচারে অত্যাচারে বসন যখন কুৎসিত ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়লো, শয্যা নিলে, কবিয়ালের তখন অন্য রূপ। সে রাত জেগে রুগ্নার সেবা করতে লাগলো, ঘা ধুয়ে দিলো, বিছানা নিকোলো, আরও কতকি। সে এক অবিশ্বাস্য সেবা! কোন পণ্যা নারীর জন্যে যে কেউ এতদূর আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিতাই আশপাশের সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করলে। ভালোবাসার জাদুতেই এই ত্যাগ সম্ভব হয়েছিল। তাই তো সে গান বাঁধতে পেরেছিল এই বলে—

> এই খেদ আমার মনে মনে।
> ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
> (হায়) জীবন এত ছোট কেনে।

কিন্তু বসনকে বাঁচানো গেল না। কুৎসিত ব্যাধির প্রকোপ তার উপর কালান্তক যক্ষ্মা ভিতরে ভিতরে তাকে একেবারে ক্ষয়ে এনেছিল। নিতাইয়ের কোলে মাথা রেখে সে মৃত্যুর চির-সুষুপ্তিতে ঢলে পড়লো।

কবি উপন্যাসের বর্ণিত পরিবেশ রাইকমলের তুলনায় ভিন্নতর—তাতে আছে ক্লিন্নতা, সমাজ-অসম্মত জীবনযাত্রার ধারার চিত্রণ, ব্যাধি মালিন্য, মত্ততা, অসুস্থতা। কিন্তু এ সব বিমর্ষ বহির্লক্ষণের তলা দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে অনাবিল ভালোবাসার সুস্থির সুস্থ প্রবাহ। এখানে সব ক্ষতের আরোগ্যের নিদান রয়েছে প্রেমের বিশল্যকরণী লতাটির মধ্যে। জীবন ও মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের মহিমাগাথার উদ্‌ঘোষণেরই আর এক নাম হলো কবি উপন্যাস।

চতুষ্কোণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যশিল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যশিল্পের প্রকৃতি নিরূপণ এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথাটা কেন মনে হলো সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরে আমি তাঁর জীবন ও সাহিত্যকৃতির পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখি। প্রথমে 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়, পরে আমার 'সমকালীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই প্রবন্ধে একথা ঠিকই বলা ছিল যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে আদর্শনিষ্ঠ সৎ ও চরিত্রবান্ লেখক; কিন্তু তাঁর রচনার প্রকৃতি নির্ধারণে আমার বিশ্লেষণ, এখন বুঝতে পারি, ঠিক পুরোপুরি লক্ষ্যভেদী হতে পারেনি। এই লক্ষ্য বিচ্যুতির একটা কারণ বোধহয় এই ছিল যে, তখনও পর্যন্ত অল্পবিস্তর এই ধারণার বশে লেখনী চালনা করতাম যে, সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশালে সাহিত্যের পতন হয়। এখন আর আমি তা মনে করি না, মনে করবার কোনো কারণও দেখি না। আজকের দিনে, সাহিত্য, বস্তুত আমাদের সমস্ত জীবন, রাজনীতির সঙ্গে এমন জড়িয়ে-মিশিয়ে গেছে যে, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য করাই একপ্রকার অসম্ভব, আর করলেও সেটা জীবননিষ্ঠ সাহিত্য হবে না, হবে মৃত্তিকা বিচ্ছিন্ন অমূল তরু-সদৃশ একটা অবাস্তব সৃষ্টিকার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকে, তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভেই, এ কথাটা বুঝেছিলেন, আমাদের বুঝতে আরও সাড়ে-তিন দশক চার-দশক সময় লাগলো—এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। যে তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে আলোড়িত-মথিত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আজ আমাদের বুঝতে বাকী নেই, রাজনীতি জীবনের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত,তাকে পাশ কাটিয়ে,এড়িয়ে, সাহিত্য করবার চেষ্টা অবাস্তবতার চরম—মানিক তাঁর মৌলিক মানসগঠনের সহায়ে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেই সেটা ধরতে পেরেছিলেন। এই পচা-গলা-পোকায় খাওয়া অসাম্যপীড়িত সমাজ বাইরে একটা মেকী ভদ্রত্বের ঢঙ বজায় রেখে ভিতরে ভিতরে যে চূড়ান্ত অবিচার অন্যায় আর শোষণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে আর বহুর লাঞ্ছনা ও বঞ্চনায় গড়ে-ওঠা মুষ্টিমেয়ের প্রাচুর্যের বদহজমে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—দিবালোকের মতো এ সত্য তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছিল তখনি, যখন আমরা, ওই কী বলে, কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের অবাস্তব রোমান্টিক মুক্তি-পিপাসাকে মুক্তির শেষ সীমা বলে ভাবতে শিখেছিলাম, এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত‘পরিচয়’পত্রিকার পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের চেকনাই-কর্ষিত শৌখীন বনেদিয়ানাকে সাহিত্যিক আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয়েছিল আমাদের। কী ভুলই আমরা করেছিলাম! কিন্তু হায়, তার চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, মানিক তাঁর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করে আমাদের চোখের দৃষ্টি খুলতে চাইলেও আমরা অনেককাল চোখে ঠুলি এঁটে থাকতেই ভালবেসেছি, যতদিন না অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য বিসদৃশ সব রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর আঘাতে-সংঘাতে আমাদের চোখের ঠুলি আপনা থেকেই খসে গেছে, আমাদের মোহমুক্তি ঘটেছে। মানিক বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার রিয়ালিজমের শুধু প্রবর্তকই নন, শ্রেষ্ঠ রূপকারও বটে।

তবে অস্বীকার করব না, মানিকের অতিরিক্ত ব্যবচ্ছেদ-প্রবণতা, চিড়ে-ফেঁড়ে সব-কিছুর মূল অনুসন্ধান করবার প্রবৃত্তি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানুষের প্রত্যেকটি ভাবনা ও আচরণের কার্য-কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা—এসব অভ্যাসকে তখনও আমি খানিকটা ভয়ের চোখে দেখতাম, এখনও দেখি। তার কারণ আর কিছুই নয়, মানিকের এই দুরারোগ্য অঙ্গচ্ছেদ-প্রবণতা, এই প্রতি কথা ও কাজের পিছনে motive সন্ধানের বাতিক, তাঁকে বাংলার কথাসাহিত্যের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে দুরূহ লেখকে

পরিণত করেছে। (ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ, অনুধাবনযোগ্য লেখক, সেই কারণেই সম্ভবতঃ সবচেয়ে কম জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে মানিককে বিচার করার মতো ভুল আর কিছু হতে পারে না।)

তুরূহতা রচনার একটা গুণ নয় দোষ: তা পাঠককে সহজেই ক্লান্ত করে তোলে, কাহিনীর ক্রম অনুসরণে পাঠকের ভিতর যে একটা স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাকে দমিয়ে দেয়। গল্পপ্রিয় পাঠকের কৌতূহলকে পীড়ন করবার এ একটা নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া বিশেষ—এই পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্তর্দেশ সন্ধানের অভ্যাস। এই ক্লান্তিকর ব্যবচ্ছেদী প্রবণতাকে মানিক তাঁর বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক রচনায় এই বলে সমর্থন করেছেন যে, তিনি ছিলেন কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র, সেই বিজ্ঞান-পড়া মনই তাঁকে মানুষের অন্তর চিড়ে-ফেঁড়ে বিশ্লেষণ করার দিকে অবধারিতভাবে টেনে নিয়ে গেছে।

এই ব্যাখ্যায় আমার মন সম্পূর্ণ সায় দিতে চায় না। বিজ্ঞান পড়লেই যদি মানুষ সাহিত্য রচনায় ব্যবচ্ছেদী প্রবণতার দিকে ঝুঁকত তো আমাদের সাহিত্যে যতো বিজ্ঞান-পড়ুয়া লেখক আছেন তাঁরা সব এক-এক জন বিশ্লেষণী আর ব্যবচ্ছেদী প্রতিভার কেষ্টবিষ্টু হতেন। অথচ কার্যত তার উল্টোটাই দেখি। একজন প্রবীণ বিজ্ঞান-পড়ুয়া লেখককে জানি, যিনি বাংলা ভাষায় গুরুবাদী ভক্তিনির্ভর সাহিত্যের অবতার-বিশেষ। বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ একাধিক শাঁসালো বিজ্ঞানী আমাদের মধ্যে রয়েছেন, যাঁরা ব্যক্তিজীবনে তাবিচ-কবচের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন এবং মঠ-মন্দিরে সাধু-মোহান্তদের পায়ে মাথা না ঠেকালে যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ষোলকলা পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞান পড়ার সঙ্গে, অন্ততঃ যেভাবে বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া ও লওয়া হয় তার সঙ্গে, সাহিত্যিক ব্যবচ্ছেদী বৃত্তির কোনোই সম্পর্ক নেই। ওটা মানিকের মনের ভ্রম মাত্র। বিজ্ঞানকে আত্যন্তিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে একটা fetish-এ পরিণত করেছিলেন বলা যায়। এ ব্যাপারে এক ধরণের আবেগ—obsession—তাঁকে পেয়ে বসেছিল

বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। তাঁর নিজের রচনাতেই তিনি বলেছেন ছোটবেলা থেকেই তিনি 'কেন' নামক মানসিক রোগে ভুগতেন, এই রোগ বিজ্ঞান পঠনের সূত্রে আসেনি।

ওসব বিজ্ঞান-পড়া-টড়া কিছু য়, আসলে মানিক সহজাতভাবেই ছিলেন বিশ্লেষণী প্রতিভার অধিকারী, অপরিসীম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। বিজ্ঞান সেই বৈশিষ্ট্যের উপর একটা উপর-পালিশ দিয়েছিল মাত্র। তাঁর প্রখর তলাতিশায়ী দৃষ্টি জীবনের এবং মানুষের একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত বেধ করে দেখতে জানত। দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট দুইয়েরই পক্ষে অস্বস্তিকর এই মর্মভেদী মনোযোগের কবল থেকে রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি কারুরই রেহাই ছিল না। প্রতিষ্ঠানকে বিচার করতে গেলেই তিনি তাঁর motivationটা আগে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন, মানুষের সান্নিধ্যে এলে তিনি তাঁর আচরণের খুঁটি-নাটি, এমনকি চিন্তা-ভাবনার সূক্ষ্মতম ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন তলিয়ে বোঝবার। এমন লেখক নিজের জালেই যে নিজে আবদ্ধ হয়ে গেছেন—তাঁর ওই শোধনের অতীত মর্বিড-ধর্মী মনঃসমীক্ষণের অভ্যাসের জালে।

বলাই বাহুল্য যে, এই অভ্যাস লেখকের পক্ষে আরামদায়ক হয়নি। তিনি গল্পোপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রগুলির মন অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে যেমন এক ধরণের নিষ্ঠুর সাদীয় (sadistic) উল্লাস বোধ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে যন্ত্রণাও ভোগ করেছেন বড়ো কম নয়। যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এই কারণে যে, এই অভ্যাসকে অতিক্রম করবার তাঁর কোনো উপায় ছিল না, ওটা তাঁর স্বভাবের মজ্জার মধ্যে ছিল নিহিত। যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে ইচ্ছা করলেও অতিক্রম করা যায় না, অলঙ্ঘনীয় নিয়তির মতো যা রাহুর প্রেম হয়ে সর্বদা পিছু পিছু ফেরে, তা লেখকের মনোজীবনের বিস্ময়কর সমৃদ্ধির কারক হলেও তা একই সঙ্গে যন্ত্রণারও কারক। নিজেকে নিজে ডিঙ্গিয়ে যেতে না পারার যে অক্ষমতা, সেই অক্ষমতায় এই যন্ত্রণার জন্ম।

কিন্তু একই সঙ্গে এই বিষামৃতের অভিজ্ঞতা ভোগ করা ছাড়া মানিক

আর কী-ই বা করতে পারতেন। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টিকার্যে তাঁর আনন্দ; কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থাকে উপলক্ষ করে সৃষ্টি, সেই সমাজ-ব্যবস্থাটি যে ভিতরে ভিতরে ঘূণ ধরে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, সেই ফোঁপরা ঝরঝরে দোমড়ানো-মোচড়ানো সমাজের রূপায়ণে গরলপানের অনুভব ছাড়া তাঁর আর কীই বা অনুভব হতে পারে? এ সমাজের আসল চেহারাটা যে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল, জানা হয়ে গিয়েছিল! তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর অভ্রান্ত মনন দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সমাজের বাইরে একটা ভদ্রতার আবরণ আছে ঠিক কিন্তু ভিতরে চলেছে মিথ্যার কারবার—পরস্পরের মধ্যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা, স্বার্থান্ধতা, পরকে দুপায়ে মাড়িয়ে যেনতেনপ্রকারেণ আত্মসুখ চরিতার্থ করবার স্পৃহা, শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার অবিচার ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি বিচিত্র মানসিকতা ও আচরণে মিলে গোটা সমাজ জীবনটাই হয়ে উঠেছে একটা ক্রূরতার লীলাক্ষেত্র। যে-শিল্পীর মর্মবিদ্ধকারী অন্তঃসঞ্চারী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে যে, এ সমাজে ভদ্রলোকরাই হচ্ছে সবচেয়ে ছোটলোক, সেই শিল্পী কেমন করে ভদ্র-শ্রেণীর তথাকথিত প্রেম আর বিবহ আর আনুষঙ্গিক অন্যান্য জীবন-বিলাস নিয়ে অপরাপর মধ্যবিত্ত লেখকদের ধরনে মিষ্টি-মিষ্টি প্রেমের গল্প ফাঁদবেন? যেখানে অগণিত মানুষের বেঁচে থাকার বিড়ম্বনার মর্মান্তিক দৃশ্যের উপরে পদে পদে হোঁচট খেয়ে পড়তে হয় আর ভোগ করতে হয় অন্তহীন দুঃখ-বেদনা, সেখানে কল্পিত এক আনন্দ আর সৌন্দর্যবাদের বন্দনাগানে কেমন করে মুখর হয়ে ওঠা সম্ভব?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার ওই-যে দুরারোগ্য ব্যবচ্ছেদী অভ্যাসের কথা বলেছি, যা তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্প ও উপন্যাসকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, সে কি আর অমনি তাঁকে আশ্রয় করেছিল? যে শিল্পীর মোহভঙ্গ হয়ে গেছে, বাইরের চোখ ঝলসানো প্রতিমার অন্তরালবর্তী খড়কুটার স্থূল কাঠামোটি যাঁর চোখে ধরা পড়ে গেছে, তাঁর বেলায় এ তো হতেই হবে। তিনি পচনশীল সমাজের এই অবক্ষয়ী মানুষদের মন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ না করে করেন কী, 'ভদ্র'

নরনারীর অসার প্রেমকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ না করে কি তাঁর যো আছে? নইলে যে নিজের কাছেই নিজেকে তিনি কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন না। আর সেই সঙ্গে, সমাজের যত নির্যাতিত শোষিত স্তরের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ আছে তাদের যে তিনি ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান, সংগ্রামশীল হ'তে বলেন, তারও মূল রয়েছে তাঁর ওই মোহভঙ্গের মধ্যে। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রগতিশীল ভূমিকার বিষয়ে যে কথাটা খুব বড় করে বলা হয়, সেটা যে আসলে একটা শূন্যগর্ভ বুলি মাত্র, মধ্যবিত্তদের স্বীয় শ্রেণীগত আত্মাভিমান স্ফীত করবার একটা প্রকরণ, তা তাঁর চাইতে আর কে বেশী গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন? আর তাই তো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে ধীরে ধীরে মনোযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে তিনি সংগ্রামী শ্রমিক আর কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আর তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমেই বেশী বেশী মাত্রায় তাঁর রচনার উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। এখানেও মনোবিশ্লেষণ বাদ পড়েনি, কিন্তু তার পিছনে আছে একটা সুস্পষ্ট গঠনমুলক লক্ষ্য। তিনি নীচুতলার সংগ্রামী মানুষদের সামনে এই পচা-গলা পোকায়-খাওয়া অধঃপতিত সমাজ-কাঠামোটিকে গুঁড়িয়ে ফেলে তার ভগ্নাস্থির উপর নূতন সমসমাজের ভিত্ গেঁথে তোলার আদর্শ রেখেছিলেন। এদের বেলায় নিছক মনোবিশ্লেষণের খাতিরেই তিনি মনোবিশ্লেষণ করেন নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'। কিন্তু তার আগেই তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটি লিখেছিলেন। যদিও দিবারাত্রির কাব্যের প্রকাশকাল জননীর পরে। দিবারাত্রির কাব্য মানিকের একুশ বছরের রচনা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবি, একুশ বছরে এমন যাঁর পরিণত মনন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, সুগঠিত ভাষার বাঁধুনি, তিনি যদি আমাদের দেশের অন্যান্য একাধিক অন্যায় রকমের ভাগ্যবানদের মতো সাহিত্যানুশীলনের উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ পেতেন, স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপস না করবার জেদ আর আদর্শের শিখা অনির্বাণ রাখবার

প্রেরণায়, সংগ্রামে সংগ্রামে যদি তাঁর জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত না হতো, দীর্ঘতর আয়ুধন্য যদি তিনি হতেন, তা হলে আরও কত অবিস্মরণীয় সৃষ্টি প্রাচুর্যের দানই না রেখে যেতে পারতেন তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে, এ সম্ভাবনা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তা হতে পারে নি। মাত্র আটচল্লিশ বৎসব বয়সে এই প্রচণ্ড শক্তিধর লেখকের জীবনাবসান ঘটে। বাংলা গল্পোপন্যাসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে দান তিনি রেখে গেছেন তা পরিমাণে যথেষ্ট ভারী হলেও, দিবারাত্রির কাব্যে তিনি যে বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি বহন করে নিয়ে এসেছিলেন, অমর লেখক হবার যে সম্ভাব্যতা তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি আর সে সম্ভাবনা কিন্তু পরে আর তাঁর দ্বারা পূরণ হতে পারে নি, আস্তে আস্তে তাঁর শক্তি ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছিল বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। এ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে বলব, আপাতত কালানুক্রম রক্ষা করে অগ্রসর হই।

দিবারাত্রির কাব্য প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু এমন অদ্ভুত বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রেমকে কেউ বাংলা সাহিত্যে দেখেছেম বলে আমার জানা নেই। এই লেখকটি যে অত্যন্ত মৌলিক দেখার চোখ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ওই প্রথম উপন্যাসেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। হেরম্ব যে আসলে লেখকেরই মনের প্রক্ষেপণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে হেরম্ব নারীর রূপসৌন্দর্যের অনুরাগী কিন্তু দেহাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ভাববাদী (প্লেটোনিক) প্রেমের আদর্শের প্রতীক। মধ্যরাত্রে সুপ্রিয়ার মিলনেচ্ছাকে তাঁর প্রত্যাখ্যান কিংবা প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যেই তার চিরকালীনত্বের নিশানা-জাতীয় আপ্তবাক্যের বক্তৃতায় আনন্দকে ঘায়েল করার চেষ্টা ("একমাসের বেশী প্রেম কারো সহ্য হয় ? মরে যাবে আনন্দ—এক মাসের বেশী হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে।" ইত্যাদি) থেকে এই রকমেরই একটা ধারণা হতে পারে পাঠকের মনে কিন্তু অত সহজ আর অজটিল মনের মানুষ হেরম্ব নয়। মানিকও নন। তাঁদের মনোভঙ্গীর

মধ্যে আছে প্রেমকে পদে পদে ছিড়ে ফেঁড়ে দেখবার অস্বাভাবিক—হ্যাঁ, লৌকিক মানদণ্ডে তাকে অস্বাভাবিকই বলব, এমনকি বিকৃতও বলা যায়—প্রবণতা। আর ভালোর জন্যে হোক মন্দের জন্যে হোক ওইখানেই মানিকের লেখনীর বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য কাহিনীতে তো বটেই, প্রেমের কাহিনীতেও তাঁর মনঃসমীক্ষণের অভ্যাস আষ্টেপৃষ্ঠে ছড়ানো। এ এক দুরারোগ্য বৃত্তি, যা মানিকের রচনাকে শুরু থেকেই অন্যান্যের রচনা থেকে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছে। প্রথম উপন্যাস বলেই হয়তো প্রেমের উপন্যাস ফেঁদে বসেছিলেন কিন্তু তা-ও কিনা স্বভাববৈগুণ্যে হয়ে দাঁড়ালো অত্যন্ত তির্যক্ মনোভঙ্গীর জটিল এক মনস্তাত্ত্বিক আলেখ্য। তিনি এই উপন্যাসে হেরম্বর মুখ দিয়ে আক্ষেপের স্বরে বলেছেন "এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না। আর এ কি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে-না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? একি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।"

অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উক্তি। আতিশয্যমণ্ডিত বিশ্লেষণ প্রবণতার অভিশাপ এখানে অসংকোচে কবুল করা হয়েছে—নিজের জবানীতে না হলেও, লেখকেরই প্রক্ষেপণ স্বরূপ উপস্থাপিত একটি চরিত্রের মাধ্যমে। সত্যিই তো, কেবলই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরের মন যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ বিষাক্ত-বিস্বাদ হয়ে যাবে না তো কী হবে? কিন্তু মানিক স্বেচ্ছায় এই ভাগ্য বরণ করে নিয়েছিলেন—এটিকে তার অবাঞ্ছিত কিন্তু অনিবার্য সাহিত্যিক নিয়তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর মূল্যও দিতে হয়েছে তাঁকে জীবনভোর—পরের মন, অভিপ্রায়, আচরণের কার্যকারণ নিরূপণের বিসদৃশ উল্লাসে নিজের সুখশান্তি তাঁকে অনেকখানি পরিমাণে বিসর্জন দিতে হয়েছে। চাইলেই কি তিনি এই নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারতেন? না, তা তিনি পারতেন না। কেননা, অপরের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো যায়, নিজের কাছ থেকে তো পালিয়ে

বেড়াবারউপায় নেই। বিজ্ঞান-পড়ার সূত্রে নয়, জন্মসূত্রেই যিনি ব্যবচ্ছেদী প্রবণতা স্বভাব হিসাবে অর্জন করেছেন, তিনি নিজেকে নিজে খণ্ডাবেন কী করে?

কিন্তু এই ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমকে কি কখনও সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়? তা-ও কি সম্ভব? অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় প্রেমকে পরীক্ষার বস্তুতে পরিণত করলে কি প্রেমের মহিমা থাকে? প্রেম কি একটা যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য মনোভাব যে যুক্তির আলোয় ওই অবুঝ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে? যায়ও নি, দিবারাত্রির কাব্য প্রেমের গদ্যকাব্য হিসাবে সার্থকতা পায় নি কিন্তু মানিক যে কী অসামান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনঃসমীক্ষণধর্মী লেখক তার প্রমাণ ওই প্রথম রচনাতেই অপ্রতিবাদ্যরূপে মুদ্রিত।

আর কি ভাষার সৌষ্ঠব! এমন জটিল মননের প্রক্রিয়া এমন সহজ স্বচ্ছন্দ শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মানিকের আগে-পরের আর কোনো লেখক পরিস্ফুট করতে পেরেছেন বলে জানি না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি কিংবা ঘরে-বাইরে উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণের মধ্যে আছে রসের দ্যোতনা, শরৎচন্দ্রে আছে জবজবে আবেগের কিছু ফেনা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে আছে যে-পরিমাণে সূক্ষ্ম অনুভব ঠিক সেই পরিমাপেই পঙ্গু ভাষা; কিন্তু মানিক তুলনাহীন। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ব্যবচ্ছেদী রচনা-ভঙ্গীর মধ্যে রস কম কিন্তু আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা। আর ভাষাও সেই অনুপাতে অতি প্রখর। অথচ সহজ ছাঁদের ভাষা, এমন জটিল তির্যক্‌বক্র ভাবনা এমন সরল ভাষায় প্রকাশ করবার কৌশল তিনি কেমন করে আয়ত্ত করেছিলেন তা-ই ভেবে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

অধ্যাপকীয় লেখকদের ধরনে উদ্ধৃতি দেবার অভ্যাস আমার নেই। আমার এটি অনাবশ্যক ব্যায়াম বলে মনে হয় এবং অল্পতেই তাতে ক্লান্তি আসে। তবু পাছে পাঠক মনে করেন মানিকের সহজ ভাষায় জটিল মনন প্রকাশের বক্তব্যটি আমার একটি ঢালাও মন্তব্য, তার পিছনে সাক্ষ্যপ্রমাণের জোর তেমন নেই, সেই কারণে এ বিষয়ে দিবারাত্রির

কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ দেব। তবে মাত্র একটি উদাহরণ। তার বেশী নয়। তাই থেকে পাঠক বোঝেন তো ভালো, নয় তো আমি নাচার।

স্ত্রীকে খুন করে ধরা-পড়া থানার কয়েদে আটক কোনো এক সাধারণ খুনীর বিষয়ে সুপ্রিয়ার দারোগা স্বামী অশোককে উদ্দেশ করে হেরম্বর বক্তৃতা, "···না, স্ত্রীকে ও ভালবাসত না। স্ত্রী আর একজনকে ভালবাসে বলে সে তাকে খুন করে অথবা কষ্ট দেয়, অবহেলা করে, স্ত্রীকে সে ভালবাসে না। তুমি বুঝতে পার না অশোক, ভালবাসার বাড়া-কমা নেই? ভালবাসার ধৈর্য আর তিতিক্ষা? একটা একটানা উগ্র অনুভূতি হল ভালবাসা, তুমি তাকে বাড়াতে পার না কমাতে পার না। স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে চাও কর, কিন্তু তারপর একদিনের জন্য যদি তোমার ভালবাসায় ভাঁটা পড়ে, মনে হয় খুন না করলেই হত ভাল, সেইদিন জানবে, ভালবেসে স্ত্রীকে তুমি খুন করনি, করেছিলে অন্য কারণে। স্ত্রীকে যে ভালবাসে সে অপেক্ষা করে। ভাবে, এখন ও ছেলেমানুষ, আর একজনের স্বপ্ন দেখছে। দেখুক, যৌবনে ওর প্রেম পাব। ভাবে, যৌবন ওকে অন্ধ করে রেখেছে, ও তাই অতীতের অন্ধকারটাই দেখছে। দেখুক যৌবন চলে গেলে আমি ওকে ভালবাসব। আচ্ছা অশোক, তোমার কি কখনো মনে হয়না যে প্রিয়া আর একজনকে ভালবাসছে এই অবস্থাটাকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্তনীয় করে দেওয়া বোকামি? কষ্ট দিয়ে আর একজনের প্রতি এই ভালবাসাকে, এই মোহকে প্রবল আর স্থায়ী করে দেওয়া মূর্খামি? একি স্ত্রীকে ভাল না বাসার প্রমাণ নয়?"

দিবারাত্রির কাব্যের তুলনায় জননী অনেক অনুগ্র (tame) রচনা তার বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র এবং গতানুগতিক। বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারে পারিবারিক কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ এক জননী হলো এই উপন্যাসের কেন্দ্রী চরিত্র। পরিবারের সকলের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব বহনকারি উদয়াস্ত কর্মকারিণী শ্যামা সন্তান ও আশ্রিত বাৎসল্যের প্রতীক, তা বাঙালী সংসারের এই মায়ের আদল এতই পরিচিত যে মানিক এখা

তাঁর অভ্যস্ত তির্যক্ রচনাবৈশিষ্ট্য ফোটাবার বিশেষ কোন অবকাশ পাননি। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর মতো বক্রমনোভঙ্গীর লেখক এমন একটি মামুলি বিষয় কেন যে নির্বাচন করেছিলেন তা-ই ভেবে এক এক সময় অবাক্ হতে হয়। যাঁরা শ্যামা চরিত্রের সঙ্গে গর্কির 'মাদার' চরিত্রের প্রতিতুলনা খোঁজেন তাঁরা মানিককে সামান্যই বুঝেছেন, গর্কিকে একেবারেই বোঝেন নি। নাম-সাদৃশ্য ছাড়া এই দুই বইয়ের ভিতর আর কোনো মিলই নেই। বরং গর্কির মাদারের স্পষ্ট আদল এসেছে 'শহরতলী' উপন্যাসের যশোদা চরিত্রের মধ্যে। সন্তানবাৎসল্য (ব্যাপক অর্থে), দুঃখীজনদের প্রতি দরদ, কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা এবং সংগ্রামশীলতা এই চতুর্বিধ লক্ষণেই পেলাজিয়া নিলোভনা আর যশোদা সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। যশোদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

আর এই আশ্চর্য সৃষ্টির জন্যই শহরতলী উপন্যাস মানিক-রচনাবলীর মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র আয়তন লাভ করেছে। বিশেষত শহরতলী প্রথম পর্ব। প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্ব অত্যন্ত জোলো মনে হয়। এতই জোলো যে, ওই দুইটি বইকে একসঙ্গে গ্রথিত করে দেখতে আমার আদপেই ইচ্ছা হয় না। একই শিরোনামের আচ্ছাদনে এমন অসমান দুটি বই আর হয় না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ('ইতিকথার পরের কথা'কে বাদ দিয়ে), তার পরেই শহরতলী প্রথম পর্বের নাম করতে হয়। পুতুলনাচের ইতিকথা-য় শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে প্রগাঢ় সহজ দার্শনিকতার সমন্বয় ঘটেছে, আর শহরতলী প্রথম পর্বে মাতৃহৃদয়ের স্নেহশীলতার সঙ্গে শ্রমিক আদর্শের জয়মহিমা একত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্যের ডোরে। যশোদা সমাজের যে স্তর থেকে উঠে এসেছে তাকে মধ্যবিত্ত স্তর তো বলা চলেই না, নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরও বলা চলে কিনা সন্দেহ, লেখাপড়াও সে বিশেষ জানে না; অথচ শুদ্ধমাত্র চরিত্রমাহাত্ম্যে এক দঙ্গল কারখানার মজুর শ্রেণীর মানুষের উপর তার অপ্রতিহত অধিকার।

সে তাদের ধর্মঘট করতে বললে তারা ধর্মঘট করে, মালিকের সঙ্গে শালিস-মীমাংসায় বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে বললে তারা বিবাদ মিটিয়ে নেয়। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকেই স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে সেই যে সে গ্রাম থেকে এই বৃহৎ নগরীর উপকণ্ঠস্থিত শহরতলীতে এসে বাসা বেঁধেছে, তারপর এখানেই সে বরাবর রয়ে গিয়েছে। মধ্যবয়সিনী স্থূলাঙ্গিনী এই বৃহৎবপু রমণীকে সকলেই চাঁদের মা বলে। সে একটি ছোটখাটো হোটেল চালায় আর যত রাজ্যের হাড়হাবাতে মজুর আর বেকারকে এনে জুটিয়েছে তার সদাব্রত এই সরাইখানায়। সে তাদের নিজের হাতে ভাত রেঁধে খাওয়ায়। (ভাত রেঁধে খাওয়ানোর মধ্যে যেন এদেশের সনাতন মায়ের মূর্তিটি প্রকট। অন্নদাত্রী নয় তো যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!) তাদের চাকরি জুটিয়ে দেয়, প্রয়োজনে টাকা ধার দেয়, রোগে সেবা করে, ইত্যাদি। এইভাবে মতি, সুধীর, নন্দ (নিজের ছোট ভাই), জগৎ, ধনঞ্জয় প্রমুখকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভদ্রলোক কাউকে বাড়ীতে থাকতে দেয় না। ভদ্রলোকের নীতিবোধের সঙ্গে যশোদার নীতিবোধ মেলে না। 'ছোটলোক'দের নিয়েই তার সংসার আর তাদের খাইয়ে-পরিয়েই তার আনন্দ।

কিন্তু এটা হলো যশোদার স্নেহ-মূর্তি। তার একটা সংগ্রাম-মূর্তিও আছে। আর সেইটেই এই চরিত্রটিকে একটি অনন্যতা দিয়েছে। সে বলে "কাজ দেবার মতলব কারও থাকে না, কাজ আদায় করে নিতে হয়।" সে আরও বলে, মালিক শ্রমিকদের দাবি মিটিয়ে দিলেই শ্রমিকেরা মালিকের কথা শুনবে। নয়তো শুনবে কেন। কারখানার শ্রমিকদের উপর তার এমনই একচ্ছত্র প্রভাব যে সে একটা মুখের কথা বললেই তারা কাজে যাওয়া বন্ধ রাখে। মালিক সত্যপ্রিয় একটি আস্ত ঘুঘু (এই চরিত্রটিতে একটি বাস্তব আদল আছে), কিন্তু যশোদার কাছে তার জারিজুরি খাটে না। কিন্তু প্যাঁচালো বুদ্ধিতে এই সরলা নারী ওই আস্ত বাস্তুঘুঘুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন? শেষ ওই পর্যন্ত ঘোরেল ঘড়িয়ালের এক কিস্তির চালে যশোদা মাত হয়ে

যায়—তাঁর সাধের সরাইখানাটি ভেঙে যায়, মজুরেরা সব ছত্রখান হয়ে পড়ে।

যশোদা চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব—বাংলা সাহিত্যে এ একেবারেই নতুন জিনিস। মানিকের নিজের কথাতেই চরিত্রটির একটি বর্ণনা দিই—"একটু খাপছাড়া জীবন-যাপন করে বৈকি যশোদা, একটি অনন্যসাধারণ হয় বৈকি তার রীতিনীতি চাল-চলন, কিন্তু খুব বেশী বে-মানান যেন তার পক্ষে হয় না। এর কম অবস্থায় অন্য কোন স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবন যাপন করে সে স্বাধীন, কারও কাছে তার কোন প্রত্যাশা নাই, নিন্দা প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে-আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল তখনও কোনও পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থাকিতে পারে এ কথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সংকোচ বোধ হইত, মনে হইত, না, তা হয় না।"

'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। একাধিক বিদেশী ভাষায় এই উপন্যাসটির অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু এটি মানিকের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা নয়। এর বর্ণনার ধারা চলেছে লোকপ্রিয় উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করে স্থূল ঘটনার বর্ণনের স্তরে, জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনের ধারা বয়ে নয়। 'পুতুল নাচের ইতি-কথা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা' প্রকৃতি উপন্যাসের মধ্যে মানুষের অবচেতন মনের আলো-আঁধারের লীলার যে অপূর্ব শিল্পগুণান্বিত অথচ শক্তিশালী বিশ্লেষণ পাই, এ উপন্যাসে তা পাই না। এ উপন্যাসের কাজ যেন কিছু মোটা হাতের, সূক্ষ্ম তুলির পোঁছ বড়-একটা চোখে পড়ে না। তবু যে 'পদ্মা নদীর মাঝি' বাঙলা-ভাষাভাষী পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করেছে সে তার

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বগুণে ও সুন্দর একটি কাহিনীর যাদুপ্রভাবে। পদ্মা নদীর তীরস্থ দেশে মাঝিদের জীবন-সংগ্রাম, দারিদ্র্য, কাম, প্রেম, বঞ্চনা, শোষণ সবই এই উপন্যাসটিতে অতি মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হয়েছে—কোথাও অতিরিক্ত মনস্তত্ত্বের গহনে প্রবেশের চেষ্টা নেই। পদ্মা নদীর তীরের ভাষার ঢৌলটিকে সংলাপে খুবই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—লোকজীবনের সঙ্গে মানিকের অন্তরঙ্গতা যে কত নিবিড় ছিল এই সংলাপ তার প্রমাণ, তবে লক্ষ্য করবার বিষয় পদ্মা নদীর বর্ণনা খুব প্রাধান্য পায়নি। এটা মানিকের স্বভাবসম্মত হয়েছে বলেই মনে হয়। মানিকের কৌতূহল মানুষে, পরিবেশে নয়, যদিও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ কিভাবে বেঁকে চুরে তুমড়ে যায় তা দেখাতে তিনি ভোলেন না। বস্তুতঃ এটাই তাঁর সকল কাহিনীর মূল উপজীব্য। একজন তারাশঙ্কর কিংবা বিভূতিভূষণ যে স্থলে বন্যাপ্লাবিত ময়ুরাক্ষী অথবা অজয় কিংবা ইছামতীর উচ্ছ্বাসের বর্ণনায় ফেনায়িত হয়ে উঠতেন, সে স্থলে পদ্মার মতো আপাত-পারাপারবিহীন সর্বনাশা বিশাল নদীর বেলায় ফেনিল বর্ণনার বহুগুণ বেশী অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এখানে-ওখানে দু-চারটি সংক্ষিপ্ত রেখাঙ্কনে মাত্র বর্ণনার কাজটি তিনি সমাপ্ত করেছেন। ইত্যবসরে তাঁর সকল মনোযোগ গিয়ে পড়েছে কেতুপুর গাঁয়ের জেলেপাড়ার চূড়ান্ত দারিদ্র পীড়িত মানুষগুলির উপর। তাদের জীর্ণ ঘরের চালা বর্ষার জল ঠেকাতে পারে না, একটু ঝড়তুফান হলেই মেঝে জলে একাকার, স্যাঁতসেতে খড় বিছিয়ে—তাও সব সময় জোটে না—সকলের একত্র গাদাগাদি করে শোওয়া, উঠোনে কাদা ও আগাছার জঙ্গল, তুফান বিষম হলে কখনও-কখনও ঘরচাপা পরে মরা কিংবা জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে যাওয়া, পান্তাভাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি, ছেঁড়া ত্যানা পরে কাটানো, ঋণ ও সুদের পীড়ন, নৌকোর অভাবে পরের নৌকোয় মাঝিগিরি করা—এই হলো কেতুপাড়া আর আশেপাশের দশটা গ্রামের জেলে-জীবনের চিরন্তন চিত্র। এই চিত্রটিকেই লেখক তাঁর সমস্ত দরদ দিয়ে এঁকেছেন কুবের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে লোকজীবনের বৃত্ত টেনে। বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে নদীমাত্রিক ও লোকজীবনকেন্দ্রিক যে কটি উপন্যাস

রচিত হয়েছে—যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', আবতুল জব্বারের 'ইলিশমারীর চর' প্রভৃতি—সে-গুলির পিছনে পথিকৃৎ মানিকের এই নতুন পরিকল্পনা যে অনেকখানি প্রেরণারূপে কাজ করেছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

কুবের ও কপিলার প্রেমকাহিনী কিছু স্থূল। কিন্তু শিক্ষার পালিশ-বঞ্চিত নীচুতলার জীবনের প্রেম বলুন মোহ বলুন, জৈব চাওয়া-পাওয়ার রূপ এর চেয়ে বেশী মার্জিত আর কেমন করে হতে পারত? বরং তাদের সংযমটাই সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হোসেন মিয়া চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে নতুন তবে তাকে যথাযথভাবে বিকশিত করে তোলার সুযোগ লেখক গ্রহণ করেননি। সে ছাড়াছাড়াভাবে ঘটনার মঞ্চে একবার এসেছে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়েছে—এইভাবে সারাটা কাহিনী জুড়ে চলেছে তার আগমন-নিষ্ক্রমণের পালা। ফলে চরিত্রটি দানা বাঁধতে পারেনি। তবে তার নোয়াখালির সমুদ্রান্তর্গত জনশূন্য চর ময়নাদ্বীপে নতুন উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন চরিত্রটির মধ্যে একটি স্বপ্নালুতা আরোপ করেছে, নিছক অর্থ-নৈতিক লাভালাভের সূত্রের দ্বারা যার ব্যাখ্যা মেলে না।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' নিঃসন্দেহে মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এতে লেখকের লেখনী সবচেয়ে যাতে স্ফূর্তি লাভ করে, সেই মনস্তত্ত্বের আলো-আঁধারির রহস্যলীলার রূপায়ণ চূড়ান্ত শৈল্পিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কিন্তু এইটেই যদি উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড হতো তা হলে দিবারাত্রির কাব্য, চতুষ্কোণ, দর্পণ, অহিংসা প্রভৃতি উপন্যাসের সমসারিতে বসিয়েই তার বিচারক্রিয়া চলতে পারত—এগুলির মাথা ছাপিয়ে এই উপন্যাসে উৎকর্ষের একটি নতুন আয়তন আবিষ্কার-চেষ্টার আবশ্যকতা হতো না। দিবারাত্রির কাব্যে মনস্তত্ত্বের গহনলোকের রহস্যান্ধকারের উপর আলোক-পাত বড় কম করা হয়নি, প্রেমকে যত বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা সম্ভব উল্টে পাল্টে সোজাসুজিভাবে তেরছাভাবে কোণাকুণিভাবে—এ বইতে দেখা হয়েছে। চতুষ্কোণ ও দর্পণ উপন্যাসদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে যৌন মনস্তত্ত্বের গহনলোকের ছায়া-মায়ার খেলা, অহিংসা উপন্যাসে বিপিন ও

সদানন্দের ভণ্ডামির মধ্য দিয়ে একদিকে করা হয়েছে ধর্মধ্বজিতার উপর নির্মম ব্যঙ্গ ও অন্যদিকে মহেশ চৌধুরীর চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে লৌকিক জীবনে "মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়…" এটা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ('প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের ভূমিকায় 'লেখকের বক্তব্য' দ্রষ্টব্য।) মনস্তত্ত্বের খেলা সব কয়টি উপন্যাসেই কম-বেশী প্রকট, তবে পুতুলনাচের ইতিকথার বেলায় ব্যতিক্রম করা কেন?—তার দার্শনিক সুরের জন্য।

বলা প্রয়োজন, এ দার্শনিকতা কিতাব থেকে পাওয়া কর্ষিত দার্শনিকতা নয়, ভারতের সনাতন কৃষি জীবনের আওতায় লালিত প্রতি গ্রামীণ মানুষের মধ্যে যে সহজ দার্শনিকতা থাকে, তাকে শশী-কুসুম ও কুমুদ-মতি, নন্দ-বিন্দু প্রমুখ চাষী স্তরের নরনারীগুলির ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে শিল্পীজনোচিত রূপ দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী চলছে দুইটি স্তরে—একটি ব্যবহারিক জীবনের ঘটনার স্তরে, আরেকটি ভাবুকতার স্তরে। খতিয়ে দেখলে, ভাবুকতার স্তরের চিত্রণটাই সমধিক চিত্তাকর্ষক। তার কারণ আর কিছু নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সহজভাবে ভাবুক মনের মানুষ—এত বেশী ভাবুক যে তাঁর এই ভাবুকতাকে একটা আবেশ বলে চিহ্নিত করা যায়—সারাক্ষণ চিন্তার আবেশে তিনি ডুবে থাকতেন। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মধ্যে কবিত্বগুণেরও সন্ধান পেয়েছেন। কবিত্ব তাঁর ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সেটা সর্বাতিশায়ী ভাবুকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আর এই ভাবুকতা থেকেই তাঁর স্বভাব-দার্শনিকতার জন্ম।

এই স্বভাব-দার্শনিকতার স্বরূপ কী?—নিয়তিবাদ। বলা আবশ্যক যে, মানিক পরবর্তী-সময়ে মার্ক্সীয় তন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে যে অর্থনৈতিক নিয়তিবাদকে (economic determinism) তাঁর একটি মৌলিক প্রত্যয়-রূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ সে-জাতের নিয়তিবাদ নয়। এ

নিয়তিবাদের মূল ভারতীয় সনাতন সংস্কারে প্রোথিত, যা এদেশীয় কৃষকেরা অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। পাশ্চাত্ত্যের পুরাতন ও আধুনিককালীন কোনো নিয়তিবাদের সঙ্গে যদি এর তুলনা দিতেই হয় তো গ্রীক নেমেসিস-এর ধারণা অথবা বিশ শতকের গোড়ার দিককার ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির নিয়তিবাদকে প্রতিতুলনা হিসাবে টানা যেতে পারে। কুসুমের বাবা অনন্ত বলছে—"সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল-নাচের পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।" লেখকের নিজের জবানীতে পাচ্ছি—"নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে। মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।"

শশী গ্রামের ছেলে হলেও কলকাতায় গিয়ে ও কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ে সে শহরের এক পোঁছ রঙ গায়ে লাগিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। কলকাতায় বন্ধু কুমুদের সান্নিধ্য তার মনোজগতের দুয়ার খুলে দিয়েছিল, তার সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার দিগন্তকে অনেক দূর প্রসারিত করেছিল। ফলে গাঁয়ে ডাক্তারি করতে বসে তার আর মন টিঁকতে চায় না, গাঁয়ের সংস্কারবদ্ধতায় ও অনৌদার্যে অল্পতেই মন হাঁফিয়ে ওঠে। কিন্তু পরানের বউ কুসুমকে সে নীরবে ভালোবাসে। কুসুমের মানসিক স্তর আর তার মানসিক স্তরে প্রভূত ব্যবধান থাকলেও এবং সম্পর্কটা লৌকিক বিচারে অনৈতিক হলেও কুসুমের আকর্ষণে মুগ্ধ হতে তার আটকায় না। কারণ দুজনে গাঁয়ের আলো হাওয়ায় বড় হয়েছে, শহরের শিক্ষার পালিশ সত্ত্বেও কুসুমের মতোই একই গ্রামীণতার সংস্কার তার ধমনীতে বহমান। তবু মাঝে মাঝে তার অন্তর বিদ্রোহ করে, গাওদিয়া গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডী ঝেড়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে মুক্তি খোঁজার জন্যে তার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু শেষ অবধি তার গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হয় না, এক দুর্জ্ঞেয় নিয়তির টানে তাকে গাঁয়ের কূপমণ্ডুকতাতেই

সংলগ্ন হয়ে থাকতে হয়। মানুষ যে ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, নিজ জীবনে তারই প্রমাণ বহন করে সে মনমরা হয়ে থাকে।

কিন্তু এই নিয়তিবাদ মানিককে বেশী কাল ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর মতো বলিষ্ঠ মনের মানুষ ভারতীয় নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদের অন্তর্নিহিত পরাজয় ও দুঃখবাদ কোনোমতেই স্বীকার করে নিতে পারে না। দেখা গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকেই মানিকের এক বিস্ময়কর রূপান্তর—সংগ্রামী সাম্যবাদী তত্ত্বে আস্থা তাঁর গোত্রান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সাম্যবাদী তত্ত্বে আস্থা তাঁর অস্ফুট চেতনায় গোড়া থেকেই ছিল তার প্রমাণ পাই পদ্মা নদীর মাঝি ও শহরতলী উপন্যাসদ্বয়ে কিন্তু তা তখনও পর্যন্ত একটা সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগ্রাহ্য আকার লাভ করেনি; ধূসর নীহারিকাপুঞ্জের ধূম্রজাল বিস্তৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত থেকে অসংজ্ঞেয় ও অনির্ণেয় হয়ে ছিল। তিনি তখনও পথ হাতড়ে ফিরছিলেন এবং কখনও-কখনও ভুল পথে চলছিলেন। নইলে পুতুলনাচের ইতিকথার মতো শিল্পগুণে অত্যুৎকৃষ্ট কিন্তু চিন্তাদর্শে প্রতিক্রিয়াশীল বই লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। মানুষ নিয়তির বশ হয়ে থাকবে কেন বরং নিজের ভাগ্য সে নিজেই গড়ে তুলতে পারে—এই তো আদত কথা, বীরের মতো কথা। আর শুধু নিজের ব্যক্তি-ভাগ্য কেন, সে ইতিহাসের ভাগ্যকে পর্যন্ত বদলবার ক্ষমতা রাখে এমন তার ইচ্ছাশক্তির জোর, জ্ঞানের অমোঘত্ব। নিয়তিবাদ যদি মানতেই হয়তো অর্থনৈতিক নিয়তিবাদকেই মানতে হবে, পরাজিতের মনোভাবযুক্ত ভাববাদী নিয়তি-বাদকে নয়, যে নিয়তিবাদের প্রবক্তা ভারতীয় দর্শন, গ্রীক দর্শন, আধুনিক পশ্চিমী দুঃখবাদ ইত্যাদি। কার্ল মার্কস প্রচারিত অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের মূল কথা হলো, সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক রূপান্তর শুধু যে দুয়ে দুয়ে চারের মতো আগে থেকেই অভ্রান্ত ভাবে বর্ণনা করে বলা যায় তা-ই নয়, তা ঘটানোও যায়, যদি এই ঘটানোর প্রকরণ জানা থাকে। মার্ক্সের দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি হলো ওই প্রকরণ।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে দীক্ষালাভের পর থেকে মানিকের রচনার ধারাধরণ

একেবারে বদলে গেল। এই পচা-গলা সমাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে তার চূর্ণাস্থির উপর নতুন সমাজসৌধ নির্মাণের জন্যে যে সংগ্রামশীলতা, আদর্শবাদ ও আত্মত্যাগ দরকার তার ডাক দিলেন এই নবীন বিশ্বাসে বলীয়ান, চরিত্রের তেজে দ্যুতিময় অসীমশক্তিধর লেখক। শুধু ডাক দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নিজেও সংগ্রামের বর্ম পরলেন, লেখনীর মুখে ফোটালেন আদর্শবাদের জ্বলন্ত পাবক শিখা, জীবনে বরণ করলেন বহুবিধ লাঞ্ছনা দুঃখকষ্ট ত্যাগ, সংগ্রামী আদর্শে স্থিতপ্রত্যয় হওয়ার মূল্যস্বরূপ। চল্লিশের দশকের শেষার্ধে ও পঞ্চাশের দশকে যত গল্পোপন্যাস তিনি লিখেছেন তার মূল কথা ঃ সংগ্রাম দ্বারা জীবনের রূপ বদলাও, লড়াই করে বিত্তবান্ শ্রেণীর অনিচ্ছুক হাত থেকে বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নাও। ওই যে সমুদ্রের স্বাদ গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৪৭) ভূমিকায় মানিক লিখেছিলেন, "স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।" তার পর থেকে যতো বই তিনি লিখেছেন তার সব কটিরই এই এক ধুয়া ঃ সংগ্রাম দ্বারা সমাজের রূপ বদলাতে হবে।

কিন্তু এজন্য তাঁকে মূল্য বড় কম দিতে হয়নি। কায়েমী স্বার্থবাদী রক্ষণশীল সাহিত্যিক সমাজ মানিকের এই বিদ্রোহকে ক্ষমা করেনি, তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রকারে অসহযোগ করে তাঁকে তাঁর অভীপ্সিত পথ থেকে স্খলিত করে পুনরায় পুরাতন-পরিচিত বর্ত্মে প্রত্যাবৃত্ত করবার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছে। তাই বলছিলাম এই পর্বে মানিককে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে, গতানুগতিক মূল্যবোধে আস্থাশীল কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষদের সম্মিলিত সঙ্ঘশক্তির বিরুদ্ধে, তার ছাপ তাঁর লেখার উপরে এসেও পড়েছিল। শেষ দিকে যেসব উপন্যাস তিনি লিখেছেন তার মধ্যে 'সোনার চেয়ে দামী' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসে ক্লান্তির ছাপ লেগেছিল। 'ইতিকথার পরের কথা', 'শুভাশুভ' প্রভৃতি উপন্যাস এর প্রমাণ। এই

পর্বে তিনি ভালো ছোটগল্প একাধিক লিখেছেন, যেমন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'মাসিপিসি',হারানের নাতজামাই ইত্যাদি কিন্তু উপন্যাসে দিবা-রাত্রির কাব্য পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি বইয়ের শিল্পসৌন্দর্য আর ফিরে আসেনি। মানিকের শেষ পর্বের সৃষ্টিকর্মের ভিতর একটা গভীর আদর্শবাদী, প্রত্যয়,'সমাজবাদী বাস্তবতার' চিত্রণ ছাড়া সাহিত্যকে আর কোনো কাজে লাগাবো না জাতীয় একটা স্থির সংকল্প, অবিকম্প প্রদীপশিখার ভাস্বর দ্যুতির মতো জ্বলজ্বল করছে কিন্তু সৃষ্টির স্ফূর্তি তাতে মিইয়ে এসেছিল। বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রভূত শক্তিক্ষয় তাঁর হয়েছে, ওই অপরিমিত শক্তিক্ষয়ের আবহাওয়ায় সৃষ্টির পূর্বতন প্রাণোচ্ছলতা কি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ?

কিন্তু বিষয়টিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে, এ ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। মানিকের পূর্বযুগের রচনাবলী যতই সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত আর শিল্পসৌন্দর্যের চিহ্নভূষিত হোক, এ কথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর ওই সময়ের রচনায় যে-মন প্রতিফলিত হয়েছে তা অত্যন্ত জটিল কুটিল বক্র এক মন। সংগ্রামের পথে নামার পর থেকে তাঁর মনের ওই বক্রতা কুটিলতা 'মর্বিড' চিন্তার ছাঁচ বহুলাংশে দূর হয়ে গিয়েছিল। তিনি খেটেখাওয়া মেহনতী মানুষের সুখদুঃখের শরিক হয়ে তাদের সোজা পথের পথিক হয়েছিলেন। 'ভদ্রলোকী' সাহিত্যের শৌখীনতা তাঁর কলম থেকে মুছে গিয়েছিল। অনেকটা টলস্টয়ের শেষ বয়সের লেখার মতো তিনি তাঁর লেখা থেকে উপর-তলার শিল্পীসমাজসুলভ মেকিত্ব আর কৃত্রিমতাকে বিদায় দিয়েছিলেন। এটা যে একটা মস্ত লাভ তা স্বীকার করতেই হবে।

চতুষ্কোণ, আশ্বিন ১৩৭৯

কাজী আবদুল ওদুদ

সম্প্রতি মনীষী সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদের তৃতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের মে মাসে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই স্মরণ-বাসরের আলোচনার শেষে এক প্রস্তাবে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে, কাজী সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোক এবং এজন্য প্রয়োজন হলে সরকারী অনুদানের সহায়তা নেওয়া হোক।

প্রস্তাবটি যে অতিশয় সাধু সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাজী আবদুল ওদুদের নাম বাংলার সাধারণ পাঠক মহলে সবিশেষ পরিচিত না হলেও বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধ মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল এবং সংস্কৃতিবান পাঠকেরা তাঁর নাম বরাবর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। তার কারণ ওদুদ ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি একাধারে গভীর সাহিত্য-তদ্‌গতচিত্ত লেখক, মানবতাবাদী ভাবুক, মুক্তবুদ্ধির উপাসক এবং এইসব কারণেরই সম্মিলিত ফলস্বরূপ সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেই সমস্ত আদর্শেরই তিনি পোষকতা করে গেছেন, যে সকল আদর্শ মানুষে মানুষে জোড় মেলায়, তাদের বিচ্ছিন্ন করে না, মানুষকে সর্বপ্রকার চিত্তকার্পণ্য ও অসহিষ্ণুতাকে জয় করবার শিক্ষা দেয়, তাকে সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে উদার ভাবনার রাজ্যে সমুত্তীর্ণ হতে সহায়তা করে। এ কথা সত্যি যে ওদুদ আজকের অর্থ নৈতিক-রাষ্ট্রিক সূত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষায় যাকে বলা হয় বিদ্রোহী বা বিপ্লবী চিন্তানায়ক, সেই গোত্রের ভাবুক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূলত উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারার লেখক ; তা হলেও ওই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁর চিন্তার ছাঁচের মধ্যে প্রভূত বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং দৃশ্যত একজন নিরীহ শান্ত স্থিতধী মানুষ হলেও প্রচলিত গতানু-

গতিক মূল্যবোধ সমূহের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তর যে গভীর প্রতিরোধ ও সংগ্রামশীলতার তেজে পূর্ণ ছিল সেটা বোঝা যায়।

তিনি তাঁর মোটামুটি দীর্ঘ আয়ুর প্রসাদপুষ্ট সাহিত্যিক জীবনে যে সকল বিষয়ের চর্চা করেছেন তার থেকেই তাঁর মনের ছাঁচের আন্দাজ মেলে। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপরে দুই প্রস্থ বিশালায়তন গ্রন্থ, কবিগুরু গ্যেটের উপরে দুই খণ্ডে সমাপ্ত এক প্রামাণ্য পুস্তক, 'ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল' নামে ইংরেজীতে রামমোহনের জীবনসাধনার এক পর্যালোচনা-মূলক বই, বাংলার উনিশ শতকের রেনেশাঁস আন্দোলনের উপর 'বাংলার জাগরণ' নামে একখানি নাতিবিস্তৃত কিন্তু সুলিখিত পুস্তক, শান্তিনিকেতনে বক্তৃতার আকারে প্রদত্ত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উপরে আলোকপাতকারী একখানি গঠনমূলক পুস্তিকা ('হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ') ইত্যাদি প্রণয়ন ছাড়াও বাংলায় কোরানের অনুবাদ করেছেন, হজরত মহম্মদের একখানি সুপাঠ্য জীবনী লিখেছেন, বাংলা অভিধান সংকলন করেছেন। এছাড়া একখানি বইয়ে শরৎ সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন করেছেন ('শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর'), আর এক সময় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে কত যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তার সীমা-সংখ্যা নেই। এই সব প্রবন্ধেরই একটি প্রামাণ্য সংকলন হলো তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থখানি, যার ভিতর তাঁর মুক্ত মনের পরিচয় অসংশয়িতরূপে লিপিবদ্ধ আছে। একদা সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভিক স্তরে, উপন্যাসও দুএকটি লিখেছেন, তবে পরে সেই অভ্যাস ত্যাগ করে প্রধানত চিন্তা ও বিচারমূলক রচনাতেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন।

ওদুদের মতো রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন নিবিড় অনুরাগী পাঠক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্র ভাবধারায় তাঁর মন ছিল ওতপ্রোতভাবে নিস্নাত। রবীন্দ্র-কাব্য থেকে বহু অংশ তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন এবং তাঁর আলাপ-আলোচনায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বারেবারেই আসত।

এটা তাঁর বেলায় শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য-অনুরাগের প্রমাণ বহন করত না, রবীন্দ্র-জীবনাদর্শেরও নিবিষ্ট অনুরাগের প্রমাণ বহন করত। তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন এই কথা যে, উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে যে সমস্ত সমস্যা অমীমাংসিত আকারে বিদ্যমান, সেই সকল সমস্যার নিরসনে রবীন্দ্রাদর্শের মতো ফলপ্রদ প্রতিষেধক আর কিছু হতে পারে না। সংস্কৃতির সংকট মোচনে রবীন্দ্র-প্রভাবের দ্বারস্থ হওয়ার তুল্য কিছু নেই।

প্রথম জীবনে ওদুদের ভাবনায়ক ছিলেন গ্যেটে। গ্যেটের কাব্যের ক্লাসিক আদর্শ, গভীর-গম্ভীর রচনাশৈলী, শুভচেতনা ও পাপচেতনা মিলিয়ে জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্দর্শন, প্রজ্ঞাভূয়িষ্ঠতা, বিশ্ববীক্ষা— এসব নবীন বয়সী ওদুদের মনোহরণ করেছিল এবং তাঁকে গ্যেটে-সাহিত্যে সমর্পিত-প্রাণ করে তুলেছিল। তাঁর সেই সময়কার একনিষ্ঠ গ্যেটে-সন্ধিৎসারই ফল হলো তাঁর দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'কবিগুরু গ্যেটে' বইখানি। এই গ্রন্থে তিনি গ্যেটের প্রধান প্রধান গদ্যপদ্য রচনাবলীর স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ সংকলন করে দিয়েছেন এবং তৎসহ সেই সমস্ত রচনার পর্যালোচনা করেছেন। তৎকৃত 'ফাউস্ট'-এর অনুবাদ এক কথায় চমৎকার। মূল জার্মান ভাষার ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ হলেও ওই অনুবাদেব মাধ্যমে ফাউস্টের ভাবগাম্ভীর্য, কল্পনার উত্তুঙ্গতা, বক্তব্যের মহত্ত্বের উপলব্ধি হতে বিলম্ব হয় না। এই রচনার সংস্পর্শে এলে পাঠকমন শুধু অনুপ্রাণিত হয় না, উন্নীতও হয়।

একথা ঠিক যে, ওদুদ এই গ্রন্থে ফাউস্টের যে বাংলা অনুবাদ উপস্থিত করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয় বা মূলাশ্রিত অনুবাদ নয় (সে দায়িত্ব পালন করেছেন জার্মান ভাষাবিজ্ঞ ডক্টর কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়), তৎসত্ত্বেও বলতে পারা যায় রচনা ও মূল্যায়নে উপস্থাপিত এই গ্রন্থের গ্যেটে-পরিচয় অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় গ্যেটের শ্রেষ্ঠ প্রবেশক আলোচনা। কেমন করে গ্যেটের সংবেদনশীল কল্পনাপ্রবণ চিত্ত রোমান্টিক ভাবাকুলতার (যার ফলশ্রুতি হলো 'ভের্তরের দুঃখ', 'হেবলহেইল মেইস্টার'

প্রভৃতি উপন্যাস) স্তর পেরিয়ে ক্লাসিক প্রশান্তি ও আত্মসমাহিতিতে (যার অনবদ্য প্রকাশ হলো পরিণত বয়সের 'ফাউস্ট' কাব্য) গিয়ে পৌঁছলো, রচনার নিদর্শন সমেত তার বার্তা জানতে হলে এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার পাঠকপাঠিকাদের কাছে অপরিহার্য বললেও চলে।

আমার নিজের ধারণা ওদুদ 'কবিগুরু গ্যেটে'র পরে আরও একাধিক গ্রন্থ রচনা করলেও এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বইটি অনেক দিন যাবৎ বাজারে পাওয়া যায় না। ছাপা নেই। নিবন্ধের সূত্রপাতে যে-প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার আলোচনা কালে কোনো কোনো বক্তা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ওদুদের গোটা রচনাবলীর পুনঃপ্রকাশ যদি সম্ভব নাও হয়, অন্তত যেন এই গ্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। সে ক্ষেত্রে পাঠকদের অনেক দিনের একটি প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। পাঠকমহলে বইটির সুস্পষ্ট চাহিদা রয়েছে।

পরে অবশ্য ওদুদ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যেটে থেকে অভিনিবেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে সেটি রবীন্দ্রনাথের উপর স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন তাঁর পরিণত জীবনের প্রেরণাস্থল। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, তিনি গ্যেটেকে বর্জন করেছিলেন। তার মানে এই যে, তাঁর মানসিক ঝোঁকের বদল হয়েছিল। এইরূপ হওয়াই সম্ভব যে, তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তিনি প্রথমে গ্যেটের চর্চা করেন, পরে রবীন্দ্রনাথে মনোনিবেশ করেন। ওদুদের মুখের উক্তি থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষের দিকে যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, প্রায়ই বলতেন যে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে, এখন স্বচ্ছন্দে তিনি এ সংসার থেকে বিদায় নিতে পারেন। মৃত্যুতে তাঁর কোনো আপশোস থাকতে পারে না। লক্ষ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে বলতেন, তিনি নিজের সামনে তিনটি মুখ্য কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব স্থাপন করেছিলেন—এক, গ্যেটের উপরে একখানি পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ প্রণয়ন ; দুই, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যপদ্য রচনার মূল্যায়ন ; তিন, পয়গম্বরের জীবন ও ইসলামের বিকাশের ইতিহাস

সন্নিবদ্ধ করে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা। এই তিন কাজই তিনি সম্পন্ন করেছেন: My life's work is done.

এটা তরলভাবদ্যোতক আত্মসন্তুষ্টির কথা নয়, এর পিছনে আছে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালনা করবার একটা সংযত দর্শন। অনেক কাজের মধ্যে এবড়ো-খেবড়ো ভাবে নিজেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে না পারার চেয়ে এই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে মনোযোগের স্থিরতা এবং তৎপক্ষে সর্বসাধ্য যত্নের অঙ্গীকার—এ অনেক ভালো। এতে সূচিত হয় আপনার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সহজাত বিনয়ের বোধ অথচ বিনয়ের সঙ্গেই আত্মবিশ্বাস। এই বিনয় এবং আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদাবোধেরই একটি রকমফের মাত্র। জীবন-সায়াহ্নে এসে যে মানুষ বলতে পারেন, আমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আর আমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার সার্থকতা নেই, বুঝতে হবে জীবনপ্রীতিতে নিষিক্ত কর্মের দ্যোতনায় পূর্ণ প্রজ্ঞাময় সে জীবন। এমনতর চরিতার্থতার চেতনা নিয়ে কয়জনা সংসার থেকে বিদায় নিতে পারেন?

কাজী আবতুল ওতুদের জন্ম ১৮৯২ সালে। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জিলার বাগমারা গ্রামে। তবে লেখাপড়া ঢাকায়। ঢাকা থেকে অর্থনীতি-রাজনীতি শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করে তিনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। অর্থনীতির এম. এ.র বাংলা ভাষার অধ্যাপনা কর্মে নিয়োগের মূলে আছে তাঁর নিজের সহজাত সাহিত্যানুরাগ, তার উপর আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের সুপারিশ। সেন মহাশয় ওতুদের 'নদীবক্ষে' ও 'মীর পরিবার' নামে তুখানি উপন্যাস পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে তিনিই উদ্যোগী হয়ে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে তাঁর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। চাকরিতে ওতুদের তেমন স্পৃহা ছিল না, আসল মন ছিল সাহিত্যে। নিতান্ত জীবিকার দায়ে চাকরি, নয়তো সমস্ত সময় ও উদ্যম সাহিত্যসেবাতেই ব্যয় করতেন।

ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে ১৯২৬ সালে ওতুদ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি'

আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং ওই আন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'শিখা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর এই আন্দোলনের সহযোগী ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র গণিতের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট মনীষী কাজী মোতাহের হোসেন, কথাসাহিত্যিক-নাট্যকার-প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল ফজল (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), কবি ও প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী (অধুনা লোকান্তরিত) প্রমুখ। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের নানাবিধ ধর্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উত্তোলন এবং যুক্তির আলোকে প্রচলিত নীতি-নিয়মের সংশোধন।

স্বভাবতই মোল্লাতন্ত্র এই তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াসকে সুনজরে দেখেনি এবং তাঁদের নানাভাবে ব্যাহত করবার চেষ্টা করে। মোল্লামৌলবীদের রাগের একটি প্রধান কারণ, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। মুসলিম সমাজের একাধিক কুপ্রথার উপর ওদুদের তীব্র সমালোচনার আঘাত নেমে এসেছিল। তাঁরা সামাজিক তথা লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও শরিয়তী শাস্ত্রশাসনকে গুরুত্ব না দিয়ে মানবিক প্রত্যয়ের উপর অধিক জোর দিতেন। এই হেতু মোল্লাতন্ত্রের হাতে 'বুদ্ধির মুক্তি'র প্রচারকদের লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে অনেক, শোনা যায় কখনও কখনও এ বাবদে তাঁদের শারীরিক নিগ্রহের সম্ভাবনারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই থেকেই আন্দোলনটির প্রভাবের ধারণা করা যেতে পারে।

ঢাকার তৎকালীন রক্ষণশীল এবং মুসলীম লীগের ভেদাত্মক রাজনীতির কলুষিত আবহাওয়া ওদুদের পছন্দ হয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় বদলীর সুযোগ গ্রহণ করে কলকাতায় চলে আসেন এবং অবিভক্ত বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ কাজে তাঁর ফেঁপে ওঠার অনেক সুযোগ ছিল। আর কিছু না হোক, নিজেই পাঠ্যবই লিখে সেগুলি অক্লেশে সরকার অনুমোদিত পুস্তকরূপে চালাতে পারতেন।

কিন্তু বাঁকা পথে তিনি কখনও যাননি, একান্ত তন্নিষ্ঠভাবে আপাতদৃষ্টিতে অনুৎপাদক বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনেই বরাবর নিরত থাকেন। টেক্সটবুক কমিটির সেক্রেটারীরূপেই তিনি সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

দেশ বিভাগের পর অনেকেই তাঁকে পূর্ববঙ্গে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি কারও কথায় কর্ণপাত না করে পশ্চিমবাংলায় থাকাই সাব্যস্ত করেন। কলকাতায় ছোটখাট একটা বাড়ি করেছিলেন, তাতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি ছিলেন সেকুল্যার রাজনীতির উপাসক। মুসলীম লীগ প্রচারিত ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি-তত্ত্বর নীতি ছিল তাঁর চক্ষুশূল। ঢাকায় গেলে বৈষয়িক দিক থেকে, সম্মান-প্রতিপত্তির দিক থেকে, অনেক সুবিধা-সুযোগ করে নিতে পারতেন, কিন্তু অন্তরের সায় না থাকায় কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। কলকাতায় সংখ্যালঘুদের প্রাণ সব সময়ে নিরাপদ ছিল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে কিন্তু সমস্ত বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়েই আদর্শের টানে তাঁর কলকাতায় অবস্থান। আর যাই করুন, মানবিকতাকে তিনি সাম্প্রদায়িকতার যুপমূলে বিসর্জন দিতে পারেন না।

কোরানের অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা। এই যে বাংলায় কোরানের প্রথম অনুবাদ হলো এমন নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্র সেন কোরানের বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি কোরান এবং ঐস্লামিক ধর্ম-তত্ত্বে এতটাই পারঙ্গম ছিলেন যে তৎকালীন সমাজে তাঁকে ডাকা হতো "মৌলবী গিরিশচন্দ্র" বলে। তারপর কোরানের আরও বঙ্গানুবাদ হয়েছে। এই কালের একটি উল্লেখ্য অনুবাদ করেছেন মৌলানা আক্রাম খাঁ, যিনি পরে মুসলিম লীগের এক প্রধান নেতৃপদ গ্রহণ করেন এবং সেই ভূমিকায় তৎ- সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী'র পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির তথাকথিত হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে এক প্রবল জেহাদ পরিচালনা করেন। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের অনুবাদের এঁদের

থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কোরানের 'সোরা' ও 'শূক্ত'গুলির 'আয়াতে'র গদ্যে অনুবাদ করেও তাদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ ধ্বনি-স্পন্দ ও লয়ের প্রবহমানতা বজায় রেখেছেন, যা প্রায় গদ্যচ্ছন্দের কোঠায় পড়ে। গদ্যের ভঙ্গীর মধ্যে ছন্দের ধ্বনি এনেছেন তিনি বাংলা বাক্যবন্ধের অভ্যস্ত অন্বয়ের (সিনট্যাক্স) পদসমূহের স্থানবদল ঘটিয়ে। বাংলায় সাধারণত ক্রিয়াপদের অবস্থান বাক্যের শেষে। কিন্তু ওদুদের কোরান অনুবাদে ক্রিয়ার স্থান হয়েছে প্রায়শ মধ্যে এবং কর্তা বা কর্মকে যেখানে যেমন ঠেলে দেওয়া হয়েছে শেষে। একটি উদাহরণ দিই ঃ

"আর উপাসনা করো আল্লাহ্‌র, আর কিছুই তাঁর অংশী কোরো না, আর সদয় আচরণ করো পিতামাতার প্রতি, আর নিকট আত্মীয়দের প্রতি, আর অনাথদের প্রতি, আর নিঃস্বদের প্রতি, আর নিকট আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর সহপথচারীর প্রতি, আর তোমাদের অধীন দাসদাসীদের প্রতি, আল্লাহ্‌ ভালবাসেন না দাম্ভিককে, গর্বিতকে—"

(পবিত্র কোর্‌আন, প্রথম ভাগ, পঞ্চম খণ্ড)

ওদুদ তাঁর প্রথম ভাগের ভূমিকাতেও বলেছেন কোরানের "দীপ্ত, মিত, আবেগচঞ্চল বাক্‌ভঙ্গী"টি তিনি ফোটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর অনুবাদে এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা চলতি ভাষাকেই তিনি আশ্রয় করেছেন, কেননা বাংলা চলতি ভাষার "প্রকাশ সামর্থ্য অসাধারণ"। এছাড়া, তিনি কোরানকে তার রাশভারী শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গ মুক্ত করে সাধারণ মানুষের গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলেছেন তাঁর অনুবাদে।

'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থে ওদুদ উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেঁশাসকে কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মূল্যায়নে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে মূল্য পেয়েছেন, শতকের শেষ পাদের ভক্তি আন্দোলনের উদ্‌গাতা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ সে মূল্য পান নি। তিনি এই দুজনের রিভাইভ্যালিস্ট ভাবধারাকে সোৎসাহ সমর্থন জানাতে পারেন নি। বইটি প্রকাশিত

হওয়ার পর এই নিয়ে পত্রপত্রিকায় কিছু তর্কবিতর্কের সঞ্চার হয়। ভক্তিবাদীরা তাঁকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ওদুদ অবিচলিত থাকেন। তিনি যেটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন তাকে অকপটে প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করতেন এবং সেই কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে ভয়ভীতিতে দমিত হতেন না। তাঁর চরিত্রের বুনিয়াদ ছিল এই সত্যনিষ্ঠা, আর এই সত্যনিষ্ঠা তাঁর ব্যক্তিত্বকে অনন্যতা দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের উপরে তিনি সবশুদ্ধ তিনখানি বই লিখেছেন। প্রথমে 'রবীন্দ্রনাথ'। তারপরে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' দুই খণ্ড। গ্যেটের মানস-শিষ্য ওদুদ সাহিত্যের ধ্রুপদী আদর্শকে যে কতখানি মর্যাদা দিতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রকাব্যকৃতির মূল্যায়নে। সাধারণত 'গীতাঞ্জলি'ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে পাঠক ও সমালোচক মহলে। ওদুদ এই অভ্যস্ত ধারণার বদল ঘটিয়ে তাঁর মনোনয়ন ন্যস্ত করেন 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটির উপর। কাব্যরসিকদের কাছে এ প্রায় এক অবিশ্বাস্য মনোনয়ন। একদিন তাঁকে তাঁর এই অদ্ভুত পক্ষপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, নৈবেদ্যের কবিতাগুলিতে যে ভাবের গাঢ়তা, সংহতি ও সংযম প্রকাশ পেয়েছে এমন আর অন্য কোনো রবীন্দ্রকাব্যে প্রকাশ পায় নি। তাঁর এই উত্তরে পুরোপুরি নিঃসংশয় হতেপারিনি যদিও, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি কী ভেবে ওই কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ কাব্যকল্পনার রোমান্টিক ভাবাতিরেকের উর্ধ্বে তিনি স্থান দিয়েছিলেন কাব্যের ক্লাসিকাল আদর্শকে—যে আদর্শের মূলকথা হলো অর্থের যাথাযথ্য, ভাবের সংহতি, রূপের পরিচ্ছন্নতা। আঙ্গিকের মর্যাদা, এই বিচারে, আধেয়ের মর্যাদা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়।

'শাশ্বত বঙ্গ' বইটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই বইয়ে বহু বিচিত্র বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব, বিষাদ-সিন্ধু, ফেরদৌসী উৎসব, ইকবাল, নজরুল-প্রতিভা, ইসলামে

রাষ্ট্রের ভিত্তি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য, কাজি ইমদাদুল হক স্মরণে, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, শরৎ-সাহিত্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ইত্যাদি। এই স্বল্পপরিসর নিবন্ধের সীমার মধ্যে পাঠ্যবস্তুর আলোচনা সম্ভব নয়, তবে কোন্ দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মনোভাব চালিত হয়ে তিনি এই সকল পরম্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়ের চিন্তাচর্চা করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তার পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় বিধৃত আছে। ভূমিকার উপসংহার-মন্তব্যটি এইরূপ ঃ

"এই পরিবেশে (আজকের পরিবেশে) 'বুদ্ধির মুক্তি'র কথা সমাদৃত হবে সে-সম্ভাবনা অল্প। আজ বরং মুষ্টিমেয়ের বুকে অনির্বাণ থাকুক এই প্রত্যয় যে তাই-ই মানুষের জন্য পথ, চিরন্তন ধর্ম, যা পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী আর সবার জন্য কল্যাণবাহী—আর সব বড়জোর আপদ্ধর্ম, অন্য কথায় বিপথ। মানুষ অপ্রেম ও চিন্তার আবিলতা থেকে রক্ষা পাক, এই হোক আজ প্রত্যেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নর ও নারীর অন্তরতম প্রার্থনা।"

ব্যক্তিজীবনে ওদুদ ছিলেন সরল জীবনযাত্রার পক্ষপাতী, নিরভিমান, সদাপ্রসন্ন ও উদারচিত্ত। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রাণের টান এবং বিশেষ করে সাহিত্যিকদের প্রতি ছিল অপরিমেয় প্রীতি। তরুণ লেখকদের তিনি বিশেষ স্নেহ ও প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। ঈপ্সিত ছিল তাঁর সান্নিধ্য, আনন্দময় ছিল তাঁর পরিবেশ। আনন্দ প্রচণ্ড চিড় খায় ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। তারপর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্রমে শয্যাশায়ী হন। তাঁর ব্যাধির একটি প্রধান লক্ষণ ছিল হাতের অসম্ভব কাঁপুনি—যার নাম 'পারকিনসন'স ডিজিজ'। উক্ত ব্যাধি কবলিত হওয়ার পর আর নিজের হাতে লিখতে পারতেন না, অনুলিখনের সাহায্য নিতে হতো। এই অবস্থাতেই তিনি তাঁর 'পবিত্র কোর্‌আন' ও 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থ দুটির রচনা সম্পন্ন করেন। সাহিত্যনিষ্ঠার এ এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন

এক

মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরলোকগমন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র থেকে একজন সত্যিকার প্রতিভাবান লেখকের বিদায় সূচনা করল। তিনি নূতন ও পুরাতনের যোগসূত্র ছিলেন। তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যের বোধ ও আধুনিকতার বোধ এক আধারে এসে মিশেছিল, সেইজন্য দেখা যায় তাঁর মৃত্যুতে প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থী, ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিশীল সকল স্তরের সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সমভাবে ব্যথিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে হারিয়ে বাংলা সাহিত্য যে দরিদ্রতর হলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম দিনাজপুরে, পৈতৃক নিবাস বরিশালে। জন্ম ও কৌলিক সূত্রে এ দুটি অঞ্চলের প্রভাব তাঁর রচনায় একেবারে ওতপ্রোত হয়ে আছে। নারায়ণ-সাহিত্যে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নিসর্গ শোভা যেরূপ সজীব অভিব্যক্তি পেয়েছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এমন আর কারও লেখায় পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন অধ্যাপক। যদিও তাঁর মূল পেশা বলতে গেলে ছিল সাহিত্য, আর সংকুচিত অর্থে—কথাসাহিত্য। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর মতো জনপ্রিয় লেখক আর কেউ ছিলেন বলে আমি জানি না। অধ্যাপনার সঙ্গে সৃজনী সাহিত্যের সার্থক মেলবন্ধন ঘটানোর ক্ষেত্রে দু' একজন ছাড়া নারায়ণের আর কেউ দোসর ছিলেন কিনা সন্দেহ।

প্রথমে অধ্যাপনার কথা দিয়েই শুরু করি। ১৯৪১ কি ৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপরই শুরু হয় তাঁর অধ্যাপক জীবন। প্রথমে জলপাইগুড়ি কলেজে তারপর

কলকাতা সিটি কলেজে, সর্বশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুকালে বাংলা বিভাগের রীডার পদে কর্মরত ছিলেন। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো বিভাগীয় প্রধানের পদও অলংকৃত করতে পারতেন। ১৯৬২ সালে 'সাহিত্যে ছোটগল্প' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। থিসিসটি পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

নারায়ণ ছিলেন ছাত্রবৎসল, কর্তব্যনিষ্ঠ অধ্যাপক। তাঁর সদা-হাস্যোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত আনন, তাঁর বাগ্মিতাশক্তি, সরস বাচনভঙ্গী সহজেই ছাত্রদের চিত্ত জয় করে নিয়েছিল। দেশী-বিদেশী সাহিত্যে তাঁর পড়াশুনোর পরিধি ছিল বিস্তৃত, বিশেষত কাব্য ও কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। সেটাই একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব, কিন্তু তার চেয়েও যেটা বিস্ময়ের কথা, তিনি ওই পরিচয়কে বহুলাংশে স্মৃতিতেও বিধৃত করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্লাশের বক্তৃতায় (সাহিত্যসভার আলোচনায়ও) যখন-তখন পঠিত বাক্যাংশ ও গল্পাংশ থেকে অনর্গল মুখস্থ বলে শ্রোতৃসাধারণকে তাক্ লাগিয়ে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কারও পেরে ওঠবার যো ছিল না। নারায়ণের এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি অধ্যাপনায় তাঁকে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের আয়ুধ জুগিয়েছিল যা তাঁর বক্তৃতাকে করে তুলতো সরস ও হৃদয়গ্রাহী। কণ্ঠস্বর উদাত্ত ছিল এমন কথা বলা চলে না, বলিষ্ঠও সে স্বর নয়; কিন্তু বলিষ্ঠতার অভাব পূরণ হয়েছিল বলবার মোলায়েম একটি ভঙ্গীর দ্বারা, যা চকিতে মনকে আকর্ষণ করে। তাছাড়া তিনি ছাত্রদের সাহায্য করতেও সদা-প্রস্তুত থাকতেন. নিজের কাজের ক্ষতি করেও তাদের আব্দার রক্ষা করতেন। এককথায় যথার্থ ছাত্রপ্রাণ অধ্যাপক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তা-ই। ছাত্ররা যে তাঁকে কতটা ভক্তি শ্রদ্ধা করতো সেটা বোঝা গেল তাঁর মৃত্যুর পরদিন হাসপাতালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর সিটি কলেজের প্রাঙ্গণে ও কেওড়াতলা শ্মশানে কাতারে কাতারে ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ থেকে।

অধ্যাপনা যদিও নারায়ণের গৌণ পরিচয় তবু দেখা যায় এই জীবিকাটিকেও তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে সেবা করে গেছেন সাহিত্যের মতো। এতে তাঁর কর্তব্য সচেতনতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্যের অজুহাতে জীবিকার কৃত্যকে ফাঁকি দেননি। যেদিন সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেদিনও ক্লাশ নিয়েছিলেন, না নিলেও পারতেন, কারণ কয়েক দিন থেকেই তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু বিবেক ও কর্তব্যের টান তাঁকে কর্মস্থলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মোট কথা, অধ্যাপনা ও সাহিত্যসেবা এই দুই বৃত্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে নারায়ণ বোধহয় এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

দুই

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, নারায়ণের যেটা মূল পরিচয়—সুলেখক—সেখানে কিন্তু তাঁর অধ্যাপকীয় সত্তা একটুক্ দাগ কাটতে পারেনি। যখনই সাহিত্যচর্চা করেছেন অধ্যাপকের খোলসটি বাইরে রেখে তবে সাহিত্যের দেউড়ি পেরিয়েছেন—এ দুটি কাজকে একত্র গুলিয়ে ফেলতে তাঁকে কখনও দেখিনি, যা একাধিকজনের বেলায় দেখি। এই ক্ষেত্রে তাঁর সীমারেখা জ্ঞান খুবই প্রখর ছিল—সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মের উপর অধ্যাপকীয় দৌরাত্ম্যকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি কখনও সাহিত্য এবং অধ্যাপনা এই দুইয়েরই জাত মারতে যাননি। ক্ষেত্রাক্ষেত্র বোধ যে তাঁর কত তীক্ষ্ণ ছিল তারও প্রমাণস্বরূপ এই বললেই যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর পৈতৃক তথা অধ্যাপকীয় নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কখনও ক্লাশরুমের বাইরে বয়ে আনতে দেননি—তাকে শিক্ষায়তনের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক নাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আড়ালে অধ্যাপকীয় নাম তারকনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। এটাকে আপতিক কোনো ঘটনা মনে করতে পারিনে।

যেমন আর দশজন তরুণ সাহিত্যযশোপ্রার্থীর বেলায় হয়ে থাকে, নারায়ণও প্রথম কবিতাচর্চা দিয়ে সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত করেন।

'শনিবারের চিঠি' ও অন্য কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ওই সময়ের কিছু কিছু কবিতা দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। কবিতা বেশ ভালোই লিখতেন তিনি। রোমান্টিকতার সুবাসে ভরপুর। তবে আঙ্গিক কিছু পুরাতন-ঘেঁষা, এখনকার ছাঁদের কবিতা নয়। কাব্যের আঙ্গিকে এই পুরাতনের প্রতি পক্ষপাত তাঁর ঐতিহ্যসচেতন অন্তরেরই পরিচয় বহন করে। একে খারাপ বলতে পারিনে, বরং এখনকার হিজিবিজি আঙ্গিকও অর্থের কবিতার তুলনায় নারায়ণের ওই দৃঢ়বদ্ধ ছন্দ ও রূপ-বিশিষ্ট সংহত আঙ্গিকের কবিতার প্রতি আমার সুস্পষ্ট প্রশ্রয় আছে।

যাই হোক, নারায়ণ বেশীদিন কবিতায় সংলগ্ন হয়ে রইলেন না। গদ্যে ক্ষেত্র বদল করে ছোটগল্পে হাত পাকাতে থাকলেন। শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পাঠকমহলের সমাদর লাভ করে। শনিবারের চিঠির সম্পাদক কবি-সমালোচক সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁকে গদ্যরচনায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন ও নানাভাবে তাঁর আনুকুল্য করেন। দেখা যায় সজনীকান্তের দূরদৃষ্টি ছিল, নারায়ণ পরবর্তী জীবনে গদ্যসাহিত্যকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেছিলেন ও এই ক্ষেত্রে, সকলেই জানেন, সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কথাসাহিত্যে তাঁর চেয়ে শক্তিমান লেখক আরও কেউ কেউ ছিলেন ও আছেন, কিন্তু তাঁর মতো জনপ্রিয় লেখক বোধহয় আর কেউই ছিলেন না।

প্রথম ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয় 'বীংতস'। সঙ্গে সঙ্গে তা জনসংবর্ধিত হয়। পরবর্তী জীবনে আরও অনেক ছোটগল্পের বই তিনি লিখেছেন—'কালাবদর', 'দুঃশাসন', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি। কয়েকটি প্রসিদ্ধ গল্পের নাম—"কালাবদর", "টোপ", "শিকার", "বাইশে শ্রাবণ", "দুঃসাশন", "বনতুলসী" ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ভাষার অপূর্ব প্রসাদ, প্রকৃতিচেতনা, জীবন ও জগতের প্রতি কবিসুলভ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী অথচ একই কালে নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি অপরিমেয় সহানুভূতি।

প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে কিছু বর্ণন-বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু ভাষার অসাধারণ ক্ষমতার জন্য তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আশ্চর্য মানিয়ে যায় ওই আতিশয্য—মোটেই বিসদৃশ মনে হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কালাবদর গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর ও বরিশাল জিলার মধ্য দিয়ে খরস্রোতে বহমান আড়িয়ল খাঁ নদীর বিধ্বংসী তাণ্ডব এই গল্পের বিষয়বস্তু। অতুলনীয় লিপিকুশলতার সাহায্যে তিনি পদ্মার এই শাখানদীর সর্বনাশা দুকূল-ভাঙা রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এর কাহিনীর ভাগ সামান্যই—বলা যেতে পারে এটি একটি পরিবেশমূলক গল্প, যেমন রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ", প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তেলেনাপাতা আবিষ্কার", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "রুদ্রের আবির্ভাব" প্রভৃতি। প্রকৃতির রূপের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের শব্দঝঙ্কারময় বর্ণনক্ষমতায় নারায়ণ যে কত দুর্ধর্ষ ছিলেন এই গল্পটি পড়লে তা বোঝা যায়।

অবশ্য টোপ গল্পটির যে রকম সুখ্যাতি শুনতে পাওয়া যায়, গল্পটি তদনুরূপ কিছু নয়—বরং বলা চলে এর প্লট অ্যাতিশয্যদোষপীড়িত ও বীভৎসরসসঞ্চারী। সেই তুলনায় অনেক ভালো গল্প শিকার যা সামাজিক সুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

নারায়ণ অনেকগুলি উপন্যাসের রচয়িতা। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'উপনিবেশ' উপন্যাস দিয়ে তাঁর ঔপন্যাসিক জয়যাত্রার শুরু; সর্বশেষ উপন্যাস লিখেছিলেন মৃত্যুর কিছুকাল মাত্র আগে যুগান্তর শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত 'সন্দেহের অবকাশে' ও বেতার জগৎ শারদীয়ায় প্রকাশিত 'হাঁসের আকাশ'। মধ্যবর্তী পর্বে অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশখানা উপন্যাস লিখেছেন। বিশিষ্ট কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি—'স্বর্ণসীতা', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'বৈতালিক', 'লালামাটি', 'শিলালিপি', 'পদসঞ্চার', 'অমাবস্যারগান', 'সূর্যসারথি', 'মেঘের উপর প্রাসাদ' ইত্যাদি।

এদের ভিতর উপনিবেশ তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ

উপন্যাস। দক্ষিণ বঙ্গের নদী ও সমুদ্রস্তনিত চরের বাসিন্দাদের নিয়ে রচিত এই অভিনব বিষয়বস্তুর উপন্যাসে তিনি পাঠকমনে তাঁর ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন, পরিতাপের হলেও এ কথা সত্য যে, তিনি তাঁর উত্তরকালীন উপন্যাসগুলির মাধ্যমে সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন নি। সমালোচকদের মতে, উপনিবেশই তাঁর সবচেয়ে সুলিখিত উপন্যাস। এই উপন্যাসে আছে নানা জাতের মানুষের জটলা; নদী ও সমুদ্রের মোহনায় জেগে-ওঠা নতুন চরসমূহের নিসর্গশোভার বর্ণনা, সকল দেশের ঔপনিবেশিকদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য-প্রীতি, দুঃসাহসিকতা, সংগ্রামশীলতা ও অপরিচয়ের আকর্ষণ দেখা যায়, চরের নতুন বসবাস স্থাপনকারী মানুষগুলির মধ্যে তারই প্রতিভাস; তা ভিন্ন প্রেমকে কেন্দ্র করে মানবীয় আদিম প্রবৃত্তিসুলভ রাগ-অনুরাগ দ্বন্দ্ব-দ্বেষ লোভ ও ক্রূরতার চিত্র তো আছেই। এখানে পর্তুগীজ হার্মাদের বংশধর, মগ, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান চাষী ও ক্ষেতমজুর সব একসঙ্গে জড়াজড়ি-মেশামেশি করে আছে। পরের উপন্যাসগুলিতে চরিত্রের এমন রকমারি ভিড় কিংবা পরিবেশের এমন স্বাদ-গন্ধের দেখা মেলে না।

যে-কটি উপন্যাসের নাম করেছি তার মধ্যে পদসঞ্চার ও অমাবস্যার গান প্রকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সগোত্র। পদসঞ্চারে আছে পোর্তুগীজ বণিকদের বাংলাদেশে আগমনের সময়কার একটি ঐতিহাসিক সামাজিক চিত্র; অমাবস্যার গান রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস ও কল্পনাবিমিশ্র এক প্রেমের কাহিনী—এক সুগায়িকা বারনারীর সঙ্গে কবির প্রেম এই কাহিনীর উপজীব্য। এ ছাড়া নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারের একটি ছবিও এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের স্থানবিশেষে দৃষ্ট রুচির স্থূলতার একটা সামাজিক ব্যাখ্যা লেখক এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন।

'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'বৈতালিক', 'লালমাটি' ও 'শিলালিপি' উপন্যাস

চতুষ্টয়ে আমরা পাই তিস্তা আত্রেয়ী মহানন্দা ও করতোয়া বিধৌত উত্তর-বঙ্গের এক অনবদ্য নিসর্গ চিত্র। নারায়ণের বর্ণনার ক্ষমতা এমনই যে, এই উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে বারে বারেই মনে হতে পারে যে, উপন্যাসের মানুষ অপেক্ষা উপন্যাসের প্রকৃতিটাই যেন লেখকের মুখ্যতর মনোযোগের বিষয়। বৈতালিকে পাই মালদহ অঞ্চলেব ছবি, শিলালিপি ও লালমাটিতে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের নিসর্গ শোভা, আর সামন্ততন্ত্র ও বণিক্‌তন্ত্রের স্বার্থ-সংঘাতের সামাজিক বক্তব্যপূর্ণ উপন্যাস সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীতে বরেন্দ্রভূমির আলেখ্য। জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গ যেন লেখকের প্রাণসত্তার একেবারে মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করেছিল। তাই দেখা যায়, কি ছোটগল্পে কি উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ ফিরে ফিরে লেখকের মগ্নচৈতন্য থেকে বাহিবে আত্মপ্রকাশ করে ওই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা ঘোষণা করেছে। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির এমন বিশ্বস্ত ও ব্যাপক চিত্র আর কোনো কথাসাহিত্যিকের রচনায় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

বিদূষক একটি সার্কাসের ক্লাউনকে নিয়ে রচিত বিয়োগান্ত উপন্যাস। ক্লাউনের আপাত হাস্যোচ্ছল দর্শক-হাসানো ভূমিকার অন্তরালে কী অপরিমেয় প্রেমের বেদনা লুক্কায়িত থাকতে পারে শোকাবহ ঘটনায় পরিসমাপ্ত উপসংহারের মধ্য দিয়ে তারই মর্মন্তুদ আলেখ্য অঙ্কন করা হয়েছে উপন্যাসটির মধ্যে। বিদূষকের ব্যর্থতার হাহাকার পাঠকচিত্তকেও স্পর্শ করবে। অনেকটা সিনেমার লন চ্যানী অভিনীত 'লাফ, ক্লাউন, লাফ'-এর সগোত্র কাহিনী, তবে বিদূষকের ট্রিটমেণ্ট আলাদা, পরিবেশও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মেঘের উপর প্রাসাদ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক ভাঙনের কাহিনী। বাড়ীতে রুগ্ন বাপ শয্যাশায়ী, ছেলেরা বেকার—আধা বেকার। মা অভাবের সংসার নানা জোড়াতালি দিয়ে চালাবার চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম, হাড়ভাঙা খাটুনিতে জরজর। অবস্থার ফেরে পড়ে বাড়ীর বড় মেয়ে দীপ্তি চৌরঙ্গীপাড়ার মাসাজ ক্লিনিকের

ক্লেদক্লিন্ন চাকুরির দিকে পা বাড়ায় ও তার ফলে জৈব সংকটে জড়িয়ে পড়ে ; মেজো মেয়ে তৃপ্তি বা তিপু শিখ ড্রাইভার চন্দন সিং-এর সঙ্গে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। মাত্র কিছুকাল আগেকার পশ্চিমবঙ্গের এক রূঢ় বাস্তবানুকরণ প্রয়াসী চিত্র। কত আশায় ও আশ্বাসে ভর করে একটি উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসে ঠাঁই নিয়েছিল, দেখতে না দেখতে তার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। উপন্যাসের নামের প্রচ্ছন্ন অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ।

তিন

উপন্যাস ও ছোটগল্পের তুলনামূলক বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ছোটগল্পকার হিসাবেই সমধিক মর্যাদা দিতে হয়। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উচ্চমানের শিল্পীজনোচিত কলাকৌশল, গল্পের আদি-মধ্য-অন্ত্য পর্বের ভিতর উপযুক্ত সংহতি সাধনের নিপুণবোধ, গল্পের পরিণতিতে ঘটনাশীর্ষ (ক্লাইম্যাক্স) সৃষ্টি ও থমথমে কৌতূহল (সাসপেন্স) জমানোর দক্ষতা, সর্বোপরি ভাষা কুশলতা—সব কয়টি ব্যাপারেই লেখকের মুন্সিয়ানা ছিল প্রথম শ্রেণীর। অগণিত ছোটগল্প তিনি লিখেছেন, সব কয়টি সমান দরের না হলেও কোনোটিকে নীরস বলে উপেক্ষা করবার যো নেই। এই সেদিনও (এবারকার পূজা সংখ্যায়) গিল্টকমপ্লেক্স বা অপরাধ-মানসকূট নিয়ে তিনি দু-তিনটি বড় ও ছোটগল্প লিখেছিলেন ; যথা, "সন্দেহের অবকাশে", "ছোরা", "ফিউজ" ইত্যাদি। সব কটিতে তাঁর তর্কাতীত লিখন নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। নারায়ণকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার বললে অত্যুক্তি করবার দায়ে পড়তে হবে না।

তবে উপন্যাসে তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত বহির্মুখী। তিনি যতটা উপন্যাসের আবহসচেতন ছিলেন, ততটা বোধহয় মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীরে দৃষ্টিসঞ্চালনপটু ছিলেন না। তিনি জীবনের বহিরঙ্গে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন, অন্তরঙ্গে তেমন করে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি। প্রকৃতির বহিঃশোভার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ তাঁকে চরিত্রের

জটিলতার আবর্তে নিমজ্জিত হতে দেয়নি—কেবলই তাঁকে আবর্তের পৃষ্ঠভূমিতে ভাসিয়ে রেখেছে। তাছাড়া তাঁর আত্যন্তিক বর্ণনাপ্রীতি, ভাষার অলঙ্কারবাহুল্য ও শব্দঝঙ্কার—এগুলিও জীবনের গভীরে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁর বাধক হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আসলে মানুষটি ছিলেন জন্ম-রোমান্টিক, কবিস্বভাবমণ্ডিত। যতই প্রগতিশীল সমাজসচেতনতার শিবিরে থাকুন আর বাস্তবের চর্চা করুন, তাঁর মন স্বপ্নালুতায় আর কাল্পনিকতায় যত স্ফূর্তি পেত, বাস্তবের রূপায়ণে তার সিকির সিকিও পেত না। বোধহয় দুর্মর স্বাপ্নিক বলেই মনুষ্য চরিত্রের গহনে প্রবেশের চাবিকাঠি তাঁর হাতে ছিল না। আর একথা কে না জানেন যে, চরিত্রায়ণ ছাড়া আর যাই হোক উপন্যাস সৃষ্টি হয় না? এখন মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের যুগ, "চৈতন্য প্রবাহের" তত্ত্বকে উপন্যাসের বাস্তবে প্রয়োগায়িত করার যুগ। এই যুগের কোনো উপন্যাস-কার যদি এখনও মানুষের অন্তরে পর্যবেক্ষণ না চালিয়ে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে (সামাজিক পরিবেশ নয় কিন্তু) মানুষ বাস করে তারই দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি এ যুগের উপন্যাসের দাবি পূরণের কাজ থেকে দূরে রয়েছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর দুটি উপন্যাসের নাম করব। উপরে মেঘের উপর প্রাসাদ উপন্যাসের কাহিনীর চুম্বক দেওয়া হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হবে এটি প্রকৃতই একটি বাস্তবসম্মত উপন্যাস, কিন্তু উপন্যাসটির পাঠ সাঙ্গ করবার পর মনে হবে এতে কোনো ঘটনারই কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্যক্ প্রতীতিযোগ্যতার সঙ্গে চিত্রিত হয়নি। পূর্ববঙ্গের এক উদ্বাস্তু পরিবারের ভাঙন দেখাতে হবে বলেই যেন সেই ভাঙন দেখানো হয়েছে—কিন্তু লেখায় ট্রাজিডির বোধ ফোটেনি।

দ্বিতীয়ত, এবারকার পূজায় প্রকাশিত সন্দেহের অবকাশে নামক ছোট উপন্যাস কিংবা বড় গল্পটির কথা ধরা যাক। আদালত থেকে সন্দেহের অবকাশে (বেনিফিট অব্ ডাউট) ছাড়া-পাওয়া এক নির্দোষ যুবকের কল্পিত অপরাধী মনস্তত্ত্ব এই কাহিনীর মূল উপজীব্য। এটি

একটি ডস্টয়েভ্‌স্কী-সুলভ বিষয়বস্তুর গল্প। উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক লেখকের হাতে পড়লে একটি অসাধারণ গল্প হতে পারত কিন্তু তা হয়নি। লেখক চরিত্রটির বহির্দেশেই শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, তার অন্তরে প্রবেশের পথরেখা খুঁজে পান নি। খুব সম্ভব পূজার ব্যস্ততা এবং সম্পাদকের ফরমায়েস মতো রচনার আয়তন সীমিত রাখবার বাধ্যবাধকতার দরুণ মনস্তত্ত্ব-রূপায়ণে অধিকতর যত্নবান হবার অবকাশ মেলেনি। আয়তনের স্বল্পতা সব সময় উৎকর্ষের পরিচায়ক নাও হতে পারে।

এতদ্‌সত্ত্বেও বলব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক আশ্চর্য শিল্পী। তাঁর সব্যসাচিত্বের প্রতিভার তুলনা হয় না। বিশেষ, ভাষাকুশলতায় তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। নারায়ণকে অনেকে তারাশঙ্করের ধারার লেখক বলে মনে করেন। তারাশঙ্কর নিশ্চিতই তাঁর থেকে উচ্চস্তরের শিল্পী, কিন্তু ভাষার প্রশ্ন যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে তারাশঙ্কর নারায়ণের ধারে-কাছেও ঘেঁসতে পারবেন না। এর কারণ আর কিছু নয়, তারাশঙ্কর স্বভাবশিল্পী, তাঁর মানসিকতায় যথোচিত বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলনের অভাব; পক্ষান্তরে নারায়ণ ব্যাপক অধ্যয়নের প্রসাদপুষ্ট উচ্চশিক্ষিত শিল্পী। বৈদগ্ধ্যের দ্বারা মার্জিত ভাষারীতির সঙ্গে কি অশিক্ষিতপটুত্বের সংস্কারযুক্ত স্বভাব শিল্পীর ভাষা দাঁড়াতে পারে? কিন্তু নারায়ণের মজ্জাগত রোমান্টিকতাই তাঁর সার্থক ঔপন্যাসিক হবার পথে বাদ সেধেছে। হায়, নারায়ণ যদি আর একটু কম স্বাপ্নিক আর অধিক বাস্তবসচেতন হতেন!

চার

সাহিত্যসমালোচক হিসাবেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, বৈদগ্ধ্য ও স্মৃতিকুশলতা, সহজ রসিকতা এই ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের সহায়ক হয়েছিল। সাহিত্য-রচনার এই একটি মাত্র বিভাগ যেখানে তাঁর অধ্যাপকীয় সত্তা তাঁর রচনাস্ফূর্তির বাধক হয়নি, বরং তাঁকে আনুকূল্য করেছে সর্বপ্রকারে। অধ্যাপকীয় সত্তা আর সমালোচক সত্তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগ আছে। এই যোগ, বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ হয়েছিল।

"সাহিত্যে ছোটগল্প" ডক্টরেট-থিসিসটি নারায়ণের পাণ্ডিত্য ও রসগ্রহিষ্ণু মনের নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করেছে। অন্যান্য সাহিত্য-প্রবন্ধেও তাঁর দেশী-বিদেশী সাহিত্যের সৃজনীমূলক ধারার সঙ্গে গভীর পরিচয় ও রসগ্রাহিতার প্রমাণ পাই। উদাহরণ, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটগল্প ও কাহিনী-কবিতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন (বক্তৃতার একাংশ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' সাময়িকীতে মুদ্রিত) তাতেও তাঁর বিদ্যাভূয়িষ্ঠ রসিক মনের নিঃসন্দিগ্ধ স্বাক্ষর বর্তমান। লেখকের পরিহাস-প্রিয় অসূয়ালেশহীন নির্মল বিদ্রূপ বিজল্পিত হাস্যরসাত্মক রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ও পরে অংশত গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ 'সুনন্দর জার্নাল' নামধেয় রম্যরচনাগুলির মধ্যে। একটু হাল্কা-চটুল, তবে সমাজ চেতনায় দৃষ্টি তির্যক হওয়ার ফলে নিবন্ধগুলি বেশ উপভোগ্য—অবসর বিনোদনের উপযুক্ত পাঠ্য। বোধহয় সুনন্দর জার্নাল-ই একমাত্র রচনা, যেখানে লেখককে সমাজ-সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখতে পাই।

কিন্তু, সমালোচকরূপে নারায়ণের যে অশেষ সম্ভাবনা ছিল তা তিনি পরিপূরণ করে যেতে পারেননি। এই ক্ষেত্রে বিচক্ষণ পাঠকের প্রত্যাশা বরাবর অপরিতৃপ্ত থেকে গেছে। তার কারণ, সীরিয়াসধর্মী সমালোচক হতে গেলে ধীরস্থির চিন্তনমননের যে সুবিস্তৃত অবসর ও বিশ্রান্তি একজন লেখকের জীবনে থাকা দরকার, তা এই সদাব্যস্ত অক্লান্তকর্মা লেখকটির ভাগ্যে কখনও ঘটেনি। নারায়ণ ছিলেন শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন এক বিরল অবসর লেখক। কত মহলের কত রকমের দাবিপূরণ যে তাঁকে করতে হতো তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রকাশকদের তাগাদা তো বরাবরই ছিল, তা বাদে সিনেমার স্ক্রিপ্ট, রেডিওর ফিচার, কথিকা ও আলোচনা, শিশু মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকাগুলির অফুরন্ত বায়নাপূরণের তাগিদ, 'জনপ্রিয়' সাপ্তাহিকের চুটকি লেখার দায়, ছাত্রদের আব্দার—এত বিভিন্নমুখী ও বিরুদ্ধ বরাতের ধাক্কা সামলিয়ে তিনি নিজের বলতে সময় খুব কমই

পেতেন। তার ফলে চিন্তামূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সীরিয়াস লেখায় বেশী সময় দেওয়া তাঁর কোনোমতেই হয়ে উঠত না। আর চিন্তনমননের জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যথাযুক্ত অবসর না পেলে যে প্রকৃত সমালোচক সত্তার বিকাশ ঘটানো যায় না ভুক্তভোগী মাত্রেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তা হাড়ে হাড়ে জানেন। একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচক হওয়ার যোগ্যতা নারায়ণের ছিল, কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে সে যোগ্যতার সার্থকতা ঘটেনি।

নানা জনের নানা রকম বায়না পূরণের পিছনে অর্থকরী প্রণোদনাটাই যে সব সময় প্রধান তাগিদ ছিল তা নয়। বহু লেখাই তিনি উপরোধে পড়ে বিনি পয়সায় লিখে দিতেন। আসলে মানুষটি ছিলেন এত নম্র, শান্ত ও ভালো যে কারও অনুরোধের উত্তরে 'না' বলতে পারতেন না। তাঁর এই ভালোমানুষীর সুযোগ একাধিকজনকে নিতে দেখা গেছে। তবে সত্যের খাতিরে এ-ও বলতে হবে যে তিনি এই সুযোগদানের জন্যে যেন সব সময় হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়েই থাকতেন। আসলে, জনপ্রিয়তার স্তরে বিচরণ করতে তিনি ভালোবাসতেন ও সস্তা হাততালির প্রতি তাঁর লেখকোচিত বোধগম্য দুর্বলতা ছিল। নইলে এ কথা কে কবে ভাবতে পারতো যে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার পদাধিকারী একজন ডাকসাইটে অধ্যাপক, তিনি সাতবছর একটানা একটি ব্যবসায়ী সাপ্তাহিকের পাতায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিতান্ত হাল্কা-চুটল চুট্‌কি লেখার ফরমায়েস মিটিয়ে চলেছেন? তাঁর লেখা ছাপিয়ে ওই সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সাপ্তাহিকটি নিশ্চিত কাগজের কাটতি বাড়িয়েছে ও মুনাফা কামিয়েছে, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গো-র কী দায় ছিল ওই কাগজের সেবা করার, যদি না ধরে নেওয়া যায় ডক্টরেট অধ্যাপক হয়েও চুট্‌কি লেখা ছাপিয়ে জনপ্রিয় হবার লোভ তাঁর ছিল? কিংবা এই হেঁয়ালিরই বা কী ব্যাখ্যা যে, যে লেখকটির নানা সূত্রে অর্থোপার্জনের কমতি ছিল না, তিনি সস্তা ন্যাকড়া জাতীয় সিনেমা পত্রিকায় লেখবার জন্যে সর্বদা আগু বাড়িয়ে থাকতেন? অন্যদিকে, এই রহস্যেরই বা সমাধান কে করবে যে, এই প্রথিতযশাঃ

লেখকটি সিনেমা মহলের উপরোধমাত্রে যাঁর-তাঁর অতি নিকৃষ্ট গল্পেরও সিনারিও লিখে দিতে ইতস্ততঃ করতেন না? প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকের অথবা নিজের লেখা গল্পের সিনারিও লেখা এক কথা, আর রাম-শ্যাম-যতুর রদ্দি গল্পের চিত্রনাট্য দাঁড় করানো আর এক কথা। রচনার গুণাগুণ বিচারক্ষম যে-কোনো সৎ লেখকের এতে আত্মমর্যাদায় বাধা উচিত। সর্বশেষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রগতির শিবিরের লেখক, একটি বিশেষ বামপন্থী মতাদর্শের অনুগামী বলে পরিচিত। অথচ দেখা যায়, যে দৈনিক পত্রিকাটি ছিল ওই মতাদর্শের নিরবচ্ছিন্ন বিরুদ্ধাচারী ও শত্রু-স্থানীয়, তার সঙ্গেই নারায়ণের দহরম-মহরম ছিল সবচেয়ে বেশী। শুধু তাই নয়, চীন-ভারত যুদ্ধের সাংস্কৃতিক সংকটের সময় ওই পত্রিকার ভাড়াটে লেখকেরা মিলে 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' নামে যে-'স্বাধীন' সংস্থাটির পত্তন করেছিলেন, নিজের বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁদের খাতায় নাম লেখাতে তাঁর বিবেক এতোটুকুও পীড়িত হয়নি। প্রতিভা-বান্ হয়েও জনপ্রিয়তার ফেনায় ফেনায় ভেসে বেড়ানো লেখকের কলমে প্রত্যয়ের জোর না থাকাটা বুঝি স্বাভাবিক।

জানি এ সব কথা অপ্রিয়, এবং এ-ও জানি যে মৃতের সঙ্গে বিবাদ করতে নেই। কিন্তু নারায়ণ যেহেতু হেঁজিপেঁজি লেখক ছিলেন না, ছিলেন সব্যসাচিত্বের বহুমুখিতাযুক্ত সত্যিকার প্রতিভাধর লেখক, সেই কারণে তাঁর সম্পর্কে ভালো-মন্দ সকল কথাই সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত থাকা উচিত বলে মনে করি। নারায়ণ যদি আর একটু কম ভালো মানুষ হতেন, হতেন আর একটু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্ত ধাতের লোক, তা হলে এমনভাবে হয়তো অকালে তাঁকে আমাদের হারাতে হতো না। মতলবী লোকেরা তাঁকে নানাবিধ মামুলী কাজে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললো, যথাযথ পথে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হতে দিলো না। তাঁর স্বীয় জনপ্রিয়তার কাঙালপনা মতলবীদের স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বনাশকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলেছিল।

আমার নিশ্চিত ধারণা, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর বিশ্রামের অভাব

নারায়ণের অকালমৃত্যুর কারণ। বেঁচে থাকলে এবং প্রতিভাকে যথাযথ পথে চালিত করতে পারলে আরও কত দিক দিয়ে এই ক্ষমতাশালী চৌকস লেখক বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন! কিন্তু তা আর হলো না। নারায়ণের অকাল মৃত্যু আমাদের কাছে স্বজনবিয়োগের চেয়েও মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক। আমরা একজন নিকট-বান্ধবকে তো হারালুমই সেই সঙ্গে হারালুম এমন একজনকে যাঁর দ্বারা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের আরও অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হতে পারতো। তাঁর ক্ষতি "সহজে পূরণ হবার নয়" একথাটা নারায়ণের প্রসঙ্গে ধরতাই বুলি মাত্র নয়, প্রকৃতই অর্থবহ।

'প্রগতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা